উইলিয়াম হাণ্টার

দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস

আবদুল মওদুদ

অনূদিত

বাংলা একাডেমীর

পক্ষে

পরিবেশক

আহমদ পাবলিশিং হাউস

বাংলা একাডেমীর পক্ষে
প্রকাশক :
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৭০
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪
তৃতীয় মুদ্রণ
কার্তিক, ১৩৮১
নবেম্বর, ১৯৭৪

প্রচ্ছদপট
কাইয়ুম চৌধুরী
সর্বস্বত্ব বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রাকর
এস, রহমান চৌধুরী
দি ইউনিভার্সেল প্রেস
৩৫, আওলাদ হোসেন লেন,
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

মূল্য : [illegible] টাকা মাত্র।

THE INDIAN MUSALMANS : Written by Mr. W. W. Hunter and translated into Bengali by Abdul Moudood, Published by Mahiuddin Ahmed, Ahmed Publishing House, 7, Zindabahar 1st. Lane, on behalf of Bengali Academy, Dacca, Bengladesh, 1974

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসংগে

জনাব আবদুল মওদুদ অনূদিত হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' গ্রন্থের সংস্করণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃষেশিত হয়ে যাওয়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতন অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রমাণ। দ্বিতীয় মুদ্রণে মূল পাঠ যথাযথ রেখে মুদ্রণ প্রমাদগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণের মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি পাঠক সমাজ দ্বিতীয় মুদ্রণটিকেও প্রথম সংস্করণের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করবেন।

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক, বাংলা একাডেমী

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮

প্রসঙ্গ কথা

উইলিয়াম হান্টার রচিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৮৫৭ সালের ফৌজী বিপ্লব শেষে পাক-ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরেও বিদেশী হুকুমাতের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ এবং অসহযোগিতামূলক মনোভাব কেন অব্যাহত থাকে তার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের ভার সিভিলিয়ান হান্টার সাহেবের উপর অর্পিত হয়। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর হান্টার সাহেব যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' নামক গ্রন্থটি তারই মুদ্রিত রূপ। সন্নিবেশিত তথ্য এবং মতামত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য না হলেও, পলাশীর পরাজয় থেকে প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর পাক-ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকটিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের উপর এবং বিশেষভাবে বাংগালী মুসলমানের উপর ইংরেজ সরকার যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চালান তার আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে ইংরেজ সিভিলিয়ানের লেখা এ-পুস্তকটিতে। সুতরাং পুস্তকটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

এই মূল্যবান দলিলটি বাংগালী পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার প্রয়োজনবোধে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে পুস্তকটির বংগানুবাদ প্রকাশ করা হলো।

সৈয়দ আলী আহসান

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

পরিচালক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

উৎসর্গ

সিমলা, ২৩শে জুন, ১৮৭১

প্রিয় হড্‌সন,

আমার এই ছোট্ট বইখানি তোমার নামে উৎসর্গ করছি, তোমার পরিশ্রম থেকে যা কিছু সাহায্য পেয়েছি, তারই স্বীকৃতি হিসেবে। চাকুরিয়াদের মধ্যে আমরা যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি আছি, তাদের মধ্যে তুমিই এ-দেশবাসীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করার কর্তব্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলে। এশিয়াবাসী প্রজাদের বিষয়ে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল না হওয়া। ভারতে বৃটিশ শক্তির সবচেয়ে দুরতিক্রম্য বিপদ হচ্ছে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। সরকারের পর সরকার কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্যের একটা স্থায়ী বিপদ হিসেবে উল্লিখিত একটি ক্রমাগত সংগ্রামরত জনশ্রেণীর বিগত ইতিহাস ও বর্তমান চাহিদাগুলি আমি এই কয়েক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

ভবদীয়—

ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টার

ব্রিয়ান্ হফটন্ হডসন, এস্কোয়ার,
অলডানি গ্রেঞ্জ, গ্রস্‌টারশায়ার।

অনুবাদকের ভূমিকা

বড়লাট লর্ড মেয়ো (জানুয়ারী, ১৮৬৯-১৮৭২) স্যার উইলিয়াম হান্টারকে ভারতীয় মুসলমানরা মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ধর্মত বাধ্য কিনা, এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করে একটি রিপোর্ট দানের নির্দেশ দেন। বৃটিশ সিভিলিয়ান স্যার হান্টার শাসক জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অনুসন্ধান ও আলোচনা করে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তা-ই 'The Indian Musalmans' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল একজন ইংরেজ কর্তৃক শাসক ইংরেজ জাতির কার্যকলাপের সাফাই হিসেবে এবং মুসলিম আযাদী যোদ্ধাদের কার্যসমূহ বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সে সবের তীব্র নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে; তবু পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সদ্য রাজ্যহারা ও শাসন বিষয়ে সর্ব অধিকারবঞ্চিত ভারতীয় মুসলিমদের অন্তর্জ্বালা এবং হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের মানসে অবিরাম আপোসহীন সংগ্রাম ও সাধনার সুস্পষ্ট চিত্র।

পুস্তকখানির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত মুজাহেদীন ছাউনি সিত্তানা ও মুল্‌কার মুজাহিদদের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম-সংঘাত এবং ইংরেজদের বার বার শোচনীয় পরাজয়ের পর শেষে ভেদনীতি ও কূটচালের আশ্রয় নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ধ্বংস সাধন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জিহাদী সংগঠনের বিবরণ, যার মারফতে বাংলা দেশ থেকে শুরু করে ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রদেশসমূহ থেকে অজস্রভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সা জিহাদী বসতিতে আমদানী হতো। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'জিহাদ করা জায়েয কিনা'; এই তর্কিত প্রশ্নে আলেম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত সমাজের সমালোচনা; আর চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের প্রতি

অবিচারগুলির এবং শাসক-মনোভাবসুলভ প্রতিকারের উপায়। সমকালীন মুসলমান, বিশেষত বাঙালী মুসলমানদের ধর্মীয়, আর্থিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি।

গ্রন্থটির ১৮৭১ সালে প্রথম ও ১৮৭৬ সালে শেষে মুদ্রণ হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে আমারই প্রচেষ্টায় 'The Comrade Publishers' কর্তৃক বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন থেকে আমি তার বাংলা অনুবাদ করতে থাকি ও মাসিক 'সওগাত'-এ চতুর্থ অধ্যায়ের কিছু অংশ প্রকাশ করি। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্রন্থখানির মর্যাদা অনেক এবং এ জন্যেই বাংলাভাষী মুসলমানদের তার সংগে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থখানিতে যা কিছু মতামত ব্যক্ত হয়েছে, সবই হান্টার সাহেবের। নোটে আমার নিজস্ব মতামত (অ) উল্লেখে চিহ্নিত হয়েছে। আর একটি কথা: লেখক ভারত বলতে তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশকে বুঝিয়েছেন।

আবদুল মওদুদ

প্রথম অধ্যায়

আমাদের সীমান্তে স্থায়ী বিদ্রোহী বসতি

বাংলার মুসলমানরা পুনরায় এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কয়েক বছর ধরে একটা বিদ্রোহী বসতি আমাদের সীমান্ত প্রদেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। সময়ে সময়ে সেখান থেকে গোঁড়া মুজাহিদ বাহিনীর লোক দলে দলে বের হয়ে আমাদের ছাউনি আক্রমণ করছে, আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের প্রজাদেরকে খুন করছে। ইতিমধ্যেই তারা আমাদের সেনাবাহিনীকে তিনটি ব্যয়সাধ্য যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। মাসের পর মাস ধরে সীমান্তের এই বিদ্রোহী বসতিতে বাংলাদেশের অন্তস্থল থেকে নতুন নতুন মুজাহিদ এসে যোগ দিয়েছে। একের পর এক সরকারী মামলায় প্রকাশ পেয়েছে যে, ষড়যন্ত্রের এই তিমিরজাল আমাদের প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে আছে এবং পাঞ্জাব সীমান্তের বাইরে অবস্থিত জনবিরল পর্বতগুলির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা আছে অসংখ্য ষড়যন্ত্র-ঘাটি। গ্রীষ্ম-প্রধান বিস্তৃত জলাভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত এ-সব ষড়যন্ত্রের ঘাটি বিদ্যমান। আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, একটি সংগঠনের মারফত ব-দ্বীপ আকৃতি বংগদেশ থেকে নিয়মিতভাবে মানুষ ও টাকাকড়ি সংগৃহীত হয়ে দু-হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী বসতিতে চালান হয়—আমাদেরই শাহী সড়কের উপর দিয়ে একের পর এক ঘাটি পার হয়ে। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধনী লোকেরা এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তারা টাকা-পয়সা এমন সুকৌশলে চালান দেয় যে, এই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রমূলক কাজও তাদের জন্য ব্যাঙ্কের লেনদেনের মতো সহজ ও নিরাপদ হয়ে পড়েছে।

অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে ফরয কিনা! গত নয় মাস ধরে বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় শুধু এই আলোচনাই হচ্ছে, মহারাণীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ফরয কিনা! উত্তর ভারতের আলেম সম্প্রদায় প্রথমেই সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে ফতোয়া জারী করেছেন। তারপর বাংলার মুসলমানরা এ সম্বন্ধে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেছে। এমন কি, ভারতে অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু শিয়ারাও এ প্রসংগে মুদ্রিত মতামত প্রকাশ করেছে। গত কয়েক মাস ধরে রাজভক্ত মুসলমানগণ আত্মাকে নরকবাসী না করে জিহাদ থেকে বিরত থাকা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে মতামত নিচ্ছে। এ-দেখে ইংগ-ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলি কৌতুকবোধ করছে। কিন্তু মুসলমান আলেম সম্প্রদায়ের বারবার ফতোয়া জারীতে এদেশবাসীর এই প্রতীতি জন্মেছে যে, বিষয়টা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হাস্যকরও বটে। তবে এ সম্বন্ধে যে-সব কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি, মুসলমানদের লিখিত যে-সব কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও আমাদের ভারত সাম্রাজ্য যে কি ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে, তৎসম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে-সব থেকে প্রত্যেক যুক্তিনিষ্ঠ মনে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, বহু বৎসর ধরে হঠকারী মুসলমানরা যেখানে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে লিপ্ত রয়েছে, সেখানে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই এখন এমন একটা অতি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, যা পূর্বে কোন জাতিকে এত উত্তেজিত করেনি। এখন জিহাদ করার কর্তব্যটা মুসলিম আইনের একটা সংগত ও স্পষ্ট প্রশ্নের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। যে-কোন ভাবেই হোক, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এখন দরকার হয়ে পড়েছে তার ঈমান ঘোষণা করার। সীমান্তে অবস্থিত জিহাদী বসতিতে সে চাঁদা পাঠাবে কিনা! স্বধর্মনিষ্ঠদের মুখের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলারও তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সে ইসলামের খাঁটি পাবন্দ হয়ে চলবে কিংবা মহারাণীর শান্তিপ্রিয় প্রজা হিসাবেই বাস করবে—সেসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে মুসলমানরা কেবল ভারতীয় মশহুর আলেমদের উপদেশই গ্রহণ করেনি, তারা মক্কা পর্যন্ত

ফতোয়ার সন্ধানে
ফরয কিনা, এই
প্রধান মুফতীদেরও

আমাদের মুসল
নিয়েছে, এখানে
ঘটনার আলোচনা
বসতি স্থাপিত হ
দুর্ঘটনা তুলে ধ
বাধ্য হয়েছে।
বিবরণ দেব, যার
জিলাগুলি থেকে
তারপর আমি আ
এই অবস্থার সৃষ্টি
মুসলমান জনসাধার
গলাধঃকরণ করছে
আইনের অভিনব
প্রাণপণ চেষ্টা করছে
বলা হবে। ভারত
চিরন্তন বিপদ।
থেকে দূরে সরে
প্রবর্তিত পরিবর্তন
মুসলমানরা সেগুলি
নিয়েছে। অতএব
ইংরেজ শাসনে মুস
তাদের অবিচারগুলি
সে সবের প্রতিকার হ

পাঞ্জাব সীমান্তে
যাদেরকে আমরা ফি

১ তিনি ছিলেন
খ্রীষ্টাব্দ) তাঁ

অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে ফরয কিনা! গত নয় মাস ধরে বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় শুধু এই আলোচনাই হচ্ছে, মহারাণীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ফরয কিনা! উত্তর ভারতের আলেম সম্প্রদায় প্রথমেই সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে ফতোয়া জারী করেছেন। তারপর বাংলার মুসলমানরা এ সম্বন্ধে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেছে। এমন কি, ভারতে অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু শিয়ারাও এ প্রসংগে মুদ্রিত মতামত প্রকাশ করেছে। গত কয়েক মাস ধরে রাজভক্ত মুসলমানগণ আল্লাকে নরকবাসী না করে জিহাদ থেকে বিরত থাকা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে মতামত নিচ্ছে। এ-দেখে ইংগ-ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলি কৌতুকবোধ করছে। কিন্তু মুসলমান আলেম সম্প্রদায়ের বারবার ফতোয়া জারীতে এদেশবাসীর এই প্রতীতি জন্মেছে যে, বিষয়টা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হাস্যকরও বটে। তবে এ সম্বন্ধে যে-সব কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি, মুসলমানদের লিখিত যে-সব কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও আমাদের ভারত সাম্রাজ্য যে কি ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে, তৎসম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে-সব থেকে প্রত্যেক যুক্তিনিষ্ঠ মনে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, বহু বৎসর ধরে হঠকারী মুসলমানরা যেখানে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে লিপ্ত রয়েছে, সেখানে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই এখন এমন একটা অতি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, যা পূর্বে কোন জাতিকে এত উত্তেজিত করেনি। এখন জিহাদ করার কর্তব্যটা মুসলিম আইনের একটা সংগত ও স্পষ্ট প্রশ্নের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। যে-কোন ভাবেই হোক, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এখন দরকার হয়ে পড়েছে তার ঈমান ঘোষণা করার। সীমান্তে অবস্থিত জিহাদী বসতিতে সে চাঁদা পাঠাবে কিনা! স্বধর্মনিষ্ঠদের মুখের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলারও তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সে ইসলামের খাঁটি পাবন্দ হয়ে চলবে কিংবা মহারাণীর শান্তিপ্রিয় প্রজা হিসাবেই বাস করবে—সেসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে মুসলমানরা কেবল ভারতীয় মশহুর আলেমদের উপদেশই গ্রহণ করেনি, তারা মক্কা পর্যন্ত

ফতোয়ার সন্ধানে গেছে। ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ করা ফরয কিনা, এই প্রশ্নটা কয়েক মাস ধরে মক্কা শরীফের তিন মযহাবের প্রধান মুফতীদেরও গভীর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের মুসলমান প্রজাদের এই অশান্তি-বোধ যে ত্রিধারায় রূপ নিয়েছে, এখানে আমি তারই আলোচনা করবো। প্রথমে সেই সব ঘটনার আলোচনা করবো, যার ফলে আমাদের সীমান্তে একটা বিদ্রোহী বসতি স্থাপিত হয়েছে এবং পাঠকের সামনে আমি কয়েকটা দুঃসহ দুর্ঘটনা তুলে ধরবো, যেগুলির মুকাবিলা করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি সেই রাজদ্রোহাত্মক সংগঠনের বিবরণ দেব, যার মারফত বিদ্রোহী বসতিতে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ জিলাগুলি থেকে অজস্রভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সা আমদানী হতো। তারপর আমি আলোচনা করবো আইনঘটিত তর্ক সম্বন্ধে, যার দরুন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—সেই সব বিষাক্ত তর্ক, যেগুলি একদিকে মুসলমান জনসাধারণ জিহাদী ইমামদের শিক্ষার ফলে আগ্রহের সংগে গলাধঃকরণ করছে, অন্য দিকে তাদেরই এক মুষ্টিমেয় সংখ্যা শরিয়তী আইনের অভিনব ব্যাখ্যা দ্বারা কিভাবে জিহাদ করা এড়ানো যায় তারই প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এখানেই ইতি করলে সত্য কথা আংশিকমাত্র বলা হবে। ভারতীয় মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসনপ্রণালী থেকে দূরে সরে আছে। শিষ্টভাবাপন্ন হিন্দুরা যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি আনন্দের সংগে মেনে নিয়েছে, সেখানে মুসলমানরা সেগুলিকে তাদের প্রতি ভীষণ অবিচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে। অতএব আমি ইচ্ছা পোষণ করছি যে, চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের অভিযোগসমূহের কারণ অনুসন্ধান করবো, তাদের অবিচারগুলির দিকে অংগুলি নির্দেশ করবো এবং কি উপায়ে সে সবের প্রতিকার হতে পারে, তারও উপায় নির্দেশ করবো।

পাঞ্জাব সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহ্‌মদ।[১] যাদেরকে আমরা পিণ্ডারী শক্তির নির্মূলকালে অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতময়

১ তিনি ছিলেন রায়বেরেলীর বাশিন্দা। ১২০১ হিজরীর মুহর্‌রম মাসে (১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর জন্ম হয়।

ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, তিনি ছিলেন সেই সাহসী ব্যক্তিদের অন্যতম। একজন মশহুর দস্যু সর্দারের অধীনে[২] অশ্বারোহী সিপাহী হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ। বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলির উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখশক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চলসমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে কোন মুসলমান দস্যুর পক্ষে নিজের পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তার উপর শিখদের অত্যধিক হিন্দুয়ানীতে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মান্ধতা আরও মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। সৈয়দ আহ্‌মদ বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে সময়ের সংগে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেমের[৩] নিকট শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহ্‌মদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যে-সব অনাচার বা বেদা'ত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রথম কর্মব্যস্ততা ছিল রোহিলাদের বংশধরদের[৪] নিয়ে, যাদের নির্মূল করতে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বেতনভুক্ত বাহিনী ধার দিয়েছিলাম এবং প্রসংগটা ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনে একটা অনপনেয় কলংক হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাদের উত্তরপুরুষেরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমাদের উপর অশেষ প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং এখনও বিদ্রোহী বসতির সবচেয়ে সাহসী অস্ত্রধারী হচ্ছে তারাই! ভারতে এই রকম অন্য বহু অবিচারের মতো রোহিলাদের ক্ষেত্রেও আমরা যা রোপণ করেছি, তারই ফল ভোগ করছি।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আহ্‌মদ ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চলে সফর করে ফিরলেন। তখন তাঁর মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ

---

২ আমীর খান পিণ্ডারী, পরবর্তীকালে টংকের নওয়াব হন।

৩ শাহ্ আবদুল আযীয্ (১৭৪৬-১৮২৩); পরে তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হবে। (শাহ্ সাহেবের আমার লিখিত বিস্তৃত জীবনী দেখুন, মাহে-নও : ১৯৬১, অক্টোবর সংখ্যা—অনুবাদক)

৪ রোহিলাখণ্ডের রামপুরে ফয়জুল্লা খানের জায়গীর।

নফরের মতো তাঁর খিদ্‌মত করতো এবং বহু দেশমান্য আলেম খিদ্‌মত-গারের মতো খালি পায়ে তাঁর পাল্‌কির দু'ধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। পাটনায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের ফলে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এতোদূর বেড়ে গেল যে, একটা সাধারণ সরকারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়ে পড়লো। তাঁর সফরকালে যে-সব শহর পথে পড়তো, সেগুলিতে নায়েব পাঠিয়ে তিনি তেয়ারতি থেকে যাকাত সংগ্রহ করতে লাগলেন। মুসলমান বাদশাহ্‌দের সুবাহ্‌দার নিযুক্ত করার মতো হুকুমনামা জারী করে তিনি চার জন খলীফা ও একজন বড় খতিব[৫] নিযুক্ত করলেন। এভাবে পাটনায় একটা স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে, গংগানদীর গতিপথ বেয়ে এবং পথিমধ্যে বড় বড় শহরে অসংখ্য মুরীদ ও তাদের নায়েব নিযুক্ত করে তিনি কলকাতার দিকে রওয়ানা হলেন। কলকাতায় সাধারণ মুসলমানেরা তাঁর কাছে এমন-ভাবে দলে দলে জমায়েত হতে লাগলো যে, প্রত্যেকের হাতে হাত দিয়ে বয়েত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। তখন তিনি মাথার পাগড়ি খুলে জমায়েতে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, যে কেউ তাঁর পাগড়ি ছুঁয়ে দেবে সে-ই তাঁর মুরীদ হয়ে যাবে। ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুমভাবে ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন।[৬] সেখানেও ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতোই সাফল্যমণ্ডিত হলো; কিন্তু ইংগ-প্রতিষ্ঠিত এই প্রেসিডেন্সী শহরের চেয়ে আরও উর্বর ক্ষেত্র এই দস্যু-দরবেশের অপেক্ষায় ছিল। উত্তর ভারতে ফেরার পথে বেরেলী জিলার তাঁর জন্মপল্লীতে এক বিরাট হাংগামাবাজ অনুচরের দল তাঁর

---

৫ মওলবী বেলায়েত আলী, মওলবী এনায়েত আলী, মওলবী মরহুম আলী ও মওলবী করহাত হোসেন। শাহ্ মুহম্মদ হোসেন বড় খতিব হন।

৬ হান্টার সাহেব সৈয়দ আহ্‌মদের যে জীবনী এঁকেছেন, আমরা তার মোটেই সমর্থন করি না। আমার লিখিত 'আমাদীর অমর শহীদ: সৈয়দ আহ্‌মদ'-এর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—(মাহে-নও : ১৯৫৭, মে সংখ্যা) অঃ।

সহগামী হলো।[৭] ১৮২৪ সালে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের বুনো পাহাড়িয়াদের মধ্যে উদয় হয়ে সরাসরি পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহর-গুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

পাঠান আদি জাতিরা উন্মত্ত আবেগে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। এই হাংগামাপ্রিয় অতি-সংস্কারাপন্ন মুসলমানরা বড় খুশী হলো এই ভেবে যে, দ্বীনের নামে হিন্দু প্রতিবেশীদেরকে লুন্ঠন করার একটা সুযোগ মিলে গেল। আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে সবচেয়ে আক্রমণ-প্রবল শিখরা তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। ইমাম সাহেব তাঁর ধর্মান্ধ সীমান্তবাসী মুসলমানদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জিহাদে যারা জয়ী হয়ে ফিরে আসবে তারা বে-শুমার মাল-ই-গনিমাত্ বয়ে আনবে, আর যারা নিহত হবে, তারা শহীদী মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সংগে সংগে বেহেশ্‌তে উপস্থিত হবে। তিনি কান্দাহার ও কাবুলের মধ্য দিয়ে সফর করে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং আদি জাতিগুলিকে কৌশলে একজোট করে নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করলেন।[৮] বেপরোয়া লুণ্ঠনের আশ্বাস দিয়ে তিনি তাদেরকে প্রলুব্ধ করলেন এবং তাদের ধর্মপ্রীতিকে এই আশ্বাস দিয়ে জয় করলেন যে, শিখদের থেকে শুরু করে চীনাদের দেশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের অধর্ম নাশ করতে তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াহী পেয়েছেন; আর নিকটবর্তী ক্রমবর্ধমান শিখ শক্তির দমন যে কতোখানি প্রয়োজনীয়, পার্থিবমনা অতি সাবধানী পাহাড়িয়া রাজনৈতিক নেতাদেরকে তা তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এবিষয়ে হিন্দু রণজিৎ সিংহের প্রতি তাঁর প্রথম জীবনের তীব্র ঘৃণা অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। এভাবে ধর্মের নামে প্রত্যেক ধর্মভীরু মুসলমানকে তিনি জেহাদে যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। এই অদ্ভুত ফতোয়ায় এমন সব বয়ানও ছিল:

শিখরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে বহু দিন ধরে হুকুমাত চালাচ্ছে।

---

৭ বড় খতিব শাহ্ মুহম্মদ হোসেন তাহাদিগকে পূর্বেই সৈয়দ আহম্‌দের মুরীদ করেছিলেন।

৮ ইউসফজাই ও বরকজাই আদি জাতিরা তাঁর দৃঢ় সমর্থক হলো। পঞ্জতরদের আমীর (ফতেহ্ খান) ও সোয়াতের বড় আমীর তাঁর সংগে যোগ দিলেন। আম্বরাজ্যেও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হলো; আর তাঁর পূর্বতন নেতা টংকের নওয়াব বরাবরই তাঁকে মানুষ ও টাকা-পয়সা দিয়ে রসদ যোগাতেন।

তাদের যুলুমবাজী সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। হাযার হাযার মুসলমানের ললাটে লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত করেছে। তারা মসজিদে আযান দিতে দেয় না এবং গো-জবেহ্ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তাদের অপমান-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো, তখন হযরত সৈয়দ আহ্মদ (তাঁর সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক) একমাত্র দ্বীনের হিফাযত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন মাত্র খাদিম সংগে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ারের দিকে রওয়ানা হলেন এবং মুসলমানদেরকে গোমরাহীর নিদ্রা থেকে জাগাতে সমর্থ হলেন; তিনি তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে বীরের মতো অগ্রসর হতেও উদ্বুদ্ধ করলেন। সবই আল্লাহ্র মহিমা! কয়েক হাযার ঈমানদার মুসলমান তাঁর আহ্বানে আল্লাহ্র রাহে চলতে তৈরী হয়েছে এবং ১৮২৬ সালের একুশে ডিসেম্বর তারিখে[৯] বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ইমাম সাহেবের নায়েবরা জিহাদের বাণী উত্তর ভারতের প্রত্যেক শহরেই তাঁর মুরীদানের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উপরে বর্ণিত ফতোয়াটি অযোধ্যার মতো দূরাঞ্চলে প্রচারিত একটি পুস্তিকা থেকে গৃহীত হয়েছে।[১০]

অতঃপর শিখদের সংগে জয়-পরাজয়সূচক ধর্মান্ধ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উভয় পক্ষেই নির্দয়ভাবে হতাহত হতে লাগলো এবং মুসলমান জিহাদী ও হিন্দু শিখদের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে লাগলো, আজও সে-সব স্থানীয় প্রবচনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। নেপোলীয়নের বিশাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লে তাদের কয়েকজন সুকৌশলী সেনানায়ককে সংগ্রহ করে রণজিৎ সিংহ নিজের সীমান্তদেশ সুরক্ষিত করেছিলেন। এই রকম একজন ইতালীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক জেনারেল অবিতাবিলীর[১১] নাম আজও পেশোয়ারের কৃষকদের মুখে মুখে শোনা

৯ ২০শে জমাদিউস-সানী, ১২৪২ হিজরী।

১০ 'তরগিব্-উল-জিহাদ' নামক কনৌজবাসী মওলবীর জিহাদে আহ্বানসূচক প্রচার পুস্তিকা—official proceedings.

১১ আমি তাঁর নাম ও জাতির বানান স্থানীয় জনশ্রুতি থেকেই গ্রহণ করেছি। পেশোয়ারের পাঠান মহলে তিনি 'আবু তাবেলা' নামে সুপরিচিত।

যায়। মুসলমানরা সময়ে সময়ে তীরবেগে সমতল ভূমিতে হামলা পরিচালনা করে চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাবেসাতি চালাতো। অন্য দিকে সাহসী শিখ গ্রামবাসীরা একযোগে পাহাড়িয়া মুজাহিদদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে পাহাড়ে তাড়িয়ে দিত এবং পশুর মতো শিকার করতো। এই সময়ের তীব্র হিংস্রতার ফলে এক বিকট রকম জোত স্বত্বের উদ্ভব হয়—তার নাম রক্তের জোত। আজও সীমান্তের হিন্দুরা গর্বের সংগে তাদের জমির ছাড়পত্র দেখায়, যার বলে হোসেনখেল আদি জাতির একশো মাথা সালিয়ানা কর হিসাবে আদায় দিয়ে তারা জোত-স্বত্ব লাভ করেছিল।

বিশৃংখল মুজাহিদ বাহিনী সম্মুখযুদ্ধে সুশিক্ষিত শিখ সৈন্যদলের মোটেই সমকক্ষ ছিল না। ১৮২৭ সালে ইমাম সাহেব শিখদের এক গড়বন্দী ছাউনির বিরুদ্ধে নিজের অনুচরদেরকে চালনা করেন। কিন্তু বহু প্রাণক্ষয় স্বীকার করে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সমতলভূমির শিখ জেনারেল অবশ্য তাঁদের তাড়া করে সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সাহসী হননি। মুজাহিদ সৈন্যরা সিন্ধুনদ পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিল এবং গেরিলা যুদ্ধে এরকম সাফল্য দেখালো যে, শিখ নায়ক অনন্যোপায় হয়ে যারা লুণ্ঠনকার্যে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছিল, সেই আদি জাতির মিত্রতা ক্রয় করতে বাধ্য হলেন। ১৮২৯ সালে সমতল-বাসীরা তাদের সীমান্তের রাজধানী পেশোয়ারের নিরাপত্তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো এবং তাদের শাসক[১২] হীন ষড়যন্ত্রে ইমাম সাহেবকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান করতে চাইলো। এই গুজব ছড়িয়ে পড়া মাত্র পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমানদের জিদ আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। তারা সমতলভূমিতে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে এসে শিখ সৈন্যদের একযোগে হত্যা করলো এবং তাদের জেনারেলকেও মারাত্মকভাবে জখম করলো। এর পর যুবরাজ শের সিংহ ও জেনারেল ভেন্তুরা বিশাল বাহিনী নিয়ে কোনো রকমে পেশোয়ার রক্ষা করেন; কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রভাব কাশ্মীর পর্যন্ত

বাদশাহ্ শাহ্জাহানের সুবাহ্দার মহাবত খাঁ কর্তৃক নির্মিত (১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে মসজিদটির মিনারগুলিকে এই ইতালীয় শিখ গভর্নর মুসলমানদেরকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করেছিলেন—(অ)।

১২ এই শাসক নামে মুসলমান হলেও রণজিৎ সিংহের পুতুলমাত্র।

ছড়িয়ে পড়লো এবং উত্তর ভারতের প্রত্যেক অসন্তুষ্ট রাজ্যার সৈন্যরা দলে দলে তাঁর ছাউনিতে জমায়েত হতে লাগলো। অনন্যোপায় হয়ে শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ খুব সুদক্ষ সেনানায়কদের অধীনে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও[১৩] মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে; আর সেই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয়।

এই হলো ইমাম সাহেবের কর্মজীবনে চরমোন্নতির মুহূর্ত। তিনি নিজেকে খলিফা হিসাবে প্রচার করলেন এবং 'সত্যাশ্রয়ী আহ্‌মদ, দ্বীনের রক্ষক; তার ঝকমকে তরবারি কাফেরকুলকে নাশ করে।' এই বাণী দিয়ে নিজ নামে তংকা জারী করলেন। কিন্তু পেশোয়ারের পতনে যে আতংকের সৃষ্টি হলো, তার দরুন রণজিৎ সিংহও তাঁর অতুলনীয় কূটনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এই অতি চতুর শিখনায়ক অতঃপর ছোট ছোট মুসলমান আমীরকে তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ জাগ্রত করে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন; ফলে, ইমাম সাহেব মুক্তিমূল্য দিয়ে শহরটি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অন্তর্বিরোধের দরুন তাঁর অনুগামীদের উপর কর্তৃত্বও শিথিল হয়ে গেল। তাঁর প্রকৃত মুজাহিদ বাহিনী ছিল হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদের নিয়ে গঠিত। তারা ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মুসলমান এবং তারা তাঁর ভাগ্যের ভালমন্দের সংগে এরকমভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, তাদের পক্ষে তাঁকে ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল; কিন্তু জিহাদী বাহিনী সীমান্তের পাঠান অধিবাসীদের সমবায়েই প্রবল হয়ে উঠেছিল; আর এই পাঠানেরা ছিল তাদের সবরকম বীরত্ব সত্ত্বেও পাহাড়িয়াসুলভ আত্মগর্ব ও লোভ-লালসায় ভরপুর। একবার সীমান্তের একটি বিশিষ্ট আদি জাতি যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তেই সরে পড়ে[১৪] এবং তার দরুন মুজাহিদরা তাদের উপর ভীষণ প্রতিশোধও নেয়। ইমাম সাহেব তাঁর হিন্দুস্থানী অনুগামীদেরকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন; কারণ সব সময় তিনি তাদের উপর

১৩ জেনারেল আলার্ড ও হরিসিং নালওয়ার অধীনস্থ শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে।

১৪ বরকজাই জাতি, সাইদুর নিকটবর্তী শিখদের সংগে যুদ্ধকালে।

নির্ভর করতেও পারতেন। প্রথমে তিনি তাদের জন্যে সীমান্তবাসীদের উপর যাকাত প্রবর্তন ও তা আদায় করেই ক্ষান্ত ছিলেন। সীমান্তবাসীরাও বিনা অনুযোগে তা আদায় দিত, কারণ তারা ভাবতো, ভালো কাজের জন্যে ধর্মীয় বিধিবদ্ধ করই তারা দিচ্ছে। কিন্তু তা আদায় ব্যাপারে উভয়পক্ষেই বিদ্বেষবহ্নি ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠে; ফলে, ইমাম সাহেবই পায়ের তলার মাটি হারাতে থাকেন। কারণ, তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব একজন ধর্মান্ধ আন্দোলনকারী হিসাবে, একটা বৃহৎ জোটের নিরপেক্ষ নায়ক হিসাবে নয়। এজন্যে সীমান্তবাসী আদি জাতিদের উপর তিনি যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এখন তা বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

তাঁর ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি আরও বেশী নির্দয় হয়ে উঠলেন এবং শেষে পাহাড়িয়াদের এক কোমলতম মর্মমূলে আঘাত হানলেন। পাহাড়িয়াদের প্রথা ছিল, কন্যাদেরকে একরকম নিলামে সর্বোচ্চ মূল্যদাতার নিকট বেচে দিয়ে বিয়ে দেওয়া। তিনি তাদের এই অদ্ভুত বিবাহ প্রথার সংস্কার করবার কু-পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তাঁর হিন্দুস্থানী অনুগামীরাও বহুদিন গৃহহীন হয়ে স্ত্রীহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এজন্যে তিনি এক ফতোয়া জারী করলেন, যে-সব কন্যার শাদী বারোদিনের মধ্যে হবে না, তারা সকলেই তাঁর অনুগামীদের সম্পত্তি হয়ে যাবে। এতে আদি জাতিরা ক্ষেপে উঠলো এবং তাঁর হিন্দুস্থানী অনুগামীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগলো। তিনি নিজে অতি কষ্টে পলায়ন করলেন[১৫]; কিন্তু তাঁর রাজগীও শেষ হয়ে এলো। ১৮৩১ সালে তিনি যখন তাঁরই একজন খলীফার সাহায্যার্থে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শিখ যুবরাজ শের সিংহের অধীনে একদল শিখ সৈন্য অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ ও হত্যা করে।[১৬]

সৈয়দ আহ্‌মদের আন্দোলনের ধর্মীয় দিক এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে। ভারতেই হোক বা অন্য কোনোখানেই হোক, কোনো

১৫ পঞ্জতর থেকে পাকালি উপত্যকায়।

১৬ বালাকোটে, মে মাসে ১৮৩১। সৈয়দ আহ্‌মদ সম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনা ভারত সরকারের বৈদেশিক ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

ধর্মীয় নেতা একটা জাতির হৃদয়-মনকে মাতিয়ে তুলতে পারেন না, যদি তাঁর আরব্ধ কাজের মংগল দিকে তাঁর নিজেরই বিশ্বাস না থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি সৈয়দ আহ্‌মদের কর্মজীবনের মহৎ দিকটা প্রকাশ করবো। ইতিমধ্যে আমি জিহাদী বসতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এখন আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখাবো, কিভাবে আমাদের সীমান্ত প্রদেশে জিহাদী বসতি নবপর্যায়ে কার্যকলাপ শুরু করেছে।

ইমাম সাহেবের প্রধান খলীফাদের মধ্যে দু'ভাই ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জনৈক নামযাদা নরঘাতকের[১৭] দুই পৌত্র। এই লোকটি সিন্ধু নদের বহুদূরে পার্বত্য অঞ্চলে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন এবং সিত্তানায় একজন দরবেশ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নির্বাসিত দরবেশ সাহেব পাহাড়িয়াদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাদেরই দেওয়া জমিতে তিনি একটা খানকাহ্ স্থাপন করেন। নিরপেক্ষ স্থান হওয়ায় ক্রমে এটা পলাতকদের আশ্রয় হিসাবে গড়ে ওঠে। খুনোখুনিতে সদাতৎপর আদি জাতিদের পক্ষে এটা একটা সুবিধাজনক আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ে। তাঁরই একজন পৌত্র[১৮] ছিলেন ইমাম সাহেবের খাজাঞ্চি। তিনি সিত্তানার উত্তরাধিকারী হন এবং সেখানেই জিহাদী বাহিনীর অবশিষ্ট লোকদেরকে বসতি করতে আহ্বান করেন।

প্রায় এই সময়ে সোয়াত রাজ্যের ধর্মীয় নেতা ব্রিটিশ শক্তির ক্রমোন্নতিতে আতংকিত হয়ে উঠেন এবং একটা পাকাপোক্ত রাজকীয় সরকার স্থাপন করে শক্তি সঞ্চয় করতে ইচ্ছা করেন। এজন্যে তিনি উপরোক্ত দরবেশ

তাছাড়া, ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে-সব সরকারী মামলা হয়েছে, সে-সবের সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পাটনার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট টি. ই. র‍্যাভেন্স সাহেবের বিবরণী থেকেও গৃহীত হয়েছে। ক্যাপ্টেন ক্যানিংহাম্ লিখিত শিখদের ইতিহাসে বহু বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। একজন বে-নামী লেখক এ-সব তথ্যের সদ্ব্যবহার করেছেন ওয়াহাবীদের সম্বন্ধে একটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনায় (Calcutta Review : vol. c.ci+cii)।

১৭ তাঁর নাম যমীন শাহ্ ; বোনায়ের অঞ্চলের তখ্‌ত্‌বন্দের অধিবাসী।

১৮ সৈয়দ উমর শাহ্।

সাহেবের অন্য পৌত্রকে[১৯] সোয়াত উপত্যকায় আহ্বান করেন ও তাঁকে রাজগীতে অভিষিক্ত করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের বীরত্ববোধকে সুদৃঢ় করলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, ইংরেজদের কিংবা বিধর্মী হিন্দুদের সংগে আসন্ন যুদ্ধবিগ্রহে কারও মৃত্যু ঘটলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। সোয়াতবাসীদের এই আশংকা অবশ্য কাজে পরিণত হয়নি এবং তাদের রাজাও ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়নি। এখন তাঁর পুত্র[২০] বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে সিত্তানা জিহাদী বসতির কর্তৃত্ব দাবী করছেন এবং এভাবে সোয়াত রাজ্যের উপরেও পরোক্ষে দাবী জানাচ্ছেন।

এভাবে জিহাদীরা সীমান্তে দুই ক্ষেত্রে শক্তি স্থাপন করেছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সীমান্ত আদি জাতিদের মধ্যে প্রচারক পাঠিয়ে বিদ্রোহের আগুন জাগিয়ে রেখেছে। বহু বছর গত হওয়ায় তারা সীমান্তে দস্যুবৃত্তিতে নেমে গেছে, কিন্তু তবুও তারা মধ্যে মধ্যে জিহাদের আগুনে জ্বলে উঠেছে। আমরা পাঞ্জাব অধিকার করার পূর্বে তারা প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং বছরে বছরে ব্রিটিশ শাসিত জিলাগুলি থেকে তাদের বসতিতে নতুন নতুন মুসলমানকে ভর্তি করে নিয়েছে। আমরা কোন সাবধানতা অবলম্বন করিনি, যাতে আমাদের প্রজারা জিহাদী বসতিতে পালিয়ে যেতে না পারে, কিংবা শিখদের উপর হামলা না চালায়; আর শিখরাও এমন একটা অনির্দিষ্ট সংঘবদ্ধ জাতি, যারা কখনো আমাদের মিত্র, আবার কখনো আমাদের শত্রু হিসাবে ব্যবহার করেছে। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের উত্তর ভারতে অনেক বড় বড় নীলকুঠি আছে। তিনি আমায় বলেছেনঃ তাঁর নিযুক্ত ধর্মভীরু মুসলমানদের নিয়মই হচ্ছে তাদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে সিত্তানার বসতির জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া; আর যারা দুঃসাহসী প্রকৃতির, তারা জিহাদী নেতাদের অধীনে কম-বেশী সময়ের জন্যে কাজ করতেও যায়। তাঁর হিন্দু ওভারসীয়াররা যেমন সময়ে সময়ে ছুটির দরখাস্ত করে বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ পালন করতে যায়, সেই রকম ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪৬

১৯ সৈয়দ আকবর শাহ্।

২০ সৈয়দ মুবারক শাহ্।

সাল পর্যন্ত তাঁর মুসলমান পেয়াদারা কয়েক মাসের ছুটি নিয়েছে এই অজুহাতে যে, তাদেরকে জিহাদে যোগদান করতে যেতে হবে।

আমাদেরই কর্তব্যচ্যুতিতে আমাদের প্রজারা জিহাদী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে আমাদের শিখ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। তার জন্যে আমাদের চরম মূল্য দিতেই হবে। ইমাম সাহেব[২১] আমাদের সাম্রাজ্যের জন্যে এবং শিখ সীমান্তের জন্যেও তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নিয়ম করেছিলেন। এভাবে আন্দোলনটা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-মৃত্যুর উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাঁর নিজের মৃত্যুতে তাঁর অনুগামীরা আরও উৎসাহে ইসলাম প্রচারণায় গৌরববোধ করতে লাগলো। তাঁরা দু'জন খলীফা বা প্রতিনিধি, যাঁদেরকে তিনি ১৮২১ সালে পাটনায় নিযুক্ত করেন, সীমান্তে সফর করে জানতে পারলেন, তাঁদের ইমামের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা একটা কেরামতি, আসলে তিনি বেঁচেই আছেন এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি মুজাহিদ বাহিনীর নেতারূপে আবির্ভূত হবেন এবং বিধর্মী ইংরেজদেরকে বহিষ্কার করে দেবেন। অতএব তাঁর নায়েবরা রীতিমতো টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলেন। বিশেষতঃ ইমাম সাহেব ১৮২০-২২ সালে কলকাতা যাওয়ার পথে গংগানদী উপত্যকায় অবস্থিত যে-সব বড় শহরে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, সে-সব শহরেই টাকা-পয়সা সংগ্রহ হতে লাগলো। এভাবে আমাদের রাজ্য থেকে অজস্র ধারায় অসন্তুষ্টের দল জিহাদী বসতিতে জমায়েত হতে লাগলো। পালিয়ে বেড়ানো ঘাতক, পলাতক আসামী, উচ্ছৃংখল লোক, যাদের শান্তিময় পরিবেশে কোনো জীবনোপায় নেই, কিংবা যাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইনে আর কোন নিষ্কৃতি নেই, তারা সকলেই ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম করে উত্তরে আল্লামের নিভৃত গুহায় আশ্রয় নিতে লাগলো। তাদের মধ্যে অবশ্য মহৎ শ্রেণীর লোকও ছিল। যে-সব মুসলমান খ্রীস্টান সরকারের অধীনে নিরাপদে থাকা ধর্মের চোখে

২১ 'Prophet' ও 'Apostle' শব্দে আমি নিঃসন্দেহে সৈয়দ আহমদকেই বুঝিয়েছি। সঠিক অর্থে তিনি ইমাম ছিলেন (এবং অনুবাদে তাহাই বলা হয়েছে) রাজনৈতিক দিক দিয়ে এবং 'ওলী' ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে। আরও সঠিক কথা এই যে, 'Prophet'-এর ধারা শেষ হয়ে যায় ঈসা ও মুহম্মদের পর থেকেই।

হানিকর মনে করতো, তারাও দল বেঁধে সিত্তানার ছাউনিতে হাযির হতে লাগলো। তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলির উপর পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলেই তারা তীব্র উল্লাস উপভোগ করতো। কাবুল যুদ্ধের সময় তারা একটি বাহিনী আমাদের শত্রুর সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিল এবং তাদের এক হাযার সৈন্য মরণপণে আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। কেবল গযনীর পতনের সময় তিনশত জিহাদী ইংরেজদের বেয়নেটের আঘাতে শহীদী মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

আমাদের পাঞ্জাব অধিকারের পর যে ধর্মান্ধতা পূর্বে প্রচণ্ডবেগে শিখদের উপর ফেটে পড়তো, তা-ই শিখদের উত্তরাধিকারী আমাদের উপরে বর্ষিত হতে লাগলো। সিত্তানার জেহাদীদের চোখে হিন্দু ও ইংরেজ সমান বিধর্মী, অতএব সমানভাবেই তরবারির মুখে বিনাশযোগ্য। শিখদের সীমান্তের প্রথমাবস্থায় যে উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় আমরা দিয়েছি বা উপেক্ষা করেছি, এখন উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রচণ্ডবেগে তা-ই আমাদের মাথায় পড়তে লাগলো।

পাটনা কোর্টের নথিপত্রে দেখা যায়, দু'জন খলীফা[২২] সীমান্তে প্রথম অবস্থায় দুর্দান্ত ধর্মান্ধরূপে নাম করেছিলেন। ১৮৪৭ সালে স্যার হেনরী লরেন্স একটি মামলায় এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, পাঞ্জাবে তাঁরা ধর্মের পথে যোদ্ধা[২৩] হিসাবে সুপরিচিত এবং এজন্যে তাঁদেরকে পুলিশ হেফাযতে পাটনায় তাঁদের গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের নিকট থেকে এবং তাদের পক্ষে সমসম্প্রদায়ের দু'জন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে মুচলিকা গ্রহণ করেন এই অংগীকারে যে, ভবিষ্যতে তাঁরা সদ্ব্যবহার করবেন। কিন্তু ১৮৫০ সালে আমি তাঁদের দেখেছি নিম্নবঙ্গের রাজশাহী জিলায় রাজদ্রোহ ছড়িয়ে বেড়াতে। শান্তিরক্ষার জন্যে সেখানেও তারা মুচলিকা দেয়; কিন্তু একই অপরাধ বার বার করার হেতুতে দু'দুবার তারা

২২ ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলী।

২৩ গোযাত্ বা মুজাহেদীন। ওহাবী হিসাবে তাঁরা পরবর্তীকালে চিহ্নিত হন। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

উক্ত জিলা থেকে বহিষ্কৃত হয়।[২৪] ১৮৫১ সালে এই দু'জন খলীকা কাগজে মুচলিকা সম্পাদন করে দিলেও পাটনার গৃহ থেকে দূরে ছিলেন এবং পাঞ্জাবের সীমান্তে তাঁদেরকে বিদ্রোহ ছড়াতে দেখা গিয়েছিল।[২৫]

১৮৫২ সালে তাঁরা চিন্তা করলেন, তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকরী করবার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। আমাদের এলাকা থেকে মানুষ ও টাকা-পয়সা অজস্রভাবে সিত্তানার ছাউনিতে চালান যাচ্ছিল এবং আমাদের সিপাহীদের সংগে রাজদ্রোহাত্মক চিঠিপত্রও পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়েছিল। জিহাদী বসতির সুবিধার দরুন রাওয়ালপিণ্ডিতে চতুর্থ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সংগে তাদের নেতারা গোপনে সুকৌশলে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল; অথচ তারা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলে এই সৈন্যদলকেই প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হতো। এসব চিঠিপত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহী বসতিতে নিয়মিতভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সা চালান করার জন্যে তারা একটা পাকা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ঠিক এই সময়ে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পাঠান, পাটনা শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।[২৬] এই ব্রিটিশ প্রদেশের রাজধানীর বুকে নেতৃস্থানীয় বাশিন্দারা প্রকাশ্যভাবেই রাজদ্রোহ প্রচার করতো। পুলিশেরও এই বিদ্রোহীদের সংগে যোগাযোগ ছিল এবং এদের একজন নেতা[২৭] তাঁর গৃহে প্রায় সাতশো লোককে জায়গা দিয়েছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট আরও বেশী তদন্ত করলে তাকে সশস্ত্র বাধা দেওয়া হবে।

অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তাদেরই এলাকায় সীমান্তের জিহাদী বসতিতে মানুষ ও টাকা-পয়সা চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা একটা বিপ্লবাত্মক

২৪ Proceedings of Magistrate : Rajshahi, Feb 23, 1850.

২৫ Proceedings of Board of Revenue : May 12, 1851.

২৬ ১৯ অগাস্ট, ১৮৫২।

২৭ তাঁর নাম মওলবী আহ্‌মদ উল্লাহ্‌। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উল্লিখিত 'বিপ্লবী আহ্‌মদ উল্লাহ্‌' : মাহে-নও, মে, ১৯৫৭ দেখুন (অ)।

প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর চোখ বুঁজে থাকতে পারলো না। ১৮৫২ সালের হেমন্তকালে এ বিষয়ে লর্ড ডালহৌসি দু'টি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমটির দ্বারা তিনি নির্দেশ দেন যে, এই গোপন প্রতিষ্ঠানটির দিকে তীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে। দ্বিতীয়টিতে তিনি এই প্রসংগ আলোচনা করলেন যে সীমান্তের আদি জাতিদের সংগে যুদ্ধ করা সমীচীন কিনা, কারণ তখন হিন্দুস্থানী জিহাদীরা বিধর্মীদের প্রতি আদি জাতিদের আক্রোশ তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছে। সেই বৎসরেই তারা আমাদের একমাত্র মিত্র আম্বের আমীরকে আক্রমণ করলো। এজন্যে একদল ব্রিটিশ বাহিনী পাঠানো দরকার হয়ে পড়লো। ১৮৫৩ সালে আমাদের কয়েকজন দেশীয় সৈন্যকে শাস্তি দেওয়া হয় বিপ্লবীদের সংগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করার জন্যে।

১৮৫৮ সালের সীমান্ত-যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ অপমান, উৎপীড়ন ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে আমি সে-সবের বিস্তৃত বয়ান দিতে চাইনে। সব সময়েই জিহাদীরা সীমান্তের আদি জাতিগুলিকে ব্যস্ত রেখেছিল ব্রিটিশ শক্তির সংগে বিরামহীন সংগ্রাম-সংঘর্ষে। একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখে বিষয়টার সবই বলা হয়ে যাবে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে আমরা ষোলবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি এবং তার জন্যে তেত্রিশ হাযার স্থায়ী সৈন্যের দরকার হয়েছে; আর ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই যুদ্ধের সংখ্যা হলো কুড়ি বার এবং তার জন্যে দরকার হয়েছে ষাট হাযার স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী সৈন্য আছে এবং পুলিশ তো আছেই। এই সময়ে সিত্তানা বসতি যদিও স্থায়ীভাবেই সীমান্তে ধর্মান্ধতা জাগিয়ে রেখেছিল, তবু আমাদের সৈন্যের সংগে সামনাসামনি যুদ্ধ তারা চালাকির সংগে এড়িয়ে গেছে। তারা হয়তো আদি জাতিগুলিকে সাহায্য দিয়েছে, কারণ, তারাই এই জাতিগুলিকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত রেখেছে; তবুও আদি জাতিদের হয়ে তারা সরাসরি যুদ্ধে নামেনি। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে গেল[২৮] এবং তারপর তারা স্পর্ধার সংগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরই সাহায্য চেয়ে বসলো তাদের যাকাত আদায় করে

২৮ বিশেষত, ইউসফজাই ও পঞ্জতর আদি জাতি।

দিতে। আমাদের অস্বীকারে তারা জ্বলে উঠলো এবং তীব্র গতিতে আমাদের এলাকায় হামলা করে সহকারী কমিশনার লেফটেন্যান্ট হর্ন সাহেবের শিবিরে রাত্রিকালে এমন আক্রমণ চালালো যে, তিনি অতিকষ্টে পলায়ন করে প্রাণে বাঁচলেন। অতঃপর প্রতিশোধ না নিয়ে আর থাকা যায় না এবং জেনারেল স্যার সিড্‌নি কট্‌ন পাঁচ হাযার সৈন্য নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করলেন।[২৯] আমাদের সীমান্তে জিহাদী বসতির এটাই প্রথম সংঘর্ষ। এজন্যে এ বিষয়ে আর বিশদ আলোচনা না করে ১৮৬৩ সালে যে দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয়েছিল, দৃষ্টান্ত হিসাবে তারই বর্ণনা দেওয়া যাক। কিছুটা অসুবিধার পর আমাদের সৈন্যদল বিদ্রোহী জাতিগুলির গ্রামসমূহ জ্বালিয়ে দেয়, তাদের দু'টি প্রসিদ্ধ কিল্লা উড়িয়ে দেয় এবং সিত্তানার বিদ্রোহী বসতি ধ্বংস করে দেয়। বিদ্রোহীরা কিন্তু মহাবন পর্বতের জংগলে আত্মগোপন করে রইলো এবং তাদের শক্তি এমনই অক্ষুন্ন থেকে গেল যে, স্থানীয় আদি জাতি[৩০] তাদেরকে মুল্‌কায় একটা নতুন বসতি করবার অনুমতিও দিল।

জিহাদী বসতির অবশ্য ব্রিটিশ বাহিনী ছাড়া আরও শত্রু ছিল। তারা মাঝে মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়িয়া জাতিগুলির নিকট থেকে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করতো; তবে আদায়কারী প্রচারকের ব্যক্তিগত প্রভাবে ইতর-বিশেষে এ-সব টাকা কখনও আদায় হতো, কখনও টালবাহানা হতো, আবার কখনও একেবারে অস্বীকৃত হতো। এজন্যে পাহাড়িয়াদের মধ্যে এই নিয়ে উষ্মাও বিদ্যমান ছিল। আমরা দেখেছি, কেবল এই বিষয়েই ইমাম সাহেবের সংগে কিরূপ শোচনীয় মনোমালিন্য ঘটে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তাঁর পতন ও মৃত্যু হলো। কোনো আদি জাতি যাকাত দিতে অস্বীকার করলে জিহাদী বসতির লোকেরা একযোগে তাদের উপর হামলা করে জমির ফসল কেটে নিয়ে সরে পড়তো। ১৮৫৮ সালে এই ধর্মীয় কর পরিশোধ করার অস্বীকৃতিটা এমন চরম পর্যায়ে উঠে যে, সিত্তানার উপরও আক্রমণ হয় এবং তার প্রধান নেতা[৩১] নিহত হন। এভাবে বিদ্রোহী বসতি স্যার সিড্‌নি

২৯ গোলন্দাজ ২১৯, অশ্বারোহী ৫৫১, পদাতিক ৪১০৭ স্থায়ী সৈন্য।

৩০ আমাজাই জাতি।

৩১ সৈয়দ উমর শাহ্, আমাজাইদের দ্বারা নিহত।

কটনের অভিযানে ও গোঁড়া মিত্রদের দলত্যাগে দুর্বল হয়ে প্রায় দু'বৎসর চুপচাপ রইলো। যেই আদি জাতি[৩২] যাকাত আদায়ে বাধা দিয়েছিল ও জিহাদী নেতাকে হত্যা করেছিল, আমরা তাদেরকে সিত্তানার জমিগুলো দিয়ে দিলাম এবং এই আদি জাতি ও আর একটি আদি জাতির[৩৩] নিকট এই শর্ত আদায় করে নিলাম যে, তারা কখনও জিহাদীদেরকে তাদের এলাকায় ঢুকতে দেবেনা এবং তৃতীয় কোন আদি জাতি তাদেরকে আনয়ন করতে চেষ্টা করলে তার সংগে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তারা আরও মুচলিকা দিল যে, তাদের এলাকার ভিতর দিয়ে কোনো মুজাহিদকে চলাচল করতে কিংবা ব্রিটিশ সীমান্তে লুটপাট করতে তারা দেবে না।

কিন্তু দু'বৎসর পার না হতেই জিহাদীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়িয়া জাতিগুলির মধ্যে নিজেদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে নিল। ১৮৬১ সালে জিহাদীরা মুল্কা থেকে—সেখানে স্যার সিড্‌নি কট্‌ন তাদেরকে ১৮৫৮ সালে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন—অর্থাৎ মহাবনের আভ্যন্তরীণ আশ্রয় থেকে অগ্রসর হয়ে সিত্তানায় তাদের পুরানো বসতির ঠিক উপরে[৩৪] একটা ঘাটি তৈরী করলো। এই ঘাটি থেকে তারা বের হয়ে আমাদের গ্রামগুলিতে হামলা করতো; আর যে আদি জাতিরা তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারাই তাদেরকে নিজেদের এলাকার ভেতর দিয়ে গুম করার হামলা চালাতে পথ খুলে দিল। এভাবে পুরানো আমল ফিরে পাওয়ার জয়োল্লাসে জিহাদীরা আমাদের রাওয়ালপিণ্ডি জিলাতেও হামলা করলো এবং প্রকাশ্য দিবালোকে, সদর রাস্তার উপর ও একটা জবরদস্ত থানার নযরের মধ্যেই দু'জন পথিককে খুন করে গেল[৩৫]। তিন সপ্তাহ পরেই তারা আবার আমাদের এলাকায় নেমে এসে তিন জন মালদার ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে গেল এবং তারপর নিরীহভাবে আমাদের কর্মচারীদের সংগে চিঠি লেখালেখি শুরু করে দিল আমাদেরই প্রজার মুক্তি-মূল্য হিসাবে পনরোশো টাকা দাবী

৩২ আমাজাই জাতি।

৩৩ জাদুন জাতি।

৩৪ সিরি-তে।

৩৫ ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২।

করে। এই টাকার অর্ধেকটা পাওনা ছিল জিহাদী নেতার; আর একটা গুম্ করা হামলা হয়েছিল কিছু পরে, ১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে। সীমান্তের কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট পাঠালো, ১৮৫৮ সালের মতো পুরানো লজ্জাকর হাংগামায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বৃথাই ব্রিটিশ কর্মচারীরা আদি জাতিদের ধর্মবুদ্ধি ও আতংকিত অবস্থার দোহাই দিয়ে তাদের সৎপথে আনবার চেষ্টা করলো। যদিও তাদের কয়েকটা গ্রাম আমাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, তবু তারা স্বধর্মীদের সংগেই ভাগ্য বেঁধে ফেলেছিল। অতএব এ অবস্থায় প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তখন আমরা দোষী আদি জাতিদেরকে কঠিন অবরোধে ফেলে দিলুম এবং এরকম পরিপাটিরূপে বহির্বিশ্বের সংগে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো যে, যে-কেউ সীমানা অতিক্রম করতে সাহস করলেই সংগে সংগে তাকে বন্দী করা হতো। এতেই তাদের চৈতন্যোদয় হলো। আবার তারা আমাদের সংগে শর্তাধীনে আসতে বাধ্য হলো এবং বিদ্রোহী বসতির লোকদিগকে সিত্তানা ত্যাগ করে মুল্‌কার গভীর জংগলে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করলো।

এ-সব সত্ত্বেও আমাদের বিদ্রোহী হিন্দুস্তানী প্রজারা বিদ্রোহী ছাউনিতে নিয়মিতভাবে জমায়েত হতে লাগলো এবং ১৮৬২ সালে তাদের সংখ্যা এভাবে বেড়ে গেল যে, পাঞ্জাব সরকার আর একটা সীমান্ত যুদ্ধের সুপারিশ করতে বাধ্য হলেন। বাস্তবিক, অবস্থা তখন এমন চরমে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ভারত সচিব তাঁর এই প্রত্যয় জানাতে বাধ্য হলেন[৩৬]: আজ হোক, কাল হোক, বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্রবলে বিতাড়িত করতেই হবে তারা যতক্ষণ আমাদের সীমান্তে অবস্থান করবে, ততক্ষণ তারা স্থায়ীভাবে বিপজ্জনক হয়েই থাকবে; কিন্তু সংগে সংগে একটা অভিযানের ব্যবস্থা করাও তখন অসম্ভব ছিল, অথচ ১৮৬৩ সালের এপ্রিলের প্রথমেই তারা আমাদের এলাকায় খুন-লুণ্ঠন করে গেল। জুলাই মাসে তারা দুঃসাহসে নির্ভর করে সিত্তানার বসতি পুনর্দখল করলো এবং আমাদের করদ আম্বের আমীরকে ভীতিপ্রদ সংবাদ পাঠাতে লাগলো। নিকটবর্তী আদি জাতিরা পুনরায় বিশ্বস্ততা বিসর্জন দিয়ে ধর্মান্ধতা বরণ করলো

৩৬ ডেসপ্যাচ: ৭ই এপ্রিল, ১৮৬২।

এবং সব সন্ধি-শর্ত হাওয়ার মুখে উড়িয়ে দিল। পুনরায় বিদ্রোহী বসতি সীমান্তে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলো। ১৮৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে জিহাদী বাহিনী ব্রিটিশ এলাকায় হামলা করে এবং রাত্রিযোগে আমাদের টহলদারী সৈন্যদের ছাউনী আক্রমণপূর্বক প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক সপ্তাহ পরেই তারা আমাদের অধীনস্থ আম্বের উপর অভিযান করে, কালাপাহাড়ের উপরে বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং কয়েকটা ঘাঁটিতে যুদ্ধও করে। সেই মাসের মধ্যেই তারা আমাদের থানাওয়ালের মিত্র-সৈন্যদের উপর হামলা চালায় এবং কয়েকজন লোকসহ একজন দেশীয় কর্মচারীকে হত্যা করে। তারা আমাদের মিত্রদের উপরেই হামলা চালিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, সিন্ধুনদের তীরের উপর আমাদের ছাউনিতেও গুলী চালায় এবং একটা ফতোয়া জারী ক'রে বিধর্মী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও প্রত্যেক ধর্মভীরু মুসলমানকে এই জিহাদে যোগ দিতে আহ্বান করে।

অতএব ১৮২৭-৩০ সালে জিহাদী বাহিনী কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত ও সীমান্তের রাজধানীর পতন হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল আমরা পুনরায় সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলুম। অতঃপর যুদ্ধ এড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সীমান্তের অভিযানগুলো অবশ্য সামরিক সাফল্যের দিক দিয়ে মোটেই শিক্ষাপ্রদ নয়। বলিষ্ঠ শক্তির পক্ষে সে-সব খুব সুনামেরও নয়; আর ব্রিটিশ ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির সংগে অসভ্য আদি জাতিদের জোটের সংঘর্ষকালে ফলাফল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকার কথাও উঠে না—তা সে জাতিগুলো যতোই দুঃসাহসী হোক এবং যতোই তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল হোক। তাছাড়া এ-সব অভিযানের একটা বাঁধাধরা রূপ আছে এবং পরিণামে দারুণ প্রতিশোধ গ্রহণেরও নিশ্চয়তা আছে—যার ভয়াবহতা প্রত্যেক খ্রীস্টানকে পীড়িত ও ব্যথিত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি জিহাদী বসতির সংগে আমাদের একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেব। তার দ্বারা এটাই সুপরিস্ফুট হবে যে শান্তির সময়ে সীমান্তে জিহাদী বসতির অবস্থিতিটা কয়েক বৎসর ধরে যেমন কলংককর হয়ে উঠেছিল, সেই রকম যুদ্ধের সময় আমাদের সৈন্যদের

৩৭ নওয়াজিরান নামক স্থানে।

পক্ষেও সেটা বার বার দারুণ আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতোদিন আমরা জিহাদীদের দিকে নজর দিইনি, ততোদিন তারা দলে দলে হামলা করে আমাদের প্রজা ও মিত্রদের ধরে নিয়ে গেছে কিংবা খুন করে ফেলেছে; আর যখন শক্তি প্রয়োগে তাদের নির্মূল করতে আমাদের সৈন্যদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করেছে এবং অনেককাল ধরে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত-বাহিনীকে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রেখেছে।

আমাদের সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মান্ধ প্রজাদের সাহায্যপুষ্ট একটা বিদ্রোহী ও নির্বাসিতের বসতি তীব্র হিংসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে, এটা বোঝা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে, একটা সুসভ্য দেশের সেনাবাহিনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহু কাল টিকে থাকতে পারে। এ বিষয়টি বিশদভাবে বোঝাতে হলে প্রথমেই দরকার হয়ে পড়ে ইমাম সাহেব যে অঞ্চলে তাঁর সামরিক সম্প্রদায়ের প্রধান ঘাটি স্থাপন করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া।

সিন্ধুনদ উপত্যকার একেবারে উত্তর দিকে, যেখানে ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ আদি জাতি প্রত্যন্তে বাস করে, যেখান থেকে হিন্দু জাতির পরম পবিত্র পর্বতশিখরের আরম্ভ হয়েছে, সে অঞ্চলের নাম মহাবন যার আক্ষরিক অর্থ বিরাট অরণ্য। আদিম আর্যজাতি দক্ষিণাভিমুখে সফরকালে মহাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও বিন্যাসে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হয়। তারা পর্বতটির নাম রাখে মহাবন এবং তার শিখরগুলি ও পর্বতশ্রেণী, যা সিন্ধুনদের তীরভূমির চেয়ে সাত হাযার চারশো ফুট উচ্চে, সে সমস্তই আজও মহাবন নামে সুপরিচিত। সিনাই পাহাড় য়িহূদী জাতির নিকট যতখানি প্রিয় এই পর্বতচূড়াগুলি তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ততখানি প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে আদিকালে ভক্তিপূজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এবং যুগ যুগ ধরে মহাবন ধর্মভীরু হিন্দুদের নিকট তীর্থভূমি হয়ে এসেছে। এই পবিত্র শিখরদেশে অর্জুন একাকী দেবাদিদেবের [৩৮] সংগে যুদ্ধ করেন এবং অতীতের যেকবের

৩৮ মহাদেব।

মতো পরাজিত হলেও তিনি পাশুপত অস্ত্রলাভে ধন্য হয়েছিলেন।[৩৯] ধন্য সেই মহর্ষি, যিনি মহাবনের মহচ্ছায়ায় দেহাস্থি রক্ষা করেছিলেন। পুরান-কাহিনীতে বলে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতারাও সেখানের স্বর্গীয় পরিবেশে উপবাস ও তপস্যার দ্বারা দুর্বলতা ও পাপক্ষয় করতেন[৪০]।

আদিম হিন্দুদের ধ্যানমণ্ডিত এই পবিত্র ধামে এখন একদল হাঙ্গামাবাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদি জাতি বাস করছে। ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য, যারা কম হিংস্র ও কম ধর্মান্ধ নয়, সিন্ধুনদের তীরে পূব দিকের কালাপাহাড় জুড়ে অবস্থিত। এবটাবাদে অবস্থিত একদল অগ্রগামী ব্রিটিশ সেনাদলের শ্যেনদৃষ্টি তাদেরকে সর্বদা সংযত রাখছে। যাকাত ও এই শ্রেণীর ধর্মীয় কর আদায়ের প্রশ্নে তাদের ও জিহাদী বসতির মধ্যে স্থায়ী জোট হওয়ার বাধার সৃষ্টি করলেও এ সব আদি জাতি ধর্মীয় উত্তেজনায় সহজেই মেতে উঠে এবং আমাদের সীমান্তে অবস্থিত হিন্দু সম্পদশালী গ্রামগুলিতে লুটপাট চালাতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে। সোয়াত রাজ্যে অবস্থিত মুসলিম ধর্মনেতা আখন্দ সাহেবের প্রায় ছিয়ানব্বই হাযার মুরীদ আছে এবং তাদের প্রত্যেকেই জন্মাবধি ব্রিটিশ আক্রমণের সম্ভাবনায় শংকিত; আর এজন্যে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেছে যে, এই বিধর্মীদের সংগে যখন যুদ্ধ করতেই হবে, তখন একজন ইমাম সাহেবের অধীনে থাকাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তাঁর নিশানার নীচে যুদ্ধকালে কেউ প্রাণত্যাগ করলে তার শহীদী মর্যাদালাভ অবধারিত। ১৮৬৩ সালের অভিযানকালে আমরা এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে জিহাদী বসতির সংগে যুদ্ধ করতে হলে পৃথিবীর সবচেয়ে বীরত্বমণ্ডিত আদি জাতিদের তিপ্পায় হাযার যোদ্ধার মিলিত

---

৩৯ তুলনা করুন :

যদা অশ্রৌশম দেবদেবং ত্র্যম্বকং তোষ্য যুদ্ধে
অবাপ্তবন্তম্ পাশুপতম্ মহাস্ত্রম্...

—মহাভারত : ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ : (অ)।

৪০ এখানে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি সাত বৎসর পূর্বে লেখা ও Calcutta Review-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের ব্যবহার করেছি।

শক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে[৪১]। এই অঞ্চলের অনতিক্রম্য অবস্থায় দরুন আদি জাতিদের মন ও মেজাজ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের কর্মচারীদের মনে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে; আর এজন্যে যখনই বিদ্রোহী বসতি যুদ্ধে মার খেয়েছে, তখনই মহাবনের গভীর জংগলে আশ্রয় নিয়ে তারা বেঁচে গেছে।

১৮৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর সাত হাযার ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে জেনারেল স্যার নেভীল চেম্বারলেন্ অগ্রসর হলেন এবং তাঁর পিছনে রইলো একদল গোলন্দাজ সৈন্য এবং চার হাযার খচ্চর ও অন্যান্য ভারবাহী পশু। সারা পাঞ্জাব তোলপাড় করে এ-সব সংগৃহীত হয়েছিল। পরের দিন একদল সৈন্য অগ্রসর হয়ে রাত্রিযোগে ঝোপ ও গাছপালায় পরিপূর্ণ গিরি-সংকটে উপস্থিত হলো, যা হতভাগ্য আম্বালা গিরিপথ নামে পরিচিত। আমাদের যুদ্ধচালনার ক্ষেত্র শক্তিশালী সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং তার পশ্চাদভূমিতে ছিল অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত শক্তিশালী সীমান্ত-ঘাটিগুলি। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, আক্রমণকারী সৈন্যদলের পিছনে এ রকম শক্তিশালী সহায়ক ছিল। কারণ, ২০শে তারিখে জেনারেল সাহেব লক্ষ্য করলেন, যে-সব আদি জাতিকে মিত্রভাবাপন্ন মনে করা হয়েছিল, তারা সকলেই ইতস্ততঃ করছে এবং দু'দিন পরেই তিনি সরকারকে তারবার্তায় জানাতে বাধ্য হলেন যে, গিরিপথ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাঁর সৈন্যদল থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। ২৩শে তারিখে আদি জাতিরা প্রতিরোধে ফেটে পড়লো। বনায়ের জাতি আমাদের টহলদারী সৈন্যদলকে আক্রমণ করলো এবং দু'দিন পরেই সোয়াত রাজ্যের আখন্দ সাহেব[৪২] আমাদের শত্রুপক্ষের সংগে হাত মিলালেন। ইতিমধ্যে সীমান্ত থেকে সরকারের নিকট তারের পর তারে খবর আসতে লাগলো, আরো—আরো বেশী

৪১ আমি এই সংখ্যা লাভ করেছি বিনা আয়াসে Foreign Office Records থেকে। ১৮৬৩ সালের এক সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষাট হাজার সৈন্য অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়েছিল।

৪২ এই ধর্মীয় শাসকের নাম আবদুল গফুর। তিনি দীর্ঘকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউসুফজাই আদি জাতির উপর কর্তৃত্ব করেছিলেন। সমস্ত পাঠান উপজাতি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো।

সৈন্য চাই। ফল এই হলো যে, আমাদের সৈন্যদল এক বিপজ্জনক গিরিসংকটে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। ফিরোজপুর রেজিমেন্টের একটা অংশকে তখনই সীমান্তে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেওয়া হলো। পেশোয়ার থেকে আর একটি রেজিমেন্টকে পশ্চিমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিয়ালকোট থেকে ৯৩ নম্বর হাইল্যাণ্ডার্স ও লাহোর থেকে ২৩ ও ২৪ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে জোরকদমে অগ্রসর হতে বলা হলো। এভাবে তিন সপ্তাহ পার হতে না হতে পাঞ্জাবের বিভিন্ন ছাউনি থেকে সৈন্যদেরকে এভাবে সরিয়ে ফেলা হয় যে, ছোট লাট সাহেব সফরে এলে মিয়ান্‌মীরের প্রধান সেনানায়ক অতিকষ্টে মাত্র চব্বিশ জন বেয়নেটধারীকে সংগ্রহ করে তাঁর শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইতিমধ্যে আদি জাতিরা আমাদের সৈন্যদলের নিকটবর্তী হতে লাগলো। তখন সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, আবার পিছনে হটা পরাজিত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক। আমাদের এই পরিস্থিতিতে আদি জাতিরা সবরকম সুবিধা পেলো; কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই এ রকম পাহাড়িয়া সংঘর্ষে সুশিক্ষিত। একজন কর্মচারী-লিখিত জার্নাল থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিই আমাদের সৈন্যদল যে কি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, তার সাক্ষ্য দেয়ঃ

"২০শে তারিখে দূরের দলগুলিকে ডাক দিয়ে তারা ফিরে গেল, কিন্তু সমস্ত রাস্তাটাই তারা লড়তে লড়তে গেল। সন্ধ্যার আগে তারা পৌঁছাতে পারেনি। দুশমনরা বেশ বলশালী। তারা আমাদের শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন সকলেই তৈরী হয়ে গেছে এবং এনফিল্ড রাইফেল থেকে শ্রেণীবদ্ধভাবে গুলী ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়িয়া বন্দুক থেকেও ছোট ছোট গুলীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাতের এই আক্রমণ এক ছায়াছবির সৃষ্টি করেছে। সামনে গভীর জংগলের কালো রেখা, ডাইনে ও বামে দু'টি ছিদ্রপথে পাহাড়িয়া ট্রেনের আলো জ্বলছে তারকার মতো, আর তাদের মাঝখানে একটা আবছা রেখার মতো পদাতিক বাহিনী ছড়িয়ে আছে উপত্যকার উপর দিয়ে। হঠাৎ বিকট চিৎকার শোনা গেল, 'আল্লাহ্! আল্লাহ্!' গাছের ছায়ার পেছন থেকে বন্দুক জ্বলে উঠলো, শব্দ করে উঠলো। তারপর ঘোরানো তরবারি ঝকমক করতে লাগলো

এবং ছায়ার মতো চেহারাগুলি খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে এলো ও বেয়নেটের ঠিক কাছাকাছি হামলা করতে লাগলো। তারপর আগুনের ঝলকানি ও ভীষণ শব্দ ; ছর্‌রা ও টোটা মাটীতে আছড়ে পড়লো, ঘন পাতার ভেতর দিয়ে পট্‌পট্‌ শব্দ উঠলো। সমস্ত লাইনে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সবাই গুলী ছুঁড়ছে। ধোঁয়া যখন পরিষ্কার হয়ে এলো, দেখা গেল, দুশমনদের কোনো চিহ্ন নেই। সামনে থেকে দু'একটা আর্তনাদ ও পাঠানী ভাষায় পানির জন্যে চিৎকার থেকে জানা গেল যে, গুলী ছোঁড়া একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সহসা অন্য দিক থেকে দু'একটা গুলী ছুটে আসে। পাহাড়ের দু'একটা পাথর গড়ানো শব্দে দেশীয় সৈন্যরা চট করে জেনে ফেলে, দুশমনরা পাশ থেকে আক্রমণ করছে। তখন আমাদেরও রাইফেলগুলো হুংকার দিয়ে উঠে এবং সে শব্দ অতি-দূরের কালো পাহাড়ের ধার পর্যন্ত ছুটে যায়। যুদ্ধের এই হুংকার পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধ্বনিত হয়ে হাযারো গুণে প্রতিধ্বনি তোলে এবং সমগ্র উপত্যকা কেঁপে কেঁপে উঠে। তারপর আবার চিৎকার উঠে, আবার হামলা চলে ছর্‌রা ও গুলীর। তারপর আগের মতোই তা থেমে যায়। এইবার দেখা যায়, কালো কালো মূর্তি আমাদের লাইনে ফিরে আসছে, আর দরদ দিয়ে বয়ে আনছে ভারী ভারী বোঝা। তখন আমরা বুঝি দুশমনের গুলীতেও কাজ করেছে।

"সহসা লাইনের মাঝখান থেকে গম্ভীর আদেশের সুর বেজে উঠে। সকলেই তখন তটস্থ হয়ে শোনে ও হুকুম পালন করতে তৈরী হয়। হুকুম আসে, 'গুলী বন্ধ করো, ওদেরকে বেয়নেটের নিকট পর্যন্ত আসতে দাও, আর তার পরেই…' আর সুর শোনা যায় না। কিন্তু প্রতিটি সৈন্য বুঝে নেয়, কিভাবে হুকুম শেষ হয়ে গেল, আর নিজের নিজের হাত গুটিয়ে নেয়, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তখন আগেকার হুংকারের সংগে কি অদ্ভুত তফাৎ মনে হয়। সামনের উঁচু গিরিশৃংগের মতো তখন আমাদের জেনারেলের সর্বোচ্চ শরীরটা সমস্ত বাহিনীর মাথার উপরে নযরে ভেসে উঠে। তিনি তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছেন। বাহ্যতঃ তারা অবশ্য উচিত শিক্ষাই পেয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ গুলীর আওয়াজে

জানিয়ে দেয় যে, দুশমনদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই, তারা এখনো আমাদের সামনের জংগলে অবস্থান করছে। সহসা সে-সব আওয়াজও থেমে যায়। কিন্তু বহুক্ষণ পরে তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায় এবং তাদের চলাপথের পাহাড়ে পাথরও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। তখন বিশ্বাস হয়, তারা নিশ্চয়ই হতাহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা না হলে তারা আরও চুপি চুপি সরে পড়তো।"[৪৩]

প্রত্যেক দিনের দেরীতে দুশমনের আশা-ভরসা বাড়ালো এবং তাদের ধর্মান্ধতাও বৃদ্ধি পেলো। সাহায্য এসে পৌঁছালেও আমাদের জেনারেল সাহেব দেখলেন, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ সৈন্য ভীতত্রস্ত হয়ে গিরিপথেই আটক রইলো, চুমলা উপত্যকায় বের হতে সাহস পেলো না। ইতিমধ্যে দুশমনরা বাজৌর আদি জাতির যোগদানে বর্ধিত সংখ্যায় একযোগে আমাদের সামনে, বাম দিকে ও পিছনের যোগাযোগ-ব্যবস্থায় ভয় প্রদর্শন করতে লাগলো। পাঞ্জাব সরকার ৮ই নবেম্বর তারিখে উদ্বেগ সহকারে জানতে চাইলো, আরও ষোলশো পদাতিক বাহিনীর সাহায্য পেলে জেনারেল সাহেব সামনে অগ্রসর হয়ে মুল্‌কার জিহাদী বসতি ধ্বংস করতে সমর্থ হবেন কি-না। ১২ই নবেম্বর তারিখে জওয়াব গেলো আরও দু'হাযার পদাতিক বাহিনী এবং কতকগুলি কামান পাওয়া গেলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে। আরও হতাশ সংবাদ পাওয়া গেল যে, মধ্যবর্তী আদি জাতিদের সংগে যতক্ষণ সন্ধিশর্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ জেনারেল সাহেব মুল্‌কার দিকে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ করেন না।

সারা সীমান্তে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। ৪ঠা নবেম্বর পাঞ্জাব সরকার জংগী লাইনটা এমন সৈন্যশূন্য দেখতে পেলো যে, বড়লাটের ছাউনি থেকে একদল রক্ষী ধার নিয়ে অতি শীঘ্র সীমান্তে পাঠিয়ে দিল; আর একদল শক্তিশালী জংগী পুলিস, অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে পিছনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা অটুট রাখবার জন্যে পাঠানো হলো, কারণ দুশমনরা এদিকে ভয় প্রদর্শন করছিল। জংগী মালামাল সরবরাহের জন্যে ৪২০০ উট ও ২১০০ খচ্চর আমাদের পাঞ্জাব জিলা থেকে বহু ব্যয়ে সংগৃহীত

৪৩ Calcutta Review - vol. Lxxix, p. 201.

হলো ও জোরকদমে পাঠিয়ে দেওয়া গেল।[৪৪] ১৪ই নবেম্বর পরিস্থিতি বিপজ্জনকভাবে মোড় নিল। তখন ভারতীয় ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ লাহোরে ঝটিতি উপস্থিত হলেন এবং স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন।

সত্য কথা এই যে, এই অভিযানের সব প্লানই একেবারে বানচাল হয়ে গেল। প্রথমে মতলব ছিল যে, গিরিপথের ভেতর দিয়ে অতর্কিত হামলায় দূরের সমস্ত উপত্যকাভূমি দখল করে নেওয়া হবে[৪৫]। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু ১৪ই তারিখে আমাদের বাহিনী দেখলো, তখনও গিরিপথ থেকে বের হওয়া অসম্ভব। অতএব খোলা উপত্যকায় যুদ্ধ করার অসম্ভব অবস্থায়, যদিও এ রকম যুদ্ধে সভ্য-জগতের যুদ্ধোপকরণ উপযুক্তভাবেই ব্যবহার করা যেতো, আমাদেরকে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশে আত্মরক্ষার্থেই ব্যস্ত থাকতে হলো। সেই দিনই পাঞ্জাব সরকার আবেদন জানায়, পনেরোশো সৈন্যের একটি অতিরিক্ত দল যেন সীমান্তে পাঠানো হয়। ১৯শে তারিখে জেনারেল চেম্বারলেনের যে টেলিগ্রাম আসে, তা থেকে রীতিমতো আশংকা হয় যে, সাহায্যকারী সৈন্যদল বোধ হয় পৌঁছাতে বড় বেশী বিলম্ব করে ফেলবে। ১৮ই তারিখে দুশমনরা সবলে আমাদের আক্রমণ করে ও একটা ঘাটি দখল করে নেয় এবং আমাদের পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের একশ চৌদ্দ জন সিপাহী হতাহত হয়, তাছাড়া কিছু কর্মচারীও যায়। পরদিন শত্রুপক্ষ আমাদের আর একটা ঘাটি দখল করে ফেলে। পরে অবশ্য বহু রক্তক্ষয়ে আমরা সেটি পুনর্দখল করি। কিন্তু আমাদের খোদ জেনারেল সাহেবই মারাত্মকভাবে জখম হন এবং একশ আঠার জন সিপাহী ও কর্মচারী নিহত হয় অথবা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

---

৪৪ Punjab Government Letter of the 18th. Feb., 1864, para 67

৪৫ Letter of the Punjab Government, dated Lahore, 1st. Feb, 1864, para 78. এই দলিলটির উপরেই এই অভিযানের তথ্য সম্বন্ধে আমি বেশী নির্ভর করেছি। এইরূপ শোচনীয় অভিযানের বিবরণে প্রতিবাদ উঠবে না, আশা করা শক্ত। তবে আমি যা কিছু বলেছি, নির্ভরশীল সরকারী নথিপত্র থেকে বলেছি।

২০শে তারিখে যে-সব আহত ও রুগ্ন সিপাহীকে পাঠিয়ে দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় চারশ পঁচিশ জন। ১৯শে তারিখে জেনারেল সাহেবের যে টেলিগ্রাম আসে, তার বাণী ছিল : গত একমাস ধরে সৈন্যদল দিন-রাত পরিশ্রম করছে। এখন নতুন দুশমনদের সংগে মুকাবিলায় তারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা ভয়াবহ। আমাদের আরো বেশী সাহায্য চাই-ই। শত্রুপক্ষের আক্রমণ সামলে নিয়ে রসদের যোগান ঠিক রাখা ও আহতদের পিছনে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সত্যিই কষ্টকর। যাদের সংখ্যা ও মনোবল কমে যাচ্ছে, তাদের বদলে নতুন বাহিনী পাঠাতে পারলে সাহায্যপ্রাপ্ত দলকে পিছনে পাঠিয়ে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটা অত্যন্ত জরুরী।

তখন একটা মারাত্মক রকমের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যদল দৈনন্দিন আক্রমণে ক্লান্ত হয়ে যে-কোন সময় আতংকগ্রস্ত হওয়ার অবস্থায় গিরিপথের ভেতর দিয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হতে পারতো ও সংখ্যাহীনভাবে নিঃশেষও হতে পারতো। এ রকম ব্যর্থ অভিযানে সামান্য লোকক্ষয় হয়েও একটা যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে সীমান্তে আমাদের মর্যাদা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো ; আর তার ফলে এমন রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় ঘটতো, যার পরিণাম চিন্তা করাও অসম্ভব। অতএব পাঞ্জাব সরকার স্থির করেন, জেনারেল চেম্বারলেন উপযুক্ত বিবেচনা করলে সমস্ত বাহিনীকে পারমৌলিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু পাঞ্জাব-কর্তৃপক্ষের সাবধানতা বৃটিশ সৈন্যের অনমনীয় মনোভাবকে তুচ্ছ বিবেচনা করেছিল। ২২শে তারিখে টেলিগ্রাম এলো, আমাদের সৈন্য বর্তমান অবস্থার মধ্যেই টিকে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যদিও দুর্দশার পরিমাণ বেশী, তবু জেনারেল নিশ্চিত আশা রাখেন, জয় শেষ পর্যন্ত হবেই।

পরদিন ২৩ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটা অংশ কয়েক জন ইউরোপীয়ানসহ আমাদের ছাউনিতে হাযির হলো। শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই তার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেছিল। এখন আমাদের নতুন সৈন্য আমদানিতে তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো। তারা বেশ বুঝতে পারলো, তাদেরকে একটা বিশাল সামরিক সাম্রাজ্যের অফুরন্ত শক্তি-সম্পদের মুকাবিলা করতে হবে। পরবর্তী শুক্রবারটা (সপ্তাহের এই দিনই জিহাদীরা

সাধারণতঃ যুদ্ধ করতো) বিনা আক্রমণে কেটে গেল। তবু আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারলুম না এবং ২৮শে নবেম্বর তারিখে আমাদের বাহিনীর অনড় মনোভাবের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে জোর তাগিদ দিয়ে পাঞ্জাব সরকার বৃথাই এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন। আমাদের সাহায্যদল উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আদি জাতিও পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। একজন সরদারের[৪৬] অধীনেই এলো তিন হাযার লোক এবং একজন দরবেশই[৪৭] পাঁচশো মুজাহিদ নিয়ে এলেন হয় শহীদ হতে, নয় জয়লাভ করতে।

৫ই তারিখে আমাদের সমস্ত সাহায্যকারী দল হাযির হলো। তখন আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হতে জোর তাগিদ দেওয়া হলো। আমাদের স্থায়ী বাহিনীর সংখ্যা হলো নয় হাজার। তার মধ্যে কয়েকটি বাছাই বাছাই দল ছিল, যেমন ৯৩ নম্বর হাইল্যাণ্ডার্স। তাছাড়া অস্থায়ী সৈন্যও ছিল। তখন এটা বিশ্বাস করাই অসম্ভব হয়ে উঠলো যে, এ রকম শক্তিশালী বৃটিশ বাহিনী এভাবে গিরিপথের মধ্যেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আটক হয়ে থাকবে, আর শত্রুপক্ষ যখন তাদের হামলা করে হয়রান করবে, তখন তারা প্রত্যাঘাতও করতে পারবে না। সীমান্তের আদিবাসীদের উপর এই জিহাদী বসতির প্রভাবকে আমরা কিন্তু খুব তুচ্ছ মূল্য দিয়েছিলুম। যারা শুধু দ্বীনের জন্যে তাদের সংগে হাত মিলিয়েছিল, তারা লুটপাটের আশায়, না হয় শহীদ হওয়ার জন্যে টগবগ করতে লাগলো। আর যারা কম গোঁড়া, তারা ব্রিটিশবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার কিংবা তাদের বাসভূমি যুদ্ধস্থলে পরিণত হওয়ার আতংকে শত্রুপক্ষের দলে ভিড়লো। অতএব আদি জাতিরা জিদের কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বশবর্তী হয়ে সুসভ্য বাহিনীর সব প্রচেষ্টা তুচ্ছ করে রুখে দাঁড়ালো। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সীমান্ত পরিস্থিতির এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন :

> চতুর্দিকে কেবল উত্তেজনা বইছে। ১৮৫২ সালে মৃত লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর এই প্রথমবারের মত পেশোয়ার সীমান্তের মাহমন্দরা শবকদরে আক্রমণাত্মক কুচকাওয়াজ শুরু করে

৪৬ ফৈজতালাল খাঁ বজৌর থেকে।

৪৭ কুনহারের হাজী সাহেব।

দিয়েছে। আমার নিকট আরো কোহাটের দিক থেকে গুজব এলো যে, উযিরী ও উতমানখেল আদি জাতিরা হামলা করেছে, কাবুল ও জালালাবাদের গুপ্তচরেরা আখন্দের (সোয়াত জাতির পীর সাহেব) হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং ধের রাজ্যের আমীর গযন খাঁও তাঁর সংগে যোগ দিয়েছেন ছ'হাজার লোক নিয়ে। ৫ই ডিসেম্বর মাহমন্দরা শবকদরের নিকটবর্তী আমাদের এলাকায় লুটপাট করে গেল[৪৮]।

কিন্তু বড়ো অস্থায়ী এই পাহাড়িয়াদের জোট বাঁধা। অতএব আমাদের সৈন্যবাহিনী যে কাজ সমাধা করতে অক্ষম হলো, ভেদনীতি ও কূটচাল সেখানে কার্যকরী হলো। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যেই পেশোয়ারের কমিশনার সাহেব বনায়েরের কয়েকটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হলেন। দু'হাযার লোকের আর একটি বাহিনী তাঁর বাহাদুরীতে বাড়ীর পথ ধরলো এবং সোয়াতের নেতাও তাঁর অনুগামীর দল ভেঙে দিলেন। কয়েক জন ছোট ছোট আমীর দলত্যাগের গন্ধ পেয়ে আগেই সরে পড়লেন, অবশিষ্টদের জন্যে রেখে গেলেন অবিশ্বাসের বিষ-বীজ। ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই বীজ থেকে ফল ধরার সম্ভাবনা দেখা দিল। বনায়ের জাতিদের বড়ো জির্গা সহসা কমিশনারের সংগে দেখা করলো, কিন্তু শর্ত নির্ধারণে সমর্থ হলো না। ১৫ই তারিখে আমরা তাদের আলোচনা আরও দ্রুত করে দিলুম লুলুতে একটা নৈশ অভিযান করে। এখানে শত্রুপক্ষের চ'র'শ জন নিহত হয়। পরের দিনের মধ্যেই বনায়ের জাতিরা মতিস্থির করে ফেললো এবং কমিশনারের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর হুকুমের তাবেদার হয়ে গেল। এই পক্ষচ্যুতিই জিহাদীদের বিনাশের কারণ হলো। তারপর প্রতি মুহূর্তেই একটা না একটা জাতি সরে পড়তে লাগলো। বজৌর ও ধের রাজ্যের লোকেরা পলায়ন করলো। সোয়াত রাজ্যের সমস্ত বাহিনী যে-কোন মুহূর্তে দলত্যাগ করতে তৈরী হয়ে রইলো। পাহাড়ী কুয়াসার মতো জোট কোথায় বিলীন হয়ে গেল; আর যে বনায়ের জাতিরা জিহাদী বসতির প্রধান আশা-ভরসা ছিল, তারাই আমাদের সংগে শর্ত করলো, জিহাদীদেরকে তাদের বসতিতেই পুড়িয়ে মারবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ারের সংগে যোগ দিয়ে বনায়েররা তাদের দলপুষ্টি

৪৮ Major James; Commissioner of Peshwar Division.

করলো ও তাদেরকে পথপ্রদর্শন করে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে জিহাদীদের বসতি মুল্‌কায় নিয়ে গেল এবং সেটিকে ভস্মীভূত করে দিল। তারপর সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী ২৩শে ডিসেম্বর দুর্ভাগা আম্বালা গিরিপথে উপস্থিত হলো এবং ২৫শে তারিখে তারা আবার সমতলভূমিতে ফিরে এলো। ফেরার পথে আর একটিও গুলী খরচ করতে হয়নি।

ইতিমধ্যে আমরা সেই ভয়াবহ গিরিসংকট ত্যাগ করে এসেছি শুধু রেখে এসেছি ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘনবিন্যস্ত কবরগুলি। আমাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৮৪৭ জন, অর্থাৎ আমাদের স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা নয় হাযার জনের প্রায় এক দশমাংশের কাছাকাছি; আর এই সংখ্যাটা শুধু গিরিসংকটের। তাছাড়া আরও বহু লোক শীতে অকর্মণ্য হয়ে গেছে, বহু লোক রোগভোগে মারা গেছে। পাঞ্জাব সরকার এই অভিযানের ফলাফল নির্ধারণকালে ঘোষণা করেন, 'পূর্বে আর কখনো পাহাড়িয়া অঞ্চলের যুদ্ধ এতো ক্লেশকর ও এতো ক্লান্তিকর হয়নি।' জিহাদীরা আদি জাতিদের একটা ভীষণ জোট বেঁধেছিল এবং এই জোটে তাদেরই কমিটী সর্বেসর্বা ছিল। 'এই জিহাদীরা শুধু নিরীহ ও অসমর্থ ধর্মপ্রচারক ছিল না, তারা আমাদের ভারতের মহারাণীর স্থায়ী আপদের মতো ছিল; তাদের বারংবার প্রচারিত জিহাদ নীতি আমাদের সীমান্তবাসী আদি জাতিরা প্রায় গ্রহণ করে ফেলেছিল।' পরিস্থিতিটা আরও চরম দুর্ভাগ্যের হয়ে উঠে এই কারণে যে, তখন ভারত সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিও ছিলেন না। বড়লাট লর্ড এলগিন্ তখন সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের কোনো স্থানে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর নিকট তারের সংবাদ পাঠানো বা তাঁর পক্ষে কোনো কাজ করা তখন অসম্ভব ছিল।

এই অভিযানে আমাদেরকে প্রচুর মূল্য দিতে হলেও এর ফলে সীমান্ত প্রদেশে পরবর্তী চার বৎসরের জন্যে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জিহাদীদের প্রায় অর্ধেক এতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পার্শ্ববর্তী আদি জাতিরাও অতঃপর জিহাদী বসতির বাকী বাশিন্দাদেরকে খুব কম প্রীতির চক্ষে দেখতে লাগলো, কারণ এইটি তাদের পার্বত্য উপত্যকায় যুদ্ধের প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহী নেতারা অতঃপর নিজেদেরকে এ রকম অসহায় বোধ করলেন যে, ১৮৬৬ সালে তাঁদের

দু'জন[৪৯] আমাদের সীমান্তস্থ কর্মচারীদের সংগে সন্ধির জন্যে যোগাযোগের প্রয়াস পেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা একজন তৃতীয় নেতা[৫০] বানচাল করে দিয়ে তাঁদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৬৭ সালের শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য নিজেদের মধ্যেই বিবাদ করে কাটালেন এবং তার দরুন আমাদের এলাকায় কোনো লুটপাট করা তাঁদের সাহসে কুলায়নি। কিন্তু ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার তারা প্রায় সাতশো মুজাহিদ এক সংগে বের হয়ে পুনরায় আদি জাতিদের জোট বাঁধতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ১৮৬৩ সালে আমরা যে শাস্তি দান করেছিলুম, তার স্মৃতিই এরূপ প্রচেষ্টা কষ্টকর করে তুলেছিল; তবুও ক্রমে ক্রমে আদি জাতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মোন্মাদনা তাদের সদ্বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। তারা আগরর উপত্যকায় আমাদের একটা ঘাটিও আক্রমণ করলো। তখন কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন যে, আমরা আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেও পুনরায় আদি জাতিদের একটা সুবৃহৎ জোটের মুকাবিলা করার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। এবারে অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করতে রাজী হলেন না। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত সরকারের সামরিক সর্বাধিনায়ক একটি সেনাবাহিনীকে আদি জাতিদের দমন করতে নির্দেশ দিলেন। ৩০শে অক্টোবর তারিখে ভারতীয় সামরিক সর্বাধিনায়কের তত্ত্বাবধানে ও জেনারেল ওয়াইল্ডের নেতৃত্বে একটি বাহিনী অগ্রসর হলো। আমরা সেই সংগে ইশ্‌তেহার জারী করে জানিয়ে দিলুম: আমরা কোনো আদি জাতির সংগে সংঘর্ষে আসিনি, কিংবা তাদেরকে উৎপীড়নও করিনি। তবু তারা আমাদের ব্রিটিশ ঘাটি আক্রমণ করেছে, অস্ত্র ও নিশান নিয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন তাদের শাস্তি বিধান করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বহুদিন থেকেই ক্ষতি স্বীকার করে আসছে, কিন্তু এখন তা সহ্যের অতীত হয়ে গেছে। অতএব এখন তোমাদেরকে সে-সব কাজের জওয়াব-দিহি করতে হবে।

---

৪৯ মুহম্মদ ইসহাক ও মুহম্মদ ইয়াকুব, আমাদেরই এক পূর্বতন কর্মচারী সঈদ মুহম্মদের মারফত।

৫০ মওলবী আহ্‌মদ উল্লাহ্‌।

আমি এই অভিযানের বিশদ বিবরণ দিতে চাইনে। জুলাই মাসে পাঞ্জাব সরকার থেকে আসন্ন ঝড়ের সংকেত নিয়ে এক জরুরী তারবার্তা আসে। সেনানিবাসের প্রধান কর্মকর্তা তখন লিখেছিলেন যে, এই বিপদ-সংকেত অত্যন্ত জরুরী ছিল এবং সাহায্যের প্রয়োজনও ছিল অত্যন্ত বেশী; কারণ আমাদের বাহিনীর কয়েকটা দল ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের দ্বারা বাস্তবিকই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ভারত সরকার তাই মোটেই কালক্ষেপ করলেন না।[৫১] ১৮৬৩ সালের শিক্ষার পর জংগীলাট পাঞ্জাবের সামরিক ঘাটিগুলিকে দুর্বল না করে, কিংবা সীমান্তবর্তী সেনানিবাস থেকে কোন সৈন্য আহরণ না করে এবার সরাসরি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে সৈন্যদল আনয়ন করলেন। যুদ্ধে নিযুক্ত ছ'হাযার থেকে সাত হাযার স্থায়ী সৈন্য ছাড়াও সীমান্তের সেনাশক্তিকে দ্বিগুণিত করা হলো এবং ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যের সেরা দলকে ধর্মান্ধ পাহাড়িয়া জাতিদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করা হলো[৫২]। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের দমবন্ধ করা গ্রীষ্মে আমাদের সৈন্যদলকে এক রকম জোরকদমে মার্চ করতে বাধ্য করা হলো, যার সঙ্গে স্বাস্থ্যপ্রদ নাতিশীতোষ্ণ দেশের আবহাওয়ার মার্চের সংগে তুলনাই চলে না। দৃষ্টান্তক্রমে বলা চলে যে, স্যাপার্স ও মাইনার্স সৈন্যদল উনত্রিশ দিনে ছয় শত মাইল মার্চ করেছিল। ভারত উপমহাদেশের আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলি থেকে সৈন্যদল উত্তরমুখে এ রকম বিহ্বলকারী সংখ্যায় আসতে লাগলো যে, আদি জাতিরা ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল এবং তার দরুন জিহাদীদের জোট তৈরীর সবরকম প্লানই বানচাল হয়ে গেল। বহু অর্থ ব্যয়ে আমরা একদল আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত বাহিনী কালাপাহাড়ে সাজিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু সীমান্তবাসীরা তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহসই পেল না। সেনানিবাসের প্রধান কর্মকর্তা লিখেছেন: বিলেতী

---

৫১ Letter to Secretary, Military Dept. No. 163 dated 5th November, 1868, para—4.

৫২ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এবটাবাদে বিভিন্ন গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী সংগে সংগে পাঠানো হয়। লাহোর ও শিয়ালকোট থেকে সৈন্যদল আসে। বলিক ও ধরমশালা থেকেও সৈন্যদল জেনারেল ওয়াইল্ডের সংগে যোগ দেয়। তাছাড়া কানপুর, আলীগড়, অমৃতসর ও ক্যাম্বেলপুর থেকে বিভিন্ন সৈন্যদল রাওয়ালপিণ্ডিতে হাযির হয়। পেশোয়ার ও নৌশিরাতেও বহু সৈন্য মোতায়েন রাখা হয় সোয়াত রাজ্যের উল্টাদিকে হট মর্দানের সৈন্যদলকে সাহায্য করতে।

ও নেটিভ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একযোগে ১০,০০০ ফুট পাহাড়ের উপর কুচকাওয়াজের দৃশ্য দেখা গেছে। প্রধান সেনানায়ক নিজেও আছেন, অথচ তাঁরও কোন তাঁবু নেই। এতোসব সত্ত্বেও আসল কথা এই যে, আমরা মূল পাপের কেন্দ্রে কিছুতে পৌঁছতে পারিনি। এখনো সন্দেহ রয়ে গেছে, এই বিদ্রোহের উত্থানে ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে ও মূলতঃ কতোখানি দায়ী। কিন্তু পাঞ্জাব সরকার এই অভিযানের ফলাফল পরিমাপকালে দুঃখের সংগে মন্তব্য করেছেন: সবই তো শেষ হলো, কিন্তু আমরা হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদেরকে বিতাড়িত করতে পারলুম না, কিংবা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে হিন্দুস্থানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করাতেও সফল হলুম না।[৫৩]

এ পর্যন্ত আমি ১৮৩১ সালে তার গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে ১৮৬৮ সালের শেষ অভিযান পর্যন্ত আমাদের সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী বসতির বর্ণনা দিয়েছি। সারা ভারতব্যাপী ওহাবী বিপ্লবের শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত বিবরণ দান করতে গেলে এই গ্রন্থখানির কলেবর সুবৃহৎ হয়ে উঠবে। তবে এ কথা কখনো ঠিক নয় যে, কেবল পাঞ্জাবেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে, একটা ধর্মীয় বিপ্লবী সংঘ দক্ষিণ ভারতের অন্তঃস্তলে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্যার বার্টলে ফ্রেয়ার একবার আমায় বলেছিলেন, তৎকালীন ওহাবী সংঘের সংগে নিজামের এক ভ্রাতাও জড়িত ছিলেন এবং তাঁকে হায়দরাবাদের শাহী তখতে বসাবার পরিকল্পনাও তাদের ছিল; আর এই পরিকল্পনা যদি বানচাল হয়ে না যেতো, তাহলে ওহাবী নেতারা সদ্যপ্রস্তুত কামান গোলাগুলির একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার লাভ করতো এবং আরও পেত দক্ষিণ ভারতের বহু আধা-স্বাধীন দেশীয় শাসক ও নাগরিক বাহিনীর লোকের সাহায্য। শিখ শাসন-আমলে সীমান্তে তারা বার বার যে দুঃখ-দুর্দশার ঝড় বইয়ে দিত, সেসব উত্তরাধিকার

৫৩ Para 22 of Punjab Government's Letter, No. 268, date 6th Nov. 1868. ১৮৬৮ সালের সীমান্ত অভিযানের বর্ণনায় আমি এই পত্রখানির সাহায্য নিয়েছি; আরও নিয়েছি যে-সব কর্মচারীর উল্লেখ আছে, তাদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট থেকে, সেনানিবাসের প্রধান কর্মকর্তার ৫ই নবেম্বর, ১৮৬৮ সালের পত্র থেকে এবং সামরিক রিপোর্টগুলির বিশদ বর্ণনা থেকে।

হিসাবে তিক্তভাবে আমাদের ভাগ্যে পড়েছে। এই বিদ্রোহী-সংঘ কেবল সীমান্তে ধর্মান্ধতার উষ্ণ আবহাওয়া প্রবল রাখেনি, তিন বার তারা আদি জাতিদের নিয়ে বড়ো রকম জোট বেঁধেছে, আর প্রত্যেকবারই তার দরুন ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। একের পর এক সরকার তাদের আমাদের শাসনকার্যের স্থায়ী আপদ হিসাবে উল্লেখ করেছে, তবু সেটাকে নির্মূল করবার আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখনো সেটা আমাদের বিদ্রোহী প্রজাদের ও দুশ্‌মনদের সমান কেন্দ্রস্থল হিসাবে সীমান্তে বিরাজ করছে।

আমরা জানিনে, আবার কোন্ সময় সে সব বিস্ফোরণশীল যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়বো, যা মধ্য এশিয়াকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু বর্তমানে এটা একরকম স্থিরনিশ্চিত যে, চলতি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আর একটি আফগান যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। এই যুদ্ধ যখন শুরু হবে—আজ হোক কাল হোক, শুরু হতে তা বাধ্য—তখন সীমান্তে অবস্থিত এই বিদ্রোহী বসতি দুশমনদের পক্ষ হয়ে হাযার হাযার মানুষের কাজ করবে। আমাদের ভয় কেবল বিদ্রোহীদেরকে নয়, আমাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে সাম্রাজ্যের বুকে যে-সব রাজদ্রোহী আছে, তাদেরকে নিয়ে, কারণ জিহাদীরা বারে বারে তাদেরকে একত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। গত নয়শো বছর ধরে ভারতীয় জনগণ উত্তর দিক থেকেই আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। যখন পশ্চিমী গোত্রগুলির সমবায়শক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে এই বিদ্রোহী বসতি এশিয়ার জাতিসমূহকে একত্র করে জিহাদ পরিচালনা করবার কৌশল জানেন এমন একজন নায়কের সন্ধান পাবে তখন সেই আক্রমণের আঘাত যে কত প্রচণ্ড হবে, তা কেউ-ই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের সাম্রাজ্যে নিরন্তর আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র

যে উৎস থেকে সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি এই অদ্ভুত জীবনীশক্তি লাভ করতো, তা বহুকাল ছিল রহস্যাবৃত। আমাদের পূর্ববর্তী দেশীয় রাজশক্তি[১] তাকে তিনবার ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং ব্রিটিশ বাহিনীও তাকে তিনবার বিধ্বস্ত করে দেয়; তবু তা লুপ্ত হয়নি, আর এজন্যেই ধর্মভীরু মুসলমানেরা ভাবতে থাকে যে, তার এই প্রায়-অলৌকিক অবিনাশী অস্তিত্বই হচ্ছে চরম বিজয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আসল সত্য এই যে, আমরা একদিকে সীমান্তের বিদ্রোহী বসতিকে ক্ষাত্রশক্তির পেষণে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্য দিকে আমাদেরই ধর্মান্ধ প্রজারা অকুণ্ঠভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সা যোগান দিয়ে সেটাকে লালন করেছে। অর্থাৎ আমরা পোড়া ছাইকে একদম মৃত ভেবে ফেলে রেখেছি, আর তারা নতুন করে তৈল দান করে পুনরায় সেটাকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে।

১৮২০-২২ সালের মধ্যে সৈয়দ আহ্‌মদ যে প্রচারকার্য চালান, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেটাকে বিশেষ আমল দেয়নি। তিনি একদল অতি-ভক্ত শিষ্যকে নিয়ে আমাদের প্রদেশগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। হাযার হাযার মানুষকে তিনি নিজের মতবাদে দীক্ষিত করেছেন। ধর্মীয় কর আদায়ের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা, একটা বেসামরিক সরকার ও ইমামতের উত্তরাধিকারধারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদিকে আমাদের কর্মচারীরা খাজনা আদায় করেছে, বিচারকার্য চালিয়েছে ও সৈন্যদের নিয়ে কুচ-কাওয়াজ করে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাদের চারিদিকে যে একটা ধর্মীয় আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে তরংগায়িত হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। এই অচেতন অবস্থা থেকে তারা প্রথম রূঢ়ভাবে জেগে ওঠে ১৮৩১ সালে। সৈয়দ আহ্‌মদের কলকাতাস্থ মুরীদানের মধ্যে একজন পেশাদার পাহলোয়ান ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন।

---

১ শিখ রাজশক্তি (অ)।

তার নাম তিতু মিয়া[২]। এই ভদ্রলোকের জীবন আরম্ভ হয় এক ভদ্র চাষীর সন্তান হিসাবে। তিনি স্থানীয় এক ক্ষুদ্র জোতদারের কন্যাকে বিবাহ করে নিজের অবস্থার উন্নয়ন করেন। কিন্তু তাঁর উগ্র ও দুর্দান্ত মেজাজের দরুন এসব সুযোগ গোল্লায় যায়। কিছু দিন তিনি কলকাতায় কুস্তিগীর হিসাবে জীবন-যাপন করেন। তারপর তিনি লাঠিয়াল হিসাবে নাম লিখান, যাদের সাহায্যে সমকালীন বাঙালী জমিদাররা বংশগত বিবাদ বা সীমানা-সরহদ্দের ঝগড়া রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন। লাঠিয়াল পেশাগিরিতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত জেলে যেতে হয়। জেলের মিয়াদ শেষ হলে তিনি মক্কায় যান হজ্জ করতে। এই পবিত্র শহরে সৈয়দ আহ্‌মদের সংগে তাঁর মিলন ঘটে এবং ভারতে তিনি ফিরে আসেন ধর্মের একজন শক্তিশালী প্রচারক হিসাবে। কলকাতার উত্তর ও পূর্বের জিলাগুলিতে সফর করে বহু লোককে নিজের মতবাদে দীক্ষিত করেন এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ তোলবার জন্যে গোপনে প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে থাকেন। ১৮৩০ সালে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক পেশোয়ার অধিকৃত হলে তিতুমীর উৎসাহিত হয়ে উঠেন ও তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেন। হিন্দু জমিদারেরা তাঁর মুরীদদের উপর যে সব ছোটখাট অত্যাচার করতো[৩] তার ফলে এ সময়ে একটা উন্মত্ত কৃষক-আন্দোলন জেগে উঠে এবং তিনি তার সরদারী গ্রহণ করেন।

অতঃপর কয়েকটা চাষী হাংগামা হয় এবং শেষে বিদ্রোহীরা নিজেদেরকে একটা ঘাটিতে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলে এবং কয়েকটা খুন করে, ইংরেজ কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তাদেরকে হটিয়ে দেয়। কলকাতার

২ ওরফে মীর নিসার আলী। তাঁর জন্ম চাঁদপুর গ্রামে এবং বাসস্থান ছিল বারাসাতে। তাঁর জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে Calcutta Review Vol. ci-তে। আমি সেখান থেকে ও পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

৩ প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ইছামতী নদীর তীরস্থ জমিদার কৃষ্ণরায় নতুন মযহাবীদের উপর মাথাপিছু তিন টাকা বারো আনা কর ধার্য করেন। আর একজন জমিদার তাঁর এক প্রজাকে কারারুদ্ধ করেন, কারণ সে মুহররমের সময় একটা মন্দির ধ্বংস করে দেয়।

উত্তর ও পূর্বে তিনটি জিলা[৪] জুড়ে সমগ্র এলাকাটি মাত্র তিন হাযার বিদ্রোহীর মুষ্টিগত হয়ে পড়ে। এই বিশেষ ময্হাবীদের কাজ হলো প্রথমে একটি গ্রামকে প্রকাশ্য দিবালোকে লুট করা, কারণ তার জনৈক বাশিন্দা তাদের বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করেনি।[৫] অন্য জিলার আর একটি গ্রামও লুট করা হয় এবং তার মসজিদটি পুড়িয়ে ফেলা হয়।[৬] এদিকে মুসলমানদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা ও মুষ্টি ভিক্ষা আদায় চলতে থাকে। ১৮৩১ সালে ২৩শে অক্টোবর তারিখে বিদ্রোহীরা একটি গ্রামে[৭] একটা শক্তিশালী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে ও তার চারিদিকে মজবুত বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করে। ৫ই নবেম্বর তাদের পাঁচশো যোদ্ধা কুচকাওয়াজ করতে করতে একটি ছোট শহর আক্রমণ করে ও তার হিন্দু পুরোহিতকে খুন করে। তারপর তারা দুইটি গরু (হিন্দুর পরমারাধ্য জন্তু) জবেহ্ করে ও তাদের রক্ত দিয়ে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করে এবং অবজ্ঞাভরে গরুর অংগগুলি দেবমূর্তির সামনে ঝুলিয়ে দেয়। অতঃপর তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, ইংরেজ-রাজ খতম হয়ে গেছে ও মুসলিম-রাজ পুনরায় কায়েম হয়েছে। হাংগামার পর হাংগামা চলতে থাকে; আর এ-সবের সাধারণ কাজ হয়ে দাঁড়ায় কোন হিন্দুর গ্রামে একটা গরু জবেহ্ করা এবং হিন্দুরা যদি প্রতিবাদ তোলে, তা হলে তাদের খুন-যখম করা, কিংবা তাড়িয়ে দিয়ে ঘরগুলি লুটপাট করা ও জ্বালিয়ে দেওয়া। অবশ্য যে-সব মুসলমান তাদের ময্হাবে আসতো না, তাদের উপরেও সমান অত্যাচার চালানো হতো। একবার একজন একগুঁয়ে মালদার মুসলমানের ঘর তারা লুট করে ও তার কন্যার সংগে বলপূর্বক তাদের সরদারের শাদী দিয়ে দেয়।

জিলা কর্তৃপক্ষের কয়েক দফা ব্যর্থ প্রয়াসের পর কলকাতা-বাহিনীর একটা দলকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠানো হলো ১৮৩১ সালের ১৪ই নবেম্বর তারিখে। বিদ্রোহীরা আপোষ-মীমাংসার সব রকম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তখন ইংরেজ সেনানায়ক রক্তপাত এড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁর সৈন্য-

৪ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর।

৫ ফরিদপুর জিলায়।

৬ ফরিদপুর জিলার সরফরাজপুর গ্রাম।

৭ নারিকেল বাড়িয়া (অ)।

দেরকে ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীরা আমাদের উপর হামলা করলে তাদের উপর ফাঁকা আওয়াজ করা হয়, কিন্তু তারা আমাদের সিপাহীদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এ সমস্ত ঘটে কলকাতা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার অশ্বারোহণের পথের ব্যবধানে। ১৭ই তারিখে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিছু সাহায্যকারী সৈন্য সংগ্রহ করলেন, ইউরোপীয়ানরা হাতির উপরে উঠে রওয়ানা হলেন; কিন্তু বিদ্রোহীরা এক হাযার সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নদীর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ও পলায়নপর সিপাহীদের শেষের কয়েকজনকে হত্যা করলো। অতঃপর দরকার হয়ে পড়লো স্থায়ী ব্রিটিশ বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা। একদল দেশীয় পদাতিকবাহিনী, কিছু অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্য ও শরীররক্ষী দলের একটা অংশকে দ্রুত কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিদ্রোহীরা বাঁশের কিল্লার নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে আমাদের সৈন্যদেরকে খোলা ময়দানে যুদ্ধ দান করলো এবং 'তাদের সীমানার উপর ঝুলিয়ে দিল পূর্বদিনের নিহত ইউরোপীয়ান সৈন্যের ছিন্নভিন্ন দেহ'[৮]। একটা ভীষণ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ভাগ্যের মীমাংসা হয়ে গেল। তারা ইতস্ততঃ পলায়ন করলো এবং বাঁশের কিল্লাটি তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হলো। তাদের সরদার তিতুমীর যুদ্ধ ক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করলেন। জীবিতদের (প্রায় সাড়ে তিনশ' জন) মধ্যে একশ চল্লিশজন আদালতে বিচারশেষে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং তাদের সেনাপতি তিতুমীরের প্রধান সহকারীর[৯] ফাঁসীর হুকুম হয়।

এবার মনে হলো যেন বিপ্লবীদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। পাঞ্জাব সীমান্তে তাদের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের দলপতিও নিহত হন। নিম্নবংগের বিদ্রোহও একই দশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু

৮ Calcutta Review : Vol LI, No. ci. p. 183.

৯ তাঁর নাম গোলাম মাসুম। আমরা হান্টার লিখিত তিতুমীরের বর্ণনার সংগে একমত নই। আমি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি A Fascinating Chapter in the History of East Pakistan, (Islamic Review, June 1951) নামক প্রবন্ধে (অ)।

খলীফারা অর্থাৎ ইমামতের উত্তরাধিকারীরা যাঁদেরকে ইমাম সাহেব পাটনায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা নতুনভাবে এগিয়ে এলেন। তাঁরা চাক্ষুষ সাক্ষী সংগ্রহ করলেন এবং সে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে, যুদ্ধের ভীষণ মুহূর্তে ইমাম সাহেব মানব-দৃষ্টি থেকে ধূলিময় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছেন। তাঁরা জনসাধারণকে আরো বললেন, ইমাম সাহেব অবশ্যি সত্যি সত্যি প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর কবর যেন মুরীদানের চক্ষুর অন্তরালে থাকে, ঠিক যেমন পুরাকালের হযরত মূসা চেয়েছিলেন ; কারণ, তাহলে তাঁর দেহাস্থির উপর ধর্মের হানিকর কোনো পূজা-অর্চনা করা হবে না।[১০] এখন তাঁর খলীফারা প্রচার করলো, আল্লাহ্ তাঁকে দুর্বলচিত্ত মানুষদের মধ্য থেকে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা পুনরায় যখন একমনে ইংরেজ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, তখন তাদের ইমাম ফিরে এসে তাদেরকে বিজয়ের পথে চালনা করবেন। মুসলমানদের নিকট এ-সব কথায় অবিশ্বাসের কিছু নেই। 'এ সব তো পূর্বেও ঘটেছিল। এ কথা তো সকলেরই জানা যে, হযরত ইউনুস কিছুকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি সুবৃহৎ মাছের পেটে লুকিয়ে ছিলেন। হযরত মূসাও তুর পাহাড়ে আরোহণের সময় ও তওরাত গ্রন্থ (Old Testaments) গ্রহণকালে অদৃশ্য হয়েছিলেন। জুলকারনাইন্ যিনি ইয়াজুজ মাজুয্‌কে বন্দী করেছিলেন, তিনিও এভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসাও মরণের হলাহল পান করেননি'।[১১] অতএব এখন মুসলমানদের জন্যে ফরয হচ্ছে, নতুন উৎসাহে জিহাদে শরীক হওয়া। পাটনার খলীফারা একজন নতুন সিপাহ্-সালারে-দ্বীন্ নিযুক্ত করলেন।[১২] তিনি উত্তর মুখে তাঁর ধর্মান্ধ যোদ্ধাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন, আর দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

---

১০ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী অদৃশ্য হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করেন, কিন্তু কবর গোপন করার উপদেশ স্বীকার করেন—Calcutta Review : 1870, wahabis in India : Article No· 11., Note দেখুন (অ)।

১১ Calcutta Review : Vol. ci, P 187.

১২ মওলবী নসরুদ্দীন।

কিছুদিন ধরে সৈয়দ আহ্‌মদের এই ইলাহিয়াতের উপযুক্ত সাক্ষ্য-সমর্থিত কেরামতি সব রকম অনুসন্ধানকে ভীতি প্রদর্শন করে থামিয়ে রেখেছিল এবং সব কিছু ভালই যাচ্ছিল। নিম্নবংগের প্রচারকদের মধ্যে একজন ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। তিনি পূর্ব দিকের জিলাগুলিতে, বিশেষতঃ ঢাকা ও সিলেট জিলায় প্রচারকার্য চালাতেন। তিনি এক হাযার মুজাহিদ নিয়ে উত্তর দিকে ১৮০০ মাইল সফর করে সীমান্তে উপস্থিত হন। সেখানে ইমাম সাহেবের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে বিশেষভাবে নাড়া দিল এবং একটি ছোট্ট অভিযানের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যে সুদূর পর্বতে আল্লাহ্‌ ইমাম সাহেবকে লুকিয়ে রেখেছেন, সেখানে প্রবেশ করতেই হবে। তাঁর সত্যনিষ্ঠা স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলনেতাদের সতর্ক দৃষ্টিকে হার মানালো। একটি পবিত্র সুরক্ষিত স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন, সেখানে 'তিনটি খড়ের মূর্তি দাঁড় করানো আছে'। মোহমুক্ত প্রচারক অতঃপর সেই অভিশপ্ত গুপ্তস্থান থেকে পলায়ন করলেন এবং নিজের সহচর-দিগকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিয়ে তিনি কলকাতাস্থ মুরীদানকে একটা লম্বা উষ্মাব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ করলেন। তখনও তারা নিঃসন্দেহে টাকা-পয়সা ও মানুষ প্রেরণ করছিল।

তিনি লিখলেন—'সালাম আলায়কুম। আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশিস্‌ বর্ষিত হোক। মোল্লা কাদির ইমাম সাহেবের একটা মূর্তি তৈরী করেছিল, কিন্তু কোনো লোককে সেটি দেখাবার পূর্বে তাকে এই শপথ করিয়ে নিতো যে, সে ইমাম সাহেবের হাতে হাত মিলাবে না, কিংবা তাঁর সংগে কথা বলবে না। কারণ এরূপ করলেই ইমান সাহেব পুনরায় চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। সব মানুষই দূর থেকে এই প্রাণহীন মূর্তিটাকে দেখে অভিভূত হয়ে যেতো ও তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতো। কিন্তু তাদের প্রার্থনা ভিক্ষার একটিও উত্তর মিলতো না। তখন মানুষেরা ইমাম সাহেবের হাতে হাত মিলাতে খুবই উদগ্রীব হলো। এমতাবস্থায় মোল্লা কাদির তাদের সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করলো। সে বল্‌লো, 'কেউ যদি পূর্বে না জানিয়ে ইমাম সাহেবের হাতে হাত মিলাতে যায়, তাহলে তাঁর খাদিম তাকে পিস্তল ছুঁড়তে পারে।' চিঠিতে তারপর বর্ণনা আছে, কেমন করে

এই সুচতুর মোল্লা লোকদেরকে ধর্মে আস্থাহীনতার জন্যে তিরস্কার করতো এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে 'বহু সাধ্য-সাধনার পর তারা মূর্তিটাকে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলো। তারা এটাকে পরীক্ষা করে দেখলো, একটা বকরীর চামড়ায় কতকগুলি ঘাস ভরে দিয়ে কিছু কাঠ ও চুলের সাহায্যে সেটাকে মানুষের মতো করা হয়েছে। এই বান্দা তখন মোল্লা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো, এ-সব কী? সে বললো, সবই সত্যি, ইমাম সাহেব একটা কেরামতি দেখিয়ে সাধারণের সম্মুখে ঘাসের মূর্তিতে উদয় হয়েছেন। এই ভণ্ডদের সব ভুল ও সব মিথ্যা এখন দিবালোকের মতো পরিকার হয়ে গেছে, আর আমি গোনাহ্ থেকে বেঁচে গেছি।'

মনে হলো, জিহাদীরা পুনরায় সর্বনাশের মুখে এসেছে। কিন্তু পাটনার খলীফাদের প্রচারকার্যে গভীর অনুরাগ ও তাদের মুষ্টিগত অপরিমেয় অর্থবল আর একবার ধূলি থেকে তাদের নিশান উর্ধ্বে তুললো। তারা সারা ভারতে প্রচারক ছড়িয়ে দিল এবং এভাবে এমন একটা ধর্মীয় উজ্জীবন আনয়ন করলো, যার নযীর খুব কম দেখা গেছে। খোদ দু'জন খলীফাই বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে সফর করে বেড়ালেন।[১৩] ক্ষুদে প্রচারকরা ছিল সংখ্যাতীত এবং একটা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাবলে তারা যে কোনো উপযুক্ত স্থানে মুরীদানের ইচ্ছামতো বাস করতে পারতো। এভাবে প্রত্যেক ধর্মান্ধ-অধ্যুষিত জিলায় একজন স্থায়ী প্রচারক থাকতো এবং সময়ে সময়ে ভ্রাম্যমাণ প্রচারক দ্বারা ধর্মপ্রীতি আরো উত্তেজিত করা হতো ও পাটনার কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা তার প্রভাবও স্থানীয় লোকদের উপর স্থায়ীভাবে

১৩ বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী। বিলায়েত বাংলাদেশে সফর শেষ করে বোম্বাই, নিজামের রাজ্য ও মধ্যভারত নিজের বিশেষ এলাকা হিসাবে নির্বাচিত করলেন। ইনায়েত বাংলাদেশের মধ্যবর্তী জিলা মালদহ, বগুড়া, রাজশাহী, পাটনা, নদীয়া ও ফরিদপুরে প্রচার করেন। কেরামত আলী জৌনপুরী ফরিদপুর থেকে পূর্ব দিকে ঢাকা, ময়মনসিং নোয়াখালী ও বরিশাল জিলায় প্রচারকার্য চালান। হায়দারাবাদের বাশিন্দা জয়নুল আবেদিন বিলায়েত আলী কর্তৃক দাক্ষিণাত্যে সফরকালে দীক্ষিত হন এবং তিনি উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ নিজের কর্মক্ষেত্র করেন। উত্তরত্রিপুরা ও সিলেট জিলার চাষী সম্প্রদায় তাঁর মুরীদ হয়ে যায়।

বিস্তার করা হতো। আমি পরে আরোও দেখাবো, বাংলাদেশে এই প্রচারকের দল কি শক্তিশালী আপদ হিসাবে উদয় হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে তারা উন্মত্ততার এমন প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল যে, মেয়েরা পর্যন্ত দেহের গহনা খুলে এই জনতহবিলে দান করেছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে তারা দলে দলে নতুন মুজাহিদকে জিহাদী বসতিতে পাঠিয়ে দিত। সর্বত্রই তারা মুসলিম জনগণকে গভীরভাবে মাতিয়ে তুলেছিল এবং যদিও বাঙালী সূক্ষ্মবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনকে নবজীবন দান করেছিল, তবুও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই সমান উত্তপ্তভাবে তার উজ্জীবন হয়েছিল। পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন: তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের নাকের উপর এবং রক্ষণাধীনেই প্রকাশ্যে আমাদের জনবহুল জিলাগুলির গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ প্রচার করছে, মুসলমান জনগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাচ্ছে এবং আপদ হিসাবে নিশ্চিত ও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করছে।[১৪]

এই আশ্চর্য প্রভাবের মৌল ভিত্তি নিশ্চয়ই অবিমিশ্র মন্দের উপরেই নির্ভরশীল ছিল না। সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁর ইমামতের জীবন আরম্ভ করেন দু'টি মহান নীতির উদ্‌গাতা হিসাবে। আর সকল সত্যিকার ধর্মপ্রচারকও এই নীতিতেই কাজ করছেন—সে নীতি আল্লাহ্‌র একত্ব ও মানুষে মানুষে সমতা। তিনি প্রায় ঐশী বিশ্বাস নিয়ে মানুষের সেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলেন; যা এতোদিন তাঁর স্বদেশবাসীর হৃদয়কন্দরে নির্জীব হয়েছিল এবং হিন্দুত্বের সংগে বহু শতাব্দীর সংস্পর্শের দরুন সঞ্চিত নানা কুসংস্কারের আবর্জনাস্তূপে চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হতে চলেছিল। তিনি দেখেছিলেন, খাঁটি ইসলাম আনুষ্ঠানিক পৌত্তলিতার নীচে কবরস্থ হয়ে আছে। প্রথম জীবনে তিনি দস্যু ছিলেন সত্য এবং তিনি বা তাঁর অতি নিকটের শিষ্যরা হয়তো ভণ্ডও ছিলেন। কিন্তু আমার এ বিশ্বাস সুদৃঢ় যে, সৈয়দ আহ্‌মদের জীবনে এমন এক সময় এসেছিল, যখন তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে বেদনা অনুভব করতেন এবং তখন তাঁর তনু-মন শুধু আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ, যদিও তাঁর বাহ্যিক ভাব ছিল শান্ত-প্রশান্ত। আর প্রায়ই তাঁর ধর্মীয় দশাপ্রাপ্তি ঘটতো, যাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বুদ্ধি মৃগীরোগ বলে আখ্যাত করলেও এশিবাসীরা সাধারণ

১৪ Official Proceedings: 1865.

বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র সংগে সাক্ষাৎ সংযোগ বলেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। এইরূপ স্বর্গীয় ভাবাবেশে মত্ত হয়ে পুরাকালীন পয়গম্বরেরা অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ছটফট করতেন। সৈয়দ আহ্‌মদও এই অপার্থিব আনন্দানুভূতির মুহূর্তে সুদূর অতীতের ধর্মপ্রচারকদের তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেতেন। বহুকাল পূর্বে মৃত ভারতের দু'টি বিরাট ধর্মীয় ব্যবস্থার দু'জন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গেও সে সময় তাঁর নিগূঢ় আধ্যাত্ম-তত্ত্বালোচনা চলতো। ১৮২০ সালে তিনি যখন ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। তিনি ছিলেন সাধারণ দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছু বেশী উঁচু এবং তাঁর লম্বা দাড়ি সারা বুক ছেয়ে ফেলতো। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। পুথির বিধি-বিধানের জ্ঞান তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন তার বাস্তব জীবন উন্নত করতে। আর ময্‌হাবী তর্ক বা আলোচনা থেকে তিনি দূরে থাকতেন। এর কারণ হিসাবে তাঁর দুশ্‌মনরা বলতো, এ-সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা বলতো, তাঁর মতো উচ্চমার্গের ধর্মজ্ঞানীর নিকট এ-সব অতি তুচ্ছ মনে হতো। তাঁর প্রথম মুরীদানের মধ্যে দু'জন ছিলেন দেশমান্য আলেম। তাঁরা সেকালীন দিল্লীর মহাজ্ঞানী 'শামসুল হিন্দ'-এর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, খোদ ইমাম সাহেবও কিছুকাল যাঁর সাগরিদ ছিলেন।

এই দুই ব্যক্তি ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের বংশজ[১৫] এবং তাঁর কাছেই আরবী ভাষায় ও শরীয়তী আইনে তাঁরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ধারায় হলেও, তাঁরা দু'জনেই স্বদেশবাসীর আচার-নীতির ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার সাধনে উদ্বুদ্ধ হন এবং উভয়েই তাঁদের সাগরিদ ভাই ও এককালীর দস্যুকে এ কাজ সাধনে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ হিসাবে গ্রহণ করেন। এ দু'জন উচ্চ শিক্ষিত ও সুমার্জিত আলেম এই অশিক্ষিত অশ্বারোহী সিপাহীকে তাঁর সদ্যশেখা আরবী ভাষায় ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ সত্ত্বেও প্রকাশ্যে যে রকম ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতেন, তাতে সাধারণ লোক সহজেই এই ভবিষ্যৎ ইমামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আরবী ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁদের গভীর জ্ঞান সত্ত্বেও প্রকাশ্যেই তাঁরা সৈয়দ

১৫ মওলবী মুহম্মদ ইসমাঈল ও মওলবী আবদুল হাই; প্রথম জন শাহ্‌ আবদুল আযীযের ভাইপো ও দ্বিতীয় জন জামাতা ছিলেন

আহ্‌মদের দাবী স্বীকার করেছিলেন। যুগে যুগে আল্লাহ্‌ ইমাম বা মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে বান্দাদের ধর্মীয় জ্ঞান উজ্জীবিত করেন এবং সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথে চালিত করেন— এই সাধারণ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে তাঁরা প্রমাণ করতে লাগলেন যে, সৈয়দ আহ্‌মদের মধ্যে এ রকম আল্লাহ্‌ কর্তৃক বিশেষভাবে আদিষ্ট হওয়ার সকল চিহ্নই বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন হযরত মুহম্মদের সরাসরি বংশধর। তাঁর যে রকম ধর্মীয় ভাবাবেশ হতো এবং সে সময় তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌ ও বিগত পয়গম্বরদের সংগে সাক্ষাৎ-সংযোগ রক্ষা করতেন, তাঁর গম্ভীর স্বল্পবাক শান্ত-মধুর স্বভাব, এমন কি, তাঁর দৈহিক গঠন থেকেও তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, তাঁর সংগে বিশ্বনবীর সাদৃশ্য রয়েছে। একদল ভারতীয় মুসলমান[১৬] বিশ্বাস করে যে, বারো জন খলীফা পৃথিবীকে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত করে তুলবেন, তাঁদের ছয়জনের আবির্ভাব পূর্বেই হয়ে গেছে। আরেকদল বলে যে, তাঁদের মাত্র চার জনের আবির্ভাব হয়েছিল; তবে সৈয়দ আহ্‌মদ নিঃসন্দেহে এই ধারার পরবর্তী ব্যক্তি। স্বপ্নে তাঁকে হযরত মুহম্মদের প্রিয়তমা কন্যা ও তাঁর স্বামী (তাঁর পূর্বপুরুষ) দেখা দিতেন, তাঁকে পুত্র হিসাবে সম্বোধন করতেন, সুগন্ধিতে গোসল করাতেন এবং শাহী পোশাকও পরিয়ে দিতেন। এর চেয়ে আর বেশী প্রমাণ কি সাধারণ লোক কিংবা সৈয়দ আহ্‌মদ নিজেই দাবী করতে পারেন? তাঁর নিজেরই বিনয় ও সংকোচ ঘুচে গেল তাঁর দুই মহাপণ্ডিত মুরীদের ক্রমাগত বক্তৃতার ফলে। শেষে তাঁর দাবীতে নিজেরই এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও শাহী কার্যক্রম আরম্ভ করেন, ধর্মীয় করাদি আদায় করতে থাকেন, খলীফা নিযুক্ত করে নিজের ইমামতের ধারা বহাল রাখতে চেষ্টা করেন এবং প্রকাশ্যে পেশোয়ারে নিজেকে আমীরুল মু'মেনীন হিসাবে ঘোষণা করেন।

মক্কায় হজ্ব করতে যাওয়ার পূর্বে অবশ্য তিনি তাঁর মতবাদের কোনো বাস্তব রূপ দেননি। ধর্মীয় সংস্কার-কার্যে তাঁর ছিল বাস্তববাদীর দৃষ্টিভংগি। তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে এই শিক্ষাই দিতেন যে, যদি তারা আল্লাহ্‌র

১৬ সুন্নীরা। শীয়ারা বিশ্বাস করে যে, এগার জন পূর্বেই গত হয়েছেন এবং দ্বাদশ ব্যক্তি আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোনোখানে লুকিয়ে আছেন। সুন্নীরা অবশ্য পাক-ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা পঁচানব্বই জন।

গযব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাহলে তাদেরকে সৎজীবন যাপন করতেই হবে। তাঁর একজন মুরীদ তাঁর বাণীগুলিকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন।[১৭] এখন সেটিই এই মযহাবের কুর্‌আনের মতো এবং তাতে ইমামের সামান্যতম বাণীও লেখকের ধর্মানুরাগে বহুগুণে বিস্ফারিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে বিস্ফারিত হয়েও তাঁর আসল শিক্ষা ছিল বাস্তব নৈতিকতা। যে-সব দলিল দ্বারা তিনি পাটনার খলীফাদের নিয়োগ করেন, সে-সবেও প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের এই মৌল নীতিই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর একমাত্র শিক্ষা হলো আল্লাহ্‌র উপাসনা করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই স্মরণ ভিক্ষা করা, যেখানে কোনো মানবীয় আচারের বা অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তিতা একেবারেই নেই।

'পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে বলছি : যারা সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র রাহে চলতে চায়, যারা উপস্থিত আছে ও যারা নেই এবং যারা সৈয়দ আহ্‌মদের বন্ধু, তারা সকলেই জানুক, পীরের হাতে হাত দিয়ে 'বয়েত' বা দীক্ষাগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনের পথ নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং সেটা হলো তাঁর রসূলের বিধানগুলি মেনে চলা'।

'রসূলের বিধানগুলির মৌল ভিত্তি হলো দু'টি—প্রথমটি হলো কোনো জীবের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী আরোপ না করা; [১৮] আর দ্বিতীয়টি হলো, এমন কোন অনুষ্ঠান বা আচার আমদানি না করা, যা রসূলের সময় কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফাদের সময় চালু ছিল না।[১৯] প্রথমটির মধ্যে এই শিক্ষাই আছে যে ফেরেশ্‌তা, জ্বীন, পীর, মুরীদ, আলেম, সাগরিদ, রসূল বা ওলী (সাধুসন্ত) কারো কোনো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার ক্ষমতা নেই, এই ধ্রুব সত্যে বিশ্বাস করা। আর হলো, উপরোক্ত কোনো সৃষ্ট জীব থেকে নিজের ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্খা পূরণের কোনো রকম কার্যকারণ থেকে বিরত থাকা; তাঁদের কারো অনুগ্রহ করবার বা বিপদ ত্রাণ করবার ক্ষমতা আছে, এমন কিছুতে বিশ্বাস না রাখা; আল্লাহ্‌র শক্তির নিকট নিজেদেরকে অসহায় ও অজ্ঞ হিসাবে বিবেচনা করা : স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোনো পয়গম্বর, ওলী দরবেশ বা

১৭ শাহ্‌ মুহম্মদ ইসমাঈল রচিত 'সীরাত-উল-মুসতাকীম'।

১৮ শির্‌ক।

১৯ বিদাত।

ফেরেশ্‌তার উদ্দেশ্যে কিছু দান না করা, বরং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র বন্ধু হিসাবে মনে করা। তাঁদের মানবীয় জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আছে এবং পবিত্র ঐশীজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা আছে এরূপ বিশ্বাস করার অর্থই হলো একেবারে আল্লাহে অবিশ্বাস করা।'[২০]

'দ্বিতীয় শিক্ষার সারাংশ হলো, সত্য ও অবিকৃত ধর্ম হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনে কেবল সেই সব উপাসনা-প্রার্থনা করা ও আচার-নীতি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যেগুলি রসূলের জীবদ্দশায় প্রতিপালিত হতো; আর তা হচ্ছে, যাবতীয় বেদা'ত কার্যকরী করা, বিয়ে-শাদীতে উৎসব, মৃত্যুতে শোকোৎসব, মাযার সুসজ্জিত করা, কিংবা কবরের উপর বড়ো বড়ো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা, কিংবা পথে পথে শোভাযাত্রার সমারোহ প্রভৃতি পরিহার করা। এরূপ ধরনের যে-সব অনুষ্ঠান চালু আছে, সেগুলি যথাসাধ্য বন্ধ করে দেওয়া।'[২১]

১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে ইমাম সাহেব মক্কায় সফর করলে পর তাঁর সহজ সরল অতি-নৈতিক শিক্ষা বিস্তারিত হয়ে বাস্তব রূপ নেয়। তিনি লক্ষ্য করলেন, পবিত্র শহরটী সদ্যমাত্র মরুদেশের এক বেদুঈনের শিক্ষার মহিমায় সংশোধিত ও পুনর্গঠিত হয়ে উঠেছে এবং তাঁর বিশ্বাসের অনুকূল নীতিতেই তা সম্ভব হয়েছে। এই পুনর্গঠনের নায়ক পশ্চিম এশিয়ায় এক বিশাল ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঠিক যে রকম সৈয়দ আহ্‌মদও ভারতে প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখতেন। এজন্যে এখানে সৈয়দ আহমদের শিক্ষার ও নীতির বর্ণনা আপাততঃ স্থগিত রেখে আরব দেশে ওহাবীদের উত্থান ও প্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

প্রায় দেড়শো বছর পূর্বে এক তরুণ আরবী হজ্জ করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম আবদুল ওহাব।[২২] তিনি নজ্‌দের এক ক্ষুদ্র সর্দারের পুত্র ছিলেন। সহগামী হজ্জ যাত্রীদের লজ্জাকর লাম্পট্য ও হরেক রকম ভাঁড়ামি শহরটিকে কলুষিত করে ফেলেছে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি দামিশ্‌কবাসী মুসলমানদের দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্র

২০ কুফর।

২১ Calcutta Review : No. C, P 89.

২২ যিনি সর্বদাতা, তাঁরই সেবক মাত্র।

সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেন এবং শেষে এ-সবের প্রকাশ্যে নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে তুর্কী আলেমদের এই বলে নিন্দা করতে থাকেন যে, তাঁরা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা আল্লাহ্‌র লিখিত বাণীকে অকেজো করে ফেলেছেন এবং অবর্ণনীয় পাপাচারের ফলেই তুর্কী জাতটা আজ কাফেরদের চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর এইসব উক্তি দ্বারা তিনি নিজেকে তুরস্কের শাহী দরবারে বিশেষভাবে ঘৃণার পাত্র করে ফেলেন। এজন্যে শহর থেকে শহরে বিতাড়িত হয়ে অবশেষে তিনি দারিয়ার শাসক মুহম্মদ ইব্‌নে সউদের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ইব্‌নে সউদ তাঁর ধর্মমতে দীক্ষিত হলেন এবং তাঁর প্রতি অবিচারগুলি প্রণিধান করলেন। আর এজন্যে তিনি শীঘ্রই এ-সব অবিচারের প্রতিশোধও তুললেন। আবদুল ওহাব এই নয়া মুরীদের সংগে কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাঁর সাহায্যে একটা ক্ষুদ্র আরব জোট গঠিত করে তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়ালেন। তুরস্কের দুর্দশাগ্রস্ত ধর্মনীতিরও তিনি তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তারপর বিজয়ের পর বিজয় তাঁকে অভিষিক্ত করতে লাগলো। যে বেদুঈনরা কখনও হযরত মুহম্মদকে ঠিক আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ হিসাবে সম্মান দেখায়নি এবং কুর্‌আনকেও কালামুল্লাহ্‌ হিসাবে গ্রহণ করেনি[২৩], তারাও এখন দলে দলে পুনর্গঠিত মযহাবের সৈন্যদলে যোগদান করলো। নজ্‌দের বহুলাংশ অধিকৃত হলো। আবদুল ওহাব হলেন তার ধর্মীয় নেতা এবং তাঁর জামাতা ইব্‌নে সউদ গ্রহণ করলেন তার শাসনভার। তাঁরা বিজিত প্রদেশগুলিতে নতুন শাসন নিযুক্ত করলেন এবং সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিগত করে রাখলেন। শান্তির সময় আইন রক্ষা ও ধর্মীয় কার্যাদি চালাবার জন্যে সউদ বিভিন্ন গোত্রের একটা মজলিস ও একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যেও তিনি একটি সমরপরিষদ নিযুক্ত করলেন।

শীঘ্রই এ নতুন শক্তি অসীম সাহসে তুর্কী সাম্রাজ্য আক্রমণ করলো। ১৭৪৮ সালে বাগদাদের পাশা ও উযীরে আযম এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, কারণ এ আন্দোলন তখন তুরস্কের

২৩ হান্টার সাহেবের এই উক্তি ভ্রমাত্মক। ইতিহাসই তাঁর এই উক্তির বিপরীত সাক্ষ্য দান করে (অ)।

দরবার থেকে খিলাফতের অপজাত উত্তরাধিকারিগণকে শেষ পর্যন্ত দূর করে দিয়ে একটা নতুন সাম্রাজ্য গঠনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংস্কারপন্থীরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বিজয় লাভে দক্ষ ছিল, বে-সামরিক শাসন কাজেও তার চাইতে কম পটু ছিল না। যে যাযাবর আরবেরা তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, তারা এবার একটা সুদৃঢ় জোটে গ্রথিত হলো। একটা স্থায়ী ধর্মীয় কর আদায়ের ব্যবস্থা হলো। যুদ্ধের সময় লুটের মালের চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধারা পেতো, বাকী এক-পঞ্চমাংশ যেতে আরম্ভ করলো সাধারণ তহবিলে। জমির খাজনা, যাকে কুরআনে সদ্‌কা বলা হয়েছে, তা কঠোরভাবেই আদায় করা হলো। যে-সব জমি বৃষ্টির দ্বারা বা নদীর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই সিক্ত হতো, সেগুলিতে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ এবং যে-সব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচনের ব্যবস্থা হতো, সেগুলিতে উৎপন্ন ফসলের কুড়িভাগের এক ভাগ কর হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা মূলধনের শতকরা দেড়ভাগ কর আদায় দিত। বিরুদ্ধবাদী শহর ও প্রদেশগুলিও রাজস্বের একটা স্থায়ী উৎস ছিল। প্রথম বিদ্রোহের শাস্তি ছিল সাধারণ লুণ্ঠন। তখন লুটের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা হতো। দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে কিংবা ওহাবী মযহাব ত্যাগ করলে তার শাস্তিস্বরূপ যে সমুদয় জমি-জায়গার উপর শহর নির্মিত হতো এবং তার অধীনস্থ সমস্ত জমি ওহাবী নেতার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হতো। এই সংস্কারপন্থীরা ছিল প্রধানতঃ যুদ্ধবাজ মযহাব এবং তরবারির মুখেই তারা নিজেদের মতবাদে দীক্ষাদান করতো। এজন্যে এটা রাজস্বের একটা মূল্যবান উৎস হিসাবে গণ্য হতো এবং বছরে অন্ততঃ দু'তিন বার অভিযান চালিয়ে এই রাজস্ব সংগৃহীত হতো।

এভাবে রক্তের আখরে ওহাবী যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা স্বগুণে মহৎও ছিল। তারা প্রথমে জোর দিল নৈতিক জীবনের বাস্তব পরিবর্তন সাধনে। তুর্কীরা মক্কা শরীফকেই নীচ লাম্পট্যে কলুষিত করে তুলেছিল। তারা বহুবিবাহেই সন্তুষ্ট থাকেনি, হজ্ব যাত্রাকালে তারা সবচেয়ে অসচ্চরিত্রা রমণীদেরকে সংগে নিয়ে আসতো। তাছাড়াও কুর্‌আনে বলিষ্ঠ ভাষায় নিষেধ আছে সে রকম বহু জঘন্যতম পাপাচরণে তারা লিপ্ত থাকতো, প্রকাশ্যে মদ্য পান করতো ও আফিম খেতো। বাস্তবিক, মক্কাযাত্রী তুর্কী তীর্থপথিকরা সবচেয়ে নিন্দার্হ ও জঘন্য দৃশ্যের অবতারণা করতো।

আবদুল ওহাব প্রথমে এ-সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জোর আওয়াজ তোলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর মতবাদ ধর্মতান্ত্রিক নীতিতে রূপ নেয়। তাই এখন এ মতবাদ ওহাবী মতবাদ হিসাবে সুপরিচিত এবং ভারতীয় মযহাবও এখন এ মতবাদে আস্থাবান।[২৪] এ মতবাদে হযরত মুহম্মদের ধর্মকে একটা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সাতটি মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, এক আল্লাহ্‌তে ধ্রুব বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে কোনো মধ্যবর্তী জনের অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখা, অলীদের নিকট কোনো প্রার্থনা না করা এবং এমন কি হযরত মুহম্মদেরও মধ্যবর্তী হওয়ার কোনো অধিকারে বিশ্বাসী না হওয়া; তৃতীয়তঃ মুসলমান মাত্রেই কুর্‌আনের নিজস্ব ব্যাখ্যা দান ও অর্থ অনুধাবন করার অধিকার থাকা এবং কালামুল্লাহ্‌র যতো প্রাচীনপন্থী ধর্মযাজকীয় ভাষ্য আছে, সব অস্বীকার করা; চতুর্থতঃ সত্য ধর্ম ইসলামে যে-সব বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান মধ্যযুগে ও বর্তমান যুগে ঢুকে পড়েছে, সেগুলি সরাসরি ত্যাগ করা; পঞ্চমতঃ সেই ইমাম (মেহদী) সাহেবের আবির্ভাবের আশায় সর্বদাই প্রস্তুত থাকা, যিনি মুমীন মুসলমান-দিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পথে চালনা করবেন; ষষ্ঠতঃ তদ্‌গত ও কার্যকরীভাবে কাফেরদের সংগে জিহাদ যে ফরয সর্বদাই সে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা; সপ্তমতঃ অকুণ্ঠভাবে পীরের আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। বস্তুতঃ ওহাবীদের বলা যায়, সুন্নীদের একটা আরও কঠোরপন্থী অংশ, আর সুন্নীরাই হচ্ছে ইসলামের পিউরিটান্ সম্প্রদায়। বাংলাদেশের ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশগুলির মুসলমান বাশিন্দাদের প্রায় সকলেই সুন্নী-মতের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

---

২৪ আরবী ভাষায় 'ওহাবী' শব্দ 'ওহ্‌হাবী' রূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু বর্তমানে 'ওহাবী' শব্দ ইংগ-ভারতীয় রূপ নিয়েছে।

২৫ সুন্নীরা প্রধানতঃ হানাফী মযহাবের, তবে কিছু কিছু শাফেয়ীও আছে। হানাফীরা তাদের মশহুর ইমাম আবু হানিফার অনুসারী। ৮৪ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর জন্ম ও ১১৫ হিজরীতে (৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর মৃত্যু। সুন্নীরা দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ে এবং নামাযের সময় হাত দু'টি নাভীর উপরে আড়াআড়িভাবে রাখে ও সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে, কিন্তু হাত দুটি মাথার উপরে তোলে না। [illegible] তারা নিঃশব্দে 'আমীন' উচ্চারণ করে। শাফেয়ীরা তাদের ইমাম

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে আবদুল ওহাব মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু তাঁর বিজিত এলাকাগুলি যোগ্য হাতেই পড়ে। ১৭৯১ সালে ওহাবীরা মক্কার প্রধান শেখের বিরুদ্ধে সাফল্যের সংগে অভিযান চালায়। ১৭৯৭ সালে তারা বাগদাদের পাশাকে পরাজিত করে ও তাঁর বহু সৈন্যকে নিহত করে। এশিয়াস্থ তুর্কীদের বহু উর্বর প্রদেশ এ সময় তাদের করতলগত হয়। ১৮০১ সালে তারা পুনরায় এক লক্ষ সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে মক্কাশরীফে হামলা করে এবং ১৮০৩ সালে এই পবিত্র শহরটি তাদের হস্তগত হয়। পর বছর তারা মদীনা অধিকার করে। ইসলামের এই দু'টি শক্তিকেন্দ্রে সংস্কারপন্থীরা তাদের মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত মুসলমানদের হত্যা করে এবং মুসলিম সাধুসন্তদের মাযারগুলি ভেঙে ফেলে ও কলুষিত করে। তারা পবিত্র মসজিদ বা খানা-ই-কাবাকেও রেহাই দেয়নি। প্রায় এগারোশো বছর ধরে প্রত্যেক ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্ তাঁর দেশের সবচেয়ে মূল্যবান দ্রব্য ভক্তিভরে থরে থরে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সারা দুনিয়া থেকে আহরিত সেইসব ভক্তি-উপহার এবার মরুভূমির একটি মযহাবের তাঁবুগুলিতে সঞ্চিত হয়ে উঠলো।

এ-সবের ফলে সারা ইসলাম জগতে মহা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। বুরবন্ দস্যুদের দ্বারা ভাটিকান লুণ্ঠন এবং খ্রীস্টের ভিকারের স্যান্ট আঞ্জিলোতে বন্দী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা খ্রীষ্টান জগতে যে প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল, একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা-গৃহটি সশস্ত্র মতান্তরবাদীদের হাতে কেবল লুণ্ঠিত হয়নি, জঘন্যভাবে কলুষিত হয়েছিল। আর খোদ রসূলের মাযারও ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং মুসলমানদের মুক্তিলাভের উপায় হজ্বের পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের মর্মরনির্মিত সেন্ট সোফিয়া মসজিদ থেকে সুদূর চীন দেশের পথিপার্শ্বস্থ মাটির তৈরী প্রত্যেক মুসলিম উপাসনাগৃহে ক্রন্দনের

আবু আবদুল্লাহ্ শাফীর অনুসারী। তিনি ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রীস্টাব্দ) জন্ম গ্রহণ করেন ও ২০৪ হিজরীতে (৮১৯ খ্রীস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। শাফেয়ীরা নামাযের সময় হাত দু'টি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখে এবং সামনের দিকে ঝোঁকবার সময় (রুকুতে যাওয়ার কালে) হাত দু'টি মাথার উপর তোলে ও উচ্চস্বরে 'আমীন' বলে।

ও আর্তনাদের তীব্র রোল উঠতে লাগলো। কোনো কোনো শীয়া মুসলমান ঘোষণা করলো, দ্বাদশ ইমামের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা ভাবতে লাগলো, হযরত মুহম্মদের কথিত খারে-দজ্জাল দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে এবং রোয কিয়ামত বা শেষ প্রলয় সমাগত।

রোযা ও নামায সত্ত্বেও ১৮০৩ সাল থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত কোনো হজযাত্রীর কাফেলা মরুভূমি অতিক্রম করেনি। ওহাবীরা সিরিয়া আক্রমণ করলো, ব্রিটিশের সংগে পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ করলো এবং কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করার ভয় প্রদর্শন করতে লাগলো। সর্বশেষে মিসরের মুহম্মদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন। ১৮১২ সালে পাশার পুত্রের অধীনস্থ স্কচ সেনানায়ক টমাস কীথ্ গোলার মুখে মদীনা দখল করলেন। ১৮১৩ সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হলো। আর পাঁচ বছর পরে এই অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড় বিলীন হয়ে যাবার মত ভোজবাজির মতো কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল।

ওহাবীরা এখন বিক্ষিপ্ত গৃহহীন মযহাব। তাদের মতবাদ প্রত্যেক ধনসম্পদপুষ্ট মুসলমানের নিকট ঘৃণিত। বাহ্যিক আকারে তারা ইসলামের ইউনেটেরিয়ান্ বা একেশ্বরবাদী। তারা হযরত মুহম্মদের ঐশী গুণাবলীতে অবিশ্বাস করে, তাঁর নামে নামায আদায় বারণ করে এবং বিগত অলীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেও নিষেধ করে। একনিষ্ঠ ও বাস্তব নৈতিকতাই হচ্ছে তাদের শক্তির প্রধান উৎস। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করে আদিম ইসলামের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে, রীতিনীতিতে সেই রকম সহজ সরলতা, জীবনধারায় সেই রকম পবিত্রতা এবং ইসলাম প্রচারে সেই রকম দৃঢ়তা অবলম্বন করতে, তার জন্যে যতোই বিধর্মীদের রক্তপাত হোক এবং নিজেদেরকে যতোই ত্যাগ স্বীকার করতে হোক। তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে দু'টি—আল্লাহ্‌র একত্ব ও আত্মোৎসর্গ। বে-সামরিক রাষ্ট্রনীতিতে, মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে ও বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে সম্বন্ধ স্থাপনে হযরত মুহম্মদের ধর্মান্ধতাকে সুকৌশলে যেভাবে আপোষরফা করতে হয়েছে, ওহাবীরা সে-সব নীতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আল্লাহর ইচ্ছার উপর যে অকুণ্ঠ নির্ভরতাই হযরত মুহম্মদের সাফল্যের

চাবিকাঠি ছিল, তাই তারা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট দাবী করতো। কিন্তু অন্যান্য সংস্কারপন্থীর মতো তারা এই মৌল নীতির উপর ক্ষমাহীন-ভাবে জোর দিলেও আলেম সমাজের নিকট তাদের আপোষহীন একেশ্বর-বাদিতার জন্যে এবং জনসাধারণের নিকট তাদের বহুল অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান ও পবিত্রীকৃত সংঘগুলির দারুণ অবমাননার জন্যে তারা নিজেদেরই অবস্থা দুর্বল করে তুলেছিল। ফলে, এশিয়ার বহুলাংশে একজন ওহাবী মতবাদীকে সারা মুসলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়, তাকে বহু স্নেহে লালিত ধর্মীয় কাহিনীগুলি ভুলে যেতে হয়, তার বহু ধর্মীয় পালাপর্ব ত্যাগ করতে হয়, বহু পবিত্র বিশ্বাসও অস্বীকার করতে হয়, এমন কি, আপন জন্মদাতার কবর যিয়ারতের মতো সুন্দর রেওয়াজও [২৬] তাকে বিসর্জন দিতে হয়।

ভারতীয় ওহাবীরা অবশ্য মুসলিম হৃদয়ের একটি মৌল বিশ্বাসকে প্রবলভাবে উজ্জীবিত করেছিল, আর সেজন্যেই সব রকম জটিলতা সহজ হয়ে যায়। তাঁর শিক্ষার সংগে বেদুঈন মযহাবের (ওহাবীদের) শিক্ষার সমতা থাকার জন্য মক্কায় থাকাকালে সৈয়দ আহ্‌মদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই বেদুঈন মযহাবের হাতেই এই পবিত্র শহরটি মাত্র কিছুকাল আগে এতো দুর্গতি সহ্য করেছিল। এজন্যে সেখানকার মুফতী সাহেব প্রকাশ্যে সৈয়দ আহ্‌মদকে অপমান করেন ও শহর থেকে বহিষ্কার করে দেন। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, অতঃপর তিনি ভারতে কেবল ধর্মীয় স্বাপ্নিক ও পৌত্তলিক কুপ্রথাগুলির সংস্কারক হিসাবেই ফিরে এলেন না, তিনি ফিরে এলেন আবদুল ওহাবের এক গোঁড়া সাগরিদ হিসাবে। তাঁর স্বভাবে যা কিছু স্বপ্নালুতা ছিল, তা দূর হয়ে এবার রূপ নিলো উগ্র উন্মত্ততার। তিনি কল্পনার চোখে দেখলেন যে, তিনি নিজে ভারতের জিলায় জিলায় অর্ধচন্দ্র-খচিত পতাকা উত্তোলন করছেন, আর বিধর্মী ইংরেজদের শবদেহের নীচে ক্রশচিহ্নটি কবরস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর শিক্ষায় যা-কিছু অস্পষ্টতা ছিল, এবার তা জ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতার বাস্তব রূপ নিলো। এর বলেই আবদুল ওহাব

২৬ এখানে ও পরবর্তী আলোচনায় আমি ১৮৬৪ সালে লিখিত ইংরেজী 'ডেইলী' নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি।

একদা আরব দেশে এক বিরাট রাজ্যের বুনিয়াদ গড়েছিলেন। সৈয়দ আহ্মদও এবার তার বলেই ভারতে আরও বড়ো এবং আরও স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখলেন।

ইমাম সাহেবের মানসিক বিবর্তন কি হয়েছিল, তা তিনি ও তাঁর আল্লাহই জানতেন, কিন্তু এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অতঃপর তাঁর বাহ্যিক চারিত্রিক ধারা বদলে গেল। এখন কেবল মুরীদের সংখ্যা বাড়ানোই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে রইলো না, তা কেবল তাঁর সুবৃহৎ পরিকল্পনার ভূমিকা হিসাবে গণ্য হলো। যখন তিনি বোম্বাই শহরে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েত ও তাঁর বয়েত গ্রহণের আকুল আবেদন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর জয়যাত্রা হয়েছে এবং মক্কা যাওয়ার পূর্বের চেয়ে আরও বেশী করেই হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়েছে, শান্তিপূর্ণ জিলাগুলিতে যেন তিনি তখন ধর্মপ্রচার করেছেন কতকটা ঘৃণামিশ্রিত অসহিষ্ণুতার সংগে, তাঁর নিরন্তর লক্ষ্য যেন নিবদ্ধ ছিল সুদূর সীমান্তের যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলির উপর। তাঁর পরবর্তী কর্মধারা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যথেষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখন সংক্ষেপে তাঁর অনুগামীরা তাঁর শিক্ষা থেকে কি নীতিনির্ধারক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তারই আলোচনা করা হবে। কারণ, এই পদ্ধতি বা তন্ত্রই ভারতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় উজ্জীবন আনয়ন করেছে এবং গত পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্তেজনা জাগিয়ে রেখেছে।

ভারতীয় ওহাবীদের প্রথম অসুবিধা ঘটলো তাদের ইমাম সাহেবের অকালে অদৃশ্য হওয়ায়। তিনি স্বয়ং তাদেরকে বিজয়ের পথে চালনা করবেন, তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের এই বড়ো আশা নিভে গেল। এই প্রতিকূল অবস্থাকে তাদের মতবাদের মধ্যে অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়ার দরকার হলো। সব মুসলমানই বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ায় রোযকেয়ামত শুরু হবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, বড়ো বড়ো সামাজিক বিপ্লব, নীচ লোকের উচ্চাসন অধিকার, ভূমিকম্প, তুফান, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবে। সেই প্রলয়কালে ইমাম মেহ্দী উদয় হবেন। তিনি হযরত মুহম্মদের বংশধর হবেন ও তাঁর নামই গ্রহণ করবেন এবং পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জন্ম গ্রহণ করে প্রথম জীবনে লোকচক্ষুর

অন্তরালে থাকবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আরবের শাসনকর্তা হবেন ও কনস্টান্টিনোপল দখল করবেন। তাঁর পূর্বে তুরস্ক[২৭] খ্রীস্টান রাজার অধিকারে চলে যাবে। তারপর হযরত ঈসার দুশ্মনের আবির্ভাব হবে। সে ইমাম মেহ্দীর সংগে ভীষণ যুদ্ধ করবে। সবশেষে হযরত ঈসা দুনিয়ায় নেমে আসবেন দামিশ্কের পূর্ব দিকে একটা সাদা কিল্লার নিকট'। তিনি দুষ্কৃতিকারিগণকে বিনাশ করবেন এবং সারা দুনিয়াকে হযরত মুহম্মদের দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত করবেন।'

ভারতীয় ওহাবীরা দাবী করতো, সৈয়দ আহ্মদই সেই ইমাম মেহ্দী, যিনি হযরত ঈসার শেষ আবির্ভাবের পূর্বে উদয় হবেন। কিন্তু পাপ-পুণ্যের সংঘর্ষের সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের সংগে অসংগত কয়েকটি ঘটনা-পরম্পরায় তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। অতএব তারা এই সাধারণ বিশ্বাসের মূলেই প্রবল আঘাত হানলো। তারা ঘোষণা করলো, প্রকৃত ইমাম মেহ্দী উদয় হবেন রোয কেয়ামতের সময় নয়, হযরত মুহম্মদের ওফাতের ও রোয কেয়ামতের মাঝামাঝি সময়ের নায়ক হিসাবে। তারা আরও দেখালো যে, সৈয়দ আহ্মদের ইমাম মেহদী হওয়ার সকল চিহ্নই বিদ্যমান ছিল। এটা অবশ্য খ্রীস্টানী ইতিহাস থেকে ধার করা উপমা। তারা পর্বতপ্রমাণ দলীল ও সাক্ষ্য হাযির করে প্রমাণ করলো যে, হিজরীর তের শতকেই (১৭৮৬-১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ) ইমাম মেহ্দীর উদয় হওয়া সম্ভব। সৈয়দ আহ্মদ ১৭৮৬ সালেই জন্ম গ্রহণ করেন। এমন কি শীয়া আলেমদেরকেও, যাদের মতবাদ সংস্কারপন্থীদের চোখে ঘৃণার্হ ছিল, এ কাজে লাগানো হয়েছিল। শীয়ারা অবশ্য সন-তারিখ সম্বন্ধে সুন্নীদের চেয়েও নিশ্চিত হলো এবং তারা ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাবের সন ধার্য করলো ১২৬০ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ। হযরত মুহম্মদ নিজেই কি বলে যাননি, 'তোমরা যখন কালো নিশানগুলি খুরাসান থেকে উড়ে আসতে দেখবে, তখন তাদের সংগে নিও, কারণ তাদের সংগে খলীফা অর্থাৎ আল্লাহর দূত রয়েছেন?' খ্রীস্টান শক্তির নিকট ভারতের পরাজয় এবং আরও শতাধিক চিহ্নের দ্বারা যুগের যে দুঃখ-দুর্দশা প্রকটিত হয়ে উঠেছে সে-সব তাঁরই আগমন-বার্তা ঘোষণা করছে। এ সম্বন্ধে আরও

২৭ মুসলমানরা সাধারণতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে 'রুমের বাদশাহী' হিসাবে মনে করে (অ)

নিশ্চয়তা দেখাবার উদ্দেশ্যে বহু ভবিষ্যদ্বাণীও জাল করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে উত্তর ভারতে আজও গীতে মুখরিত একটি বড়ো কবিতা থেকে নীচের উদ্ধৃতি নমুনা হিসাবে পেশ করাই যথেষ্ট হবে:

আমি আল্লাহ্‌র শক্তি অনুভব করছি—
আমি দুনিয়ার দুর্দশা দেখছি।
চারিদিকেই সৈন্যদের হামলা ও উৎপীড়ন দেখছি।
আমি নীচ লোককে কুশিক্ষায় মত্ত হয়ে আলেমের পোশাকে সজ্জিত দেখছি।
আমি পুণ্যের পতন ও গর্বের বিস্তৃতি দেখছি।
আমি তুর্কী ও ইরানকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে দেখছি।
আমি সুন্দর দেশ থেকে ধর্মভীরুকে পালিয়ে যেতে
আর দুষ্কৃতির আবাস হতে দেখছি।
এ সব দেখেও আমি হতাশ হইনি;
আমি দুঃখহারীকে দেখতে পাচ্ছি।
আমি দেখতে পাচ্ছি, বারোশো বছর পরে[২৮]
দুনিয়ার বুকে আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে।
আমি দুনিয়ার সব রাজাকে সারিবদ্ধ হতে দেখছি।
আমি হিন্দুদেরকে আপদগ্রস্ত দেখছি,
আমি তুর্কীদেরকে উৎপীড়িত হতে দেখছি।
তখন ইমাম উদয় হবেন ও দুনিয়ার শাসনভার হাতে নেবেন।
আমি পড়ছি ও দেখছি احمد (আহ্‌মদ)[২৯],
এই আখরগুলিই সুলতানের নাম ঘোষণা করছে।

---

২৮ আসল কবিতায় ছিল ৭৫০ হিজরী, আহ্‌মদের মৃত্যুর পর ১২০০ হিজরীতে পরিবর্তন করা হয় দরকার মতো। Calcutta Review: Vol. C, p 100 থেকে গৃহীত।

২৯ আসল কবিতায় ছিল محمد (মুহম্মদ)।

অন্য একটি কবিতায় এই অতি প্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে ছিল :

নিয়ামত উল্লাহ্‌র কাসিদা[৩০]

(তাঁর মাযার শরীফ পবিত্র হোক)

আমার সত্য কথা শোন : একজন বাদশাহ্‌ হবেন,
তাঁর নাম তাইমুর, তিনি ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করবেন।

(তারপর শাহ্‌ জাহানের শেষ বংশধরের পর্যন্ত বর্ণনা আছে)

তারপর আর একজন বাদশাহ্‌ হবেন,
তখন নাদির শাহ্‌ হিন্দুস্থান আক্রমণ করবেন।
তাঁর তলোয়ারে দিল্লী শহর কতল হয়ে যাবে।
তারপর আহ্‌মদ শাহ্‌ (আবদালী) আক্রমণ করবেন,
তিনি পূর্বতন শাহী বংশ ধ্বংস করে দেবেন।
এই বাদশাহের মৃত্যু হলে পর
পূর্বতন শাহী বংশ আবার তখ্‌ত পাবে।
এই সময় শিখরা প্রবল হবে, সব রকম নিষ্ঠুরতা করবে ;
তারা চল্লিশ বছর এই রকম করতে থাকবে।
তারপর নাসারারা হিন্দুস্থান দখল করে নেবে,
তারা ঠিক একশো বছর রাজত্ব করবে।
তাদের আমলে দুনিয়া অত্যন্ত উৎপীড়িত হবে।
তাদের বিনাশ হেতু পশ্চিমে এক বাদশাহ্‌ উদয় হবেন।
তিনি নাসারাদের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।
এই যুদ্ধে বহু লোক খুন হয়ে যাবে।
পশ্চিমের বাদশাহ জিহাদের তলোয়ারে জয়ী হবে ;
ঈসার অনুগামীরা পরাজিত হবে।
তারপর ইসলাম চল্লিশ বছর জারী থাকবে,
তারপর একদল অবিশ্বাসী খুরাসান থেকে আসবে।

---

৩০ মূল কবিতা থেকে আমি কয়েকটি শ্লোক নিয়েছি সমগ্র কাসিদাটি উদ্ধৃত হয়েছে ১৮৬৫ সালের ওহাবী মামলার নথিপত্রে।

এই পীড়কদের বিতাড়ন করতে ঈসা নেমে আসবেন,
আর ইপ্সিত মেহদীও উদয় হবেন।
এ সবই ঘটবে রোয কেয়ামত শুরু হলে।
এ গযল রচিত হলো ৫৭০[৩১] হিজরীতে।
১২৭০[৩২] হিজরীতে পশ্চিমের বাদশাহ আসবেন।
নিয়ামত উল্লাহ আল্লাহর কুদরত জানতেন,
তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের জন্যে সফল হবেই।

ভারতীয় ওহাবীরা তাদের নেতার ঐশী মিশনের স্বপক্ষে দলীল পেশের পর যাবতীয় ছোটখাটো প্রশ্ন এড়িয়ে সরাসরি জিহাদের নীতি পেশ করেন। এ সম্প্রদায়ের সকল সাহিত্যের পাতায় পাতায় এ নীতিকে মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রাচীনতম পুঁথিপত্রে এ নীতিটির এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : জিহাদ হচ্ছে অসীম সুফলের কাজ। বৃষ্টি যেমন মানবজাতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মঙ্গল করে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদও সেই রকম মানুষের উপকার করে। এই উপকার লাভ হয় দু'রকমে—সাধারণভাবে, যার দরুন সব মানুষ এমন কি পৌত্তলিক এবং বিধর্মীরাও এবং প্রাণীজগৎ ও বৃক্ষলতা উপকৃত হয় এবং বিশেষভাবে, যার দরুন কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র বিভিন্ন অনুপাতে উপকৃত হয়। সাধারণ উপকার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ-সব হলো স্বর্গীয় আশিষধারা, যেমন যথাসময়ে প্রচুর বর্ষণ, যার ফলে মানুষ অভাবমুক্ত হয়, দৈব-দুর্বিপাক থেকে নিশ্চিন্ত হয়, অথচ ধন-সম্পদে উথলে উঠে। এতে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বিচারকের ন্যায়বিচার হয়, মামলাকারীদের বিবেকজ্ঞান বর্ধিত হয় এবং ধনবানরা আরও দানশীল হয়। এ সব আশিষ শতগুণে বেড়ে উঠে, যখন ইসলামের মহিমা স্বীকৃত হয়, শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী মুসলমান শাসকদের গৌরব বর্ধিত হয় এবং তাঁরা সকল দেশে শরীয়তী আইন ঘোষণা ও বলবৎ করেন। কিন্তু একবার এই দেশের দিকে তাকাও (তখনকার ভারত) এবং স্বর্গীয় আশিষধারার সম্বন্ধে তার ভাগ্যের সঙ্গে তুর্কীস্তানের তুলনা করো। শুধু তাই নয়,

৩১ ১১৭৪—১১৭৫ খ্রীস্টাব্দ।
৩২ ১৮৫৩—১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ।

১২৩৩ হিজরীর (১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ) হিন্দুস্তানের অবস্থা বিবেচনা করো, যখন তার বেশীর ভাগই শত্রুর দেশে (দারুল্-হরব) পরিণত হয়ে গেছে এবং তার সংগে দুই বা তিনশো বছর পূর্বের ভারতের তুলনা করে দেখো এবং সে আমলের সংগে এ আমলের স্বর্গীয় আশিষধারা ও শিক্ষিতের সংখ্যার বৈষম্যটা লক্ষ্য করো।

তাদের অতি জনপ্রিয় সংগীতেও এই মর্মকথা ধ্বনিত হয়। আমাদের সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী-বসতিতে মুজাহিদরা সেই ভাবগম্ভীর সুরের তালে তালে সকালে-বিকালে কুচকাওয়াজ করতো। এ সময়ে ব্রিটিশ রাজপথগুলিকে এই সংগীতে মুখরিত করে নয়া মুজাহিদের কাফেলাগুলি আমাদের প্রদেশসমূহের অন্তস্তল থেকে উত্তরমুখে পাড়ি দিতো :

প্রথমে আল্লাহ্‌র মহিমা গাই, তিনি সব প্রশংসার উর্ধ্বে,
আমি রসূলের প্রশংসা করি, আর জিহাদের গান গাই।
জিহাদ হলো ধর্মের পথে যুদ্ধ, তাতে ক্ষমতার লালসা নেই।
পাক-কালামে তার মহিমা ঘোষিত ; আমি কিছু বলছি শুনো :
কাফেরের সঙ্গে জিহাদ মুসলমানের ফরয,
সবার আগে তার ব্যবস্থা করা চাই।
যে প্রশান্তচিত্তে জিহাদে এক পয়সা খরচ করে,
পরে সে তার সাতশো গুণ বদলা পাবে।
আর যে জিহাদে দান করে এবং নিজেও শরীক হয়,
আল্লাহ্ তাকে সাত হাযার গুণ বদলা দেবেন।
যে আল্লাহ্‌র রাহে একজন মুজাহিদকে সজ্জিত করে,
সে নিশ্চয় শহীদের পুরস্কার লাভ করে।
তার পুত্রকন্যার গোর-আযাব মাফ হয়ে যায়,
রোয-কেয়ামত বা রোয-হাশরে তাদের ভয় নেই।
ভীরু হয়ো না, ইমামের সংগে যোগ দাও,
আর কাফের দলনে তৎপর হও ;
আমি আল্লাহ্‌র মহিমা গাই, এক মহান নেতা এসেছেন
আমাদের মাঝে তেরশো হিজরীতে[৩৩]।

৩৩ ১৭৮৬--১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ।

শোনো, বন্ধু, শোনো। মৃত্যু একদিন হবেই হবে,
কেন তবে নিজেকে আল্লাহ্‌র রাহে বিলিয়ে দিচ্ছ না ?
হাযারো মানুষ জিহাদে যায়, আর অক্ষত দেহে ফিরে আসে,
হাযারো মানুষ তো ঘরে বসেই মরণ বরণ করে।
তোমরা এখন দুনিয়ার মায়ায় পড়ে গেছ,
দারা-পুত্র-পরিবারের মায়ায় আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছ।
স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কতোদিন বাঁচতে পারবে ?
কতোদিন মরণের হাত এড়িয়ে থাকতে পারবে ?
তুমি আল্লাহ্‌র জন্যে দুনিয়াদারী ছেড়ে দাও,
তাহলে তুমি অনন্তকাল বেহেশ্‌তে বাস করবে।
ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের মহিমা গাও,
আর সব ধ্বনি ছাপিয়ে শুধু শোনাও আল্লাহ! আল্লাহ '৩৪।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কর্তব্য বিষয়ে গদ্যে ও পদ্যে যে বিরাট প্রচার-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তার সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা বিশাল গ্রন্থ হয়ে পড়ে। এই ধর্মপন্থীরা যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, তা ব্রিটিশ শক্তির পতনের ভবিষ্যদ্বাণীতে ও জিহাদ করার কর্তব্য নির্ধারণে ভরপুর। এ-সব জনপ্রিয় পুস্তকের শিরোনামাতেই সেগুলির বিদ্রোহাত্মক লক্ষণ যথেষ্ট সুপ্রকাশ। আমি এখানে সেগুলির মাত্র তেরটির নামোল্লেখ করছি :

১। সিরাতুল মুস্তাকিম্ বা সরল পথ। এটি আমিরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদের বাণীর সংকলন। মওলবী মুহম্মদ ইসমাইল দেহলবী কর্তৃক ফারসী ভাষায় লিখিত। মওলবী আবদুল অবহর কানপুরী কর্তৃক হিন্দুস্তানী ভাষায় অনূদিত।

২। কাসিদা বা কবিতাগুচ্ছ। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যে করয, সে সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় ও মুজাহিদদের পুরস্কার বিষয়ে বর্ণনায় ভরপুর। মওলবী করম আলী কানপুরী লিখিত।

৩৪ রিসালা-ই-জিহাদ, অর্থাৎ ওহাবী যুদ্ধসংগীত—Calcutta Review : Vol. cii, P 396.

৩। সির-ই-ওয়াকেয়া। বিধর্মীদের সংগে জিহাদের আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাতে মুজাহিদের বর্ণনা ও কাফেরের বর্ণনা দেওয়া আছে। এই পুস্তিকার অভিমত এই যে, বিধর্মীরা মুসলমানদের পীড়ন করলেই জিহাদ ফরয হয়ে পড়ে।

৪। মওলবী নিয়ামত উল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীসূচক কাসিদা। তাতে ব্রিটিশ শক্তির পতন ও পশ্চিম থেকে আগত ইমাম কর্তৃক পাক-ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজদের কবল থেকে উদ্ধার করার ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

৫। তওয়ারীখ-কায়সার-রুম কিংবা মিসবাহ-উস-সারী। আবদুল ওহাবের জীবনেতিহাস। তুর্কী ধর্মত্যাগীদের সংগ্রাম-সংঘর্ষের কাহিনী। হাতে লেখা পুস্তিকা।

৬। আসার-মাহশার অর্থাৎ শেষ প্রলয়ের চিহ্নসমূহ। মওলবী মুহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত এবং ১২৬৫ হিজরীতে (১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ) প্রকাশিত। এই কাব্যগ্রন্থটি বহুলভাবে প্রচারিত। এতে পাঞ্জাব সীমান্তে খাইবার পর্বতে একটি যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এ যুদ্ধে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে প্রথমে পরাজিত করবে এবং পরাজিত হয়ে মুসলমানরা তাদের প্রকৃত ইমামের সন্ধান করবে। তারপর চারদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হবে এবং শেষে ইংরেজরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে, 'এমন কি শাহীর গন্ধও তাদের মাথা ও মগজ থেকে দূর হয়ে যাবে'। তারপর ইমাম মেহ্‌দী উদয় হবেন। তখন মুসলমানরা পাক-ভারতের শাহানশাহী ফিরে পাবে এবং মক্কায় তাঁর সংগে মিলিত হওয়ার জন্যে দলে দলে যাত্রা করবে। এ ঘটনা সূচিত হবে রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্য দু'য়েরই গ্রহণের দ্বারা।

৭। তাকবিয়াতুল ঈমান বা ধর্মের শক্তিবৃদ্ধিকরণ। মওলবী মুহম্মদ ইসমাঈল দেহলবী লিখিত।

৮। তায্‌কির-উল-আখওয়াই বা ভ্রাতৃসুলভ কথোপকথন। মওলবী মুহম্মদ ইসমাঈল দেহলবী লিখিত।

৯। নসিহাতুল্-মুসলেমীন্ বা মুসলমানদের প্রতি উপদেশ। মওলবী করম আলী কানপুরী লিখিত।

১০। হিদায়াতুল্ মুসলেমীন বা মুসলমানদিগকে পথ প্রদর্শন। আওলাদ হোসেন লিখিত।

১১। তানবীর-উল-আইনাইন বা চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিতকরণ। এখানি আরবী ভাষায় লিখিত।

১২। তাম্বী-উল-গাফেলীন্ বা অমনোযোগীদের প্রতি তিরস্কার। উর্দূতে লিখিত।

১৩। চেহেল-হাদীস। জিহাদ সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদের চল্লিশটি বাণী।

এ গ্রন্থসমূহের মধ্যে কতকগুলি আবার এরূপ উগ্র বিদ্রোহাত্মক ছিল যে, সেগুলি হাতে লেখা অবস্থায় গোপনে হাতে হাতে বিলি হতো। অন্য-গুলি খোলাখুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতো। এ বিষ কেবল পাঠক-মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একদল প্রচারক কর্তৃক বাংলা দেশের জিলায় জিলায় এ ছড়ানো হতো। প্রচার-কার্যে প্রেরণের পূর্বে তাদের প্রত্যেককেই প্রথমে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের জন্য সুষ্ঠু তালিম দেওয়া হতো।

এ-সব পুস্তকের অধিকাংশই ব্রিটিশ-ভারতের শহরে শহরে প্রকাশ্যে বিক্রয় হতো, আর সবচেয়ে উগ্র বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকাই সাধারণ্যে বেশী আদরণীয় ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের বাণী ছড়াবার উদ্দেশ্যে ওহাবীরা যে চারটি স্থায়ী সংস্থা গড়ে তুলেছিল, এ-সব উত্তেজক প্রচার-সাহিত্য ছিল তার এক অংশ। প্রথমতঃ পাটনা শহরে তাদের একটা স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র আছে। এটি বহুকাল ধরেই এ শহরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করেছে এবং যদিও বার বার সরকারী মামলায় তার শক্তি কিছুটা ভেঙে পড়েছে, তবু এখনও সারা বাংলাদেশে তার ক্ষমতা অপ্রতিহত। ১৮২১ সালে ইমাম সাহেব পাটনায় যাঁদের খলীফা নিযুক্ত করেন, তাঁরা ছিলেন উৎসাহে ও মনোবলে দুর্দমনীয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, বারে বারে তাঁদের অবস্থা সর্বনাশের মুখে এসে পড়লেও কিভাবে তাঁরা ধূলির মধ্য থেকে পুনরায় জিহাদের নিশান উড়িয়েছেন। প্রচারক হিসাবে অক্লান্ত, নিজেদের সম্বন্ধে একেবারে অমনোযোগী, চরিত্রে অকলংক, বিধর্মী ইংরেজদের উচ্ছেদ সাধনে সর্বস্বপণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মানুষ ও টাকা-পয়সার আমদানীর জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা পত্তনে

অত্যন্ত সুকৌশলী পাটনার এ-সব খলীফা ওহাবী সম্প্রদায়ের আদর্শ চরিত্র হিসাবে সর্বদা প্রশংসার যোগ্য। তাঁদের শিক্ষার অধিকাংশই ছিল নির্দোষ এবং তাঁদের মহান দায়িত্ব ছিল হাযার হাযার স্বদেশবাসীকে সাধু জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের মনে সত্যবোধ জাগ্রত করা। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কেবল নৈতিক বিধানে একটা বৃহৎ সম্প্রদায়কে অধিককাল একত্রে বেঁধে রাখা যায় না। তাই এ উজ্জীবনে ধর্মীয় দিকটা শীঘ্রই শক্তিহীন হয়ে পড়লো। এমনকি, এই আন্দোলনের আদি নেতাদের কালেই এতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো। এজন্যে খলীফাদেরকে শুধু কাফের-বিদ্বেষের উপরেই বেশী করে জোর দিতে দেখা যেতো।

পাটনার প্রচারকেন্দ্র এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং এজন্যে তাঁদের শিক্ষার ধারাও কালোপযোগী করে তুলেছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র আত্মসচেনতা-বোধের উপরে নির্ভর না করে ইংরেজদের উপর পাক-ভারতীয় মুসলমানদের যে জাতক্রোধ ছিল, তারও আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এভাবে তাঁরা তাঁদের শিক্ষার মৌল ভিত্তি মহৎ সম্ভাবনাময় মুসলিম অন্তর থেকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় স্থাপিত করলেন। যতোই দিন যেতে লাগলো, ততোই তাঁরা শিক্ষার মধ্যে বিদ্রোহের সুর উগ্র করার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন। তাঁরা পাটনা প্রচারকেন্দ্রকে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের সরাইখানায় পরিবর্তিত করে তুললেন। তার চারিদিকে দেওয়াল ও বাহিরবাটী তৈরী করে এবং একটি বেষ্টনী থেকে আর একটিতে যাওয়ার মাত্র একদিকে দরওয়াজা রেখে ও ভিতরের কোণাগুলির মধ্যে গুপ্তকক্ষ তৈরী করে যেন একটা বড় গোলকধাঁধা সৃষ্টি করা হলো। প্রথম দিকে খলীফারা বাহুবলে ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানা প্রতিরোধ করবার হুমকি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অলি-গলি, কুঠুরী ও গুপ্তকক্ষের গোলকধাঁধা তৈরী করে আরও নিরুপদ্রবভাবে কাজ হাসিল করতো। সরকার যখন শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বাসা ভেঙে ফেলতে উদ্যত হলেন, তখন এসব বাড়ীর একটা নক্শা যোগাড় করা দরকার হয়ে পড়ে। এ যেন একটি রীতিমতো দুর্গসুরক্ষিত শহরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। জিলা-প্রচারকেরা প্রচারকেন্দ্রে ধর্মান্ধ সাধারণ লোকদের পাঠিয়ে দিত। তাদের অধিকাংশই পাটনার

নেতাদের বক্তৃতায় দ্বিগুণ উৎসাহ পেয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে সীমান্তের বস্‌তিতে যাত্রা করতো। যে সব যুবককে নির্ভরযোগ্য মনে হতো, তাদেরকে আরও দীর্ঘকাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হতো এবং রাজদ্রোহের শিক্ষায় চরমভাবে শিক্ষিত করে তুলে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ধর্মীয় প্রচারক হিসাবে ফেরত পাঠানো হতো।

পাটনার খলীফাদের ইতিহাস আলোচনায় তার ভালো দিকটা পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে আমি বিশেষ যত্ন নিয়েছি। নৈতিকতার একটা প্রশংসনীয় নিয়ম পালন করতে তারা প্রথমে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা তাদের শিক্ষা থেকে ধর্মীয় ভাব ছেঁটে ফেলে দিয়েছিল এবং মানুষের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে খুঁচিয়ে তুলে তাদের অবনতমুখী অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিল। তারা কোন্ শ্রেণীর প্রচারক তৈরী করতো, পরে আমি তার নমুনা দেব। এখানে যা দিয়ে এ-সব প্রচারক তৈরী করা হতো, আমি তাদের শিক্ষার কিছু নমুনা দিচ্ছি। পাটনার প্রচারকেন্দ্র এ বিষয়েই বেশী জোর দিত যে, যে-সব ভারতীয় মুসলমান দোজখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তাদের জন্য দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—বিধর্মীদের সংগে যুদ্ধ করা, কিংবা এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করা[৩৫]। কোনো মুমিন মুসলমান তার আত্মনাশ না করে আমাদের সরকারভক্ত হয়ে এদেশে বাস করতে পারে না—'যারা জেহাদ বা হিজরত থেকে বিরত রইবে, তারা অন্তরে মোনাফেক বা ভণ্ডবিশ্বাসী। এ কথাটা সকলেরই জানা উচিত: যে দেশের সরকারের ধর্ম ইসলাম নয়, সে দেশে হযরত মুহম্মদের শরীয়তী বিধান প্রতিপালিত হতে পারে না। সেখানে মুসলমানদের পক্ষে ফরয হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও কাফেরদের সংগে জিহাদ করা। যারা জিহাদে যোগদান করতে অপরাগ, তাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলাম-অধ্যুষিত দেশে হিজরত করা। বর্তমান কালে ভারত থেকে হিজরত করা ফরয হয়ে পড়েছে। যে এ কথা অবিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির দাস। যে হিজরত করেও পুনরায় ফিরে আসে, তার সব পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। সে যদি ভারতে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার নাজাত বা মুক্তিলাভ হবে না।...

---

৩৫ জিহাদ অথবা হিজরত।

"সংক্ষেপে বলতে চাই, ভাইসব! আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য ক্রন্দন করা উচিত, কারণ আমরা কাফেরের দেশে বাস করছি বলে আল্লাহ্‌র রসূল আমাদের উপর বিরূপ হয়েছেন। যখন খোদ্ রসূলুল্লাহ্ আমাদের উপর বিরূপ হয়েছেন, তখন আমরা কার শরণাপন্ন হবো? যাদের আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন, তাদের উচিত হিজরত করা, কারণ এদেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমরা যদি সত্য কথা বলি, তাহলে আমাদের ধর্মচ্যুতি হয়"[৩৬]।

বিদ্রোহাত্মক সাহিত্য ও পাটনা প্রচারকেন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেক জিলায় তাদের মতবাদ প্রচার করবার জন্য ওহাবীদের একটা স্থায়ী সংগঠন আছে। যদিও সময়ে সময়ে এ-সব স্থানীয় প্রচারকদেরকে জ্বলন্ত অংগারের মতো মনে হতো, তবু তাদের সম্বন্ধে সম্মানের সংগে আলোচনা না করে পারিনে। তাদের অনেকেই যৌবনে উৎসাহী ধার্মিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করে। অনেকেরই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্মের জন্য প্রগাঢ় উৎসাহ থাকে এবং পাটনার শিক্ষকেরা শিক্ষা দিলেও তাদের মধ্যে বিষাক্ত মতবাদের লেশমাত্র বর্তমান থাকে না। যে সত্যাভিমানী মানুষ শহরেই আবদ্ধ থাকে এবং তার মতোই অগুণতি সহযাত্রী নিয়ে ভারী ভারী মোটা-গাঁঠরীসহ দুনিয়াময় সফর করে, সে কখনো ওহাবী প্রচারকের নির্ঝঞ্ঝাট ও নিঃসংগ জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। নির্জনতায় আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে এবং বনপথের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের উপরে একাকী পদব্রজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তীর্থযাত্রী পবিত্র ও বিশুদ্ধ চিন্তাই করতে পারে, যা প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকোলাহলে মোটেই সম্ভব নয়। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, একমাত্র ওহাবী প্রচারকই সবচেয়ে ধর্মানুরাগী ও একেবারে নিঃস্বার্থ ইংরেজরা বিশ্বাস করতে ভালবাসে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা জীবনের সর্বোত্তম সময়ে মেরী ইংলণ্ডের খোলা জায়গায় বাস করতো, যা আমরা এখন মোটেই করিনে। আর ছেলেবেলার স্মৃতিতে কর্মক্লান্ত মানুষের মনে খোলা

৩৬ জাম-তফসীর, দিল্লীতে ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত। Calcutta Review: Vol. cii, P. 391. প্রথম প্যারাটি ৩৯৩ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত অংশ।

জায়গার দৃশ্যগুলির মত আর কোনো সুখকর ছবি ফুটে উঠে না। বিখ্যাত খ্রীস্টান রূপকাহিনীতে এইসব উন্মুক্ত বহির্দৃশ্যের মধ্য দিয়েই তীর্থযাত্রী ধ্বংসের শহর অতিক্রম করে স্বর্গের শহরে প্রবেশ করেছেন।

এই রকম আর্ডেন বনানীর মনোভাব প্রাচীন ভারতে উচ্চতম স্তরে উঠেছিল এবং প্রকৃতির স্নেহসিক্ত আবহাওয়া যে সব মনোবৃত্তির দরুন শীতপ্রধান দেশের মানুষ বদ্ধঘরের আশ্রয়কেই সর্বোত্তম মনে করে তাকে অবান্তর করে দিয়েছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রীর জীবনের অনুশাসন হচ্ছে প্রত্যেক বর্ণশ্রেষ্ঠ গৃহী পুত্রকন্যার জন্য দানের পর আত্মীয়-পরিজনের সংসর্গ পরিত্যাগ করে বনবাস করবে[৩৭]। প্রত্যেক লোকপ্রিয় কাহিনীতে প্রবহমান নদীতীরে আমরা কোন না কোন সম্মানার্হ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই। শকুন্তলা নাটকের মধুরতম দৃশ্যগুলিও হচ্ছে কানন-পথে হরিণ-শিশু-বেষ্টিত তরুণীর চিত্র। ভারতীয় জাতীয় জীবনের এই নিঃসংগ জীবনধারার কামনাটিকেও ওহাবী নেতারা সুকৌশলে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। শহরের সবচেয়ে নীচ শ্রেণীর লোকরাও লাম্পট্যে-অপব্যয়ে সবকিছুই খুইয়ে ফেলে, কিংবা অপকর্মের দ্বারা আইনের হাত এড়াবার সব ফন্দি শেষ করে দিয়ে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যোগদান করে সাধু হয়ে ওঠে এবং পাহাড়ে-কন্দরে নির্জনবাস অবলম্বন করে, কিংবা দেশে দেশে নিঃসংগ মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অকলংক চরিত্রের ওহাবী প্রচারকের নিঃসংগ জীবন পল্লীবাসীকে তাদের চাইতেও অনেক বেশী আকৃষ্ট করে থাকে। বছরের অনেক মাসই ওহাবী প্রচারক কোনো গৃহীর দরওয়াজা মাড়ায় না। সে আসে বহু দূরদেশ থেকে এবং সম্ভব হলে একজন অতিবিশ্বাসী শিষ্য ব্যতীত অন্য কোনো সংগীকে তার আত্মসমাহিত জীবনে টেনে আনে না। তার শান্ত মধুর স্বভাব ও পরিবেশের প্রতি নিস্পৃহতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেই মনে হয়। অতএব গ্রামবাসীরা যে তার সাক্ষাৎ পেলেই তার চার পাশে ভীড় জমাবে এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেচনালীর ঝগড়া কিংবা সীমানা নিয়ে বহু কালের ফাসাদের কথা ভুলে যাবে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। ওহাবী প্রচারকেরা সব সময়েই সরাসরি রাজদ্রোহের শিক্ষা

৩৭ তুলনা করুন—পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ (অ)।

না দিলেও তারা সে সব বিষয়েই শিক্ষা দেয়, যার দরুন শ্রোতারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বেকন সাহেবের লোভনীয় প্রবচন ব্যবহার করলে বলতে হয়, এমন সব বিষয়ে তারা শিক্ষা দেয়, যার দরুন উদারতা ও মানবিকতার নীতিগুলি ক্ষয়ে যায় ও মুছে যায় এবং ঈশ্বরকে নীচে নামিয়ে আনা হয় কপোত-মূর্তিতে নয়, দাঁড়কাক ও শকুনের মূর্তিতে। অবশ্য কোনো কোনো প্রচারক এ-সব বিষাক্ত শিক্ষা দেওয়া থেকে একেবারে বিরত থাকে। ১৮৭০ সালে আমি যখন পূর্ববংগের ধর্মান্ধ জিলাগুলিতে সফর করেছিলুম, তখন আমি এই রকম একটি কাহিনী শুনেছিলুম। তাই কেউ যদি ভাবেন যে, আমি ওহাবী ও রাজবিদ্রোহী শব্দ দুটিকে সমান অর্থে ব্যবহার করেছি, তাহলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। একজন ওহাবী প্রচারক একবার একটি গ্রামে উপস্থিত হয়। সংগে সংগে কয়েক হাজার মুসলমান তার নিকট ভীড় জমায়। জমায়েতের শেষ পরিণতি হিসাবে বিধর্মীদের উপর যে উত্তেজনা ফেটে পড়ে, তা স্মরণ করে স্থানীয় হিন্দুরা আতংকিত হয়ে ওঠে এবং সংগে সংগে জিলা-কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করে লোক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্রচারকটি মুসলমান শ্রোতাদের দুর্নীতিপরায়ণ জীবন ও পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানেরই তীব্রকণ্ঠে নিন্দা করলো, জিহাদ সম্বন্ধে একটি কথাও বললো না। এ-সব নিছক নৈতিক তত্ত্বকথা শোনবার জন্য মাঠের মধ্যে লোকগুলি জমায়েত হয়নি; ফলে নিরাশ হয়ে ভীড় শীঘ্রই ভেঙে গেল। তারপর হিন্দু সংবাদদাতারা যখন শহর থেকে এলো, তখন তারা দেখলো যে, তথাকথিত বিদ্রোহর প্রচারককে তার স্বধর্মীরা পরিত্যাগ করে চলে গেছে এবং একটু আগুন ও কিছু চাউলের জন্য সে হিন্দু বাশিন্দাদেরই শরণাপন্ন হয়েছে।

সাদা কথায়, ওহাবী প্রচারক যে-সব জিলার মধ্য দিয়ে সফর করে বেড়ায়, তাদের ব্রিটিশ কর্মচারীদের নিকট থেকে ভয় করবার কোন কারণই থাকে না। আর তার সুবিধাজনক প্রচারক্ষেত্র হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতের ছায়াচ্ছন্ন প্রাংগণ, যেখানে মামলাকারীরা ভীড় জমায়। আমি প্রথম যে ওহাবী প্রচারককে দেখি, তিনি কমিশনার সাহেবের সার্কিট হাউসের প্রাংগণে আস্তানা ফেলেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ব্যক্তি। বটগাছের তলায় একদল মুসলমানের নিকট তিনি বক্তৃতা

দিচ্ছিলেন। তাঁর নিকটেই একটা ক্ষুদ্রাকৃতি লালচে রঙের ঘোড়া সরু গলায় প্রকাণ্ড মাথাটা নিয়ে জিনের ক্ষত থেকে তার শীর্ণ লেজ দিয়ে মাছি তাড়াবার কসরত করছিল। বেচারা পশুটার সামনের পা দুখানি ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সে এক গুছি ঘাস থেকে আর এক গুছি ঘাসের দিকে কষ্টের সংগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। আর মাঝে মাঝে সে মাথাটা ঘুরিয়ে তার শীর্ণ লেজের নাগালের বাইরের দুষ্ট মাছিটার দিকে তাকাচ্ছিলো দুরন্ত আক্রোশে। তারপর মাথাটা অসহায়ভাবে লম্বা করে দিচ্ছিল পথক্লান্ত বিশীর্ণ জন্তুর মতো। বৃদ্ধ লোকটি গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু শোভিত। তিনি ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন, তবু তার কথায় উত্তর-বাংলার টান বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তিনি খুবই আগ্রহের সংগে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর আট-দশ জন শ্রোতা বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে তাঁর কথা শুনছিল এবং বিদায় নেওয়ার পূর্বে সামান্য সালাম ব্যতীত তারা ইংলণ্ডের পথপার্শ্বের ধর্মীয় সভায় আসা-যাওয়াতে জমায়েতের স্বাধীন ভংগীতেই চলে গেল। তখন ছিল মে মাস এবং বৃদ্ধ প্রচারকটি আসন্ন মহররম পর্বের নির্বোধ উৎসবের তীব্র নিন্দা করছিলেন। কোনো রকম অপমানকর কথা না বলে তিনি শ্রোতাদের বলছিলেন যে, তারা প্রবীণ অন্তরে নতুন কাপড় পরবে, তারা বাংগালী বিধর্মীদের বাঁশী ও ঢোলের শব্দে কান ভরিয়ে তুলবে না, কারণ তাহলে তারা কুরআনের সহজ সত্য ভুলে যাবে। আর মহররম পর্বের সব-উৎসব মায় কৃত্রিম লড়াই, তাযিয়াবাজী, কৃত্রিম শোক প্রদর্শন, খানাপিনা ও লোক দেখানো অনুশোচনা সমস্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট অত্যন্ত ঘৃণার্হ।

পশ্চিম বাংলার পল্লীবাসী শান্ত মুসলমান সংস্কারপন্থী ওহাবীদের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র নয়। এজন্যে বক্তৃতার শেষে জমায়েত ভেঙে যাওয়ার সময় একমত না হলেও প্রচারকের বিরুদ্ধেই তারা মতপ্রকাশ করতে লাগলো। একজন বললো, 'এই সাহেব আমাদের বাপ-দাদার কবরে বাতি দেওয়া বন্ধ করে দেবে!' আর একজন বললো, 'উনি তো বিয়ে-শাদীতে নাচগান বন্ধ করে দিতে বললেন।' তৃতীয় জন তাঁর স্বপক্ষে বললো, 'তবুও দেখ, তিনি কুরআন শরীফের সাতাত্তর হাযার ছয়শো উনচল্লিশটি কথা মনে রেখেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে,

আল-কিতাব কেবল আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করতে বলে। তিনি নিশ্চয়ই মস্ত বড়ো আলেম।' সংগে সংগে একজন মোল্লা অথবা মসজিদের খতিব প্রতিবাদ করে উঠলো, 'থামো! থামো! উনি তো সেই জাল ইমামের চেলা, যিনি খুন বহিয়ে মক্কা-মদীনা দখল করেছিলেন, হজ্জের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর কাবাশরীফের দরওয়াজায় লিখে দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই এবং সাউদ তাঁর রাসূল (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহা সাউদু রাসূলুল্লা)'।

মোট কথা, ধর্মোপদেশটা মাঠে মারা গেল এবং প্রচারকটিও সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। জমায়েত ভেঙে গেল; কেবল দু'জন ময়লা কাপড়-পরা মুসলমান তাঁর নিকটে বসে রইল। তারা প্রচারকেরই সহযাত্রী এবং প্রত্যেকটি ইংগিত তারা শ্রদ্ধার সংগে লক্ষ্য করছিল। তিনি তাদের সংগে মৃদুস্বরে দু'চারটি কথা বললেন, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ময়লা কাপড়-পরা সাগজিদ দু'জন পালাক্রমে তাঁকে বাতাস করতে লাগলো। তার শ্রান্ত-কান্ত ঘোড়াটা ঘাস খোঁজার আর বৃথা চেষ্টা না করে নিকটবর্তী গাছের তলায় পরম নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে লাগলো। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা পরিবেশে দল-বল সবার অলক্ষ্যে স্থান ত্যাগ করলো। বৃদ্ধ লোকটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলেন, আর সাগরিদ দু'জন তাঁর দু'পাশে যেতে লাগলো।

এ কথা স্মরণীয় যে, পাক-ভারতীয় ওহাবীরা এই মহান সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। উপরোক্ত ব্যর্থ প্রচারক এই সময়ে সারা এশিয়ায় সফর করে বেড়ানো এই রকম হাযার কয়েক আন্তরিক বিশ্বাসীদের একজন প্রতিনিধি মাত্র। তারা মসজিদে কখনো আদরের সংগে গৃহীত হত, কখনো প্রত্যাখ্যাত হত। নানা ভাষায় বক্তৃতা করে বেড়াত। কিন্তু তারা সকলেই ছিল এক মহান কর্তব্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা হলো, হিল্ডব্রাণ্ডের সাধু-সন্তরা যেমন রোমের চার্চের সংস্কার সাধন করেছিলেন, সেই রকম হযরত মুহম্মদের ধর্মমতের সংস্কার সাধন ও বিশুদ্ধকরণ।

পাক-ভারতে বৃটিশ শাসনের একটা অশুভ চিহ্ন এই হলো যে, এই ওহাবী আন্দোলন বিধর্মী বিজেতাদের বিরুদ্ধে জাতক্রোধ হিসাবে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হয়ে রইলো। কিন্তু যেখানেই মুসলমানেরা তাদের আদি ধর্মীয় স্তরে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেছে, সেখানেই শাসনশক্তির

সংগে সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, সবচেয়ে গোঁড়া মুসলিম রাষ্ট্রও তাদের ধর্মীয় মৌল নীতিকে বে-সামরিক সরকারের চাহিদার সংগে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে পরিবর্তিত ছাঁচে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামের শক্তিকেন্দ্র মক্কাতে সারা দুনিয়ার চেয়ে ওহাবীরা বেশী ভীতি-প্রদ ও ঘৃণিত। উপরের কয়েক পৃষ্ঠায় আমি ওহাবী প্রচারকের শান্ত দিকটাই আলোচনা করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন সব লোক যারা স্বদেশবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকদের ধর্মান্ধ বিদ্রোহী মনোভাবকেই প্ররোচিত করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুরাতন মুসলমান-বিদ্বেষ তারা কিভাবে উগ্র বক্তৃতার দ্বারা জিইয়ে রেখেছে, তার নমুনা হিসাবে নীচের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট; মুসলমানের প্রথম ফরয হচ্ছে জিহাদ করা; অতএব যারা বলে যে, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ জিহাদ দুঃসাধ্য, তাদের উত্তরে ওহাবীরা বলে, এক্ষেত্রে হিজরত করাই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প পন্থা। কারণ যতোদিন বিধর্মী সরকার বলবৎ থাকবে, ততোদিন সে দেশ ও সে দেশের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই অভিশপ্ত। ওহাবীরা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে জিহাদের জন্য কিভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করতো পূর্বেই আমি তার উদাহরণ দিয়েছি। এখানে আমি দেখাবো যে, পূর্ব বাংলার অশিক্ষিত চাষী সম্প্রদায়কে তারা কিভাবে যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করতো যে তারা যখন একযোগে বিদ্রোহ করতে অক্ষম, তখন তাদের পক্ষে অনন্ত শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র বিকল্প পথ হচ্ছে গৃহবাস ত্যাগ করা ও একযোগে বিধর্মীর দেশ থেকে হিজরত করা :

"আল্লাহর নামে বলছি! করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ পরম কল্যাণকর। তিনি সারা বিশ্বের মালিক। আল্লাহ্র রসূল হযরত মহম্মদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবাদের উপর আল্লাহ্র রহ্মত ও নিরাপত্তা বর্ষিত হোক। তোমরা শোনো, যে দেশের শাসক বিধর্মী এবং যে দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ মুসলিম শরীয়ত অনুযায়ী কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দেয়, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে ফরয। তারা যদি হিজরত না করে, তাহলে মউতের সময় যখন তাদের আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করা হবে (রুহ কবয্ করা হবে), তখন তাদেব ভীষণ শাস্তি (আযাব) হবে। আযরাঈল যখন তাদের দেহ থেকে আত্মা পৃথক

করবেন, তখন তাদেরকে এই প্রশ্ন করবেন: 'তোমরা গৃহ ত্যাগ করে অন্য দেশে হিজরত করতে পারো আল্লাহ্‌র বিস্তীর্ণ রাজ্যে কি এমন কোন জায়গা ছিল না?' এই কথা বলে, কঠিন শাস্তি দিয়ে তিনি তাদের আত্মা দেহ থেকে পৃথক করবেন। অতঃপর কবরের ভেতরও তাদের বিরামহীন শাস্তি চলতে থাকবে এবং রোজ হাশরের দিনে তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে এবং অনন্তকাল শাস্তিভোগ করবে। আল্লাহ করুন কোনো মুসলমান যেন বিধর্মীশাসিত দেশে মৃত্যুবরণ না করে।

"তোমরা এখনই পলায়ন করো। সেই দেশে হিজরত করো, যে দেশের শাসক মুসলমান। মুমেন বান্দার সহিত তোমরা বাস করো। তুমি যদি জীবিত থেকে সে দেশে হিজরত করো, তাহলে তোমার সারাজীবনের পাপ মাফ হয়ে যাবে। সে দেশে ভাত-কাপড়ের ভাবনা তুমি ভেবো না। আল্লাহ্‌ সবকিছু দেন, তুমি যেখানেই যাও সেখানেই তিনি তোমার আহার যোগাবেন।

"পুরাকাহিনীতে আছে যে, একজন ইসরাঈলী নিরানব্বইটা খুন করে এক সাধুর নিকটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ও জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে তার মুক্তিলাভ হবে। সাধুপুরুষ বললেন, 'যদি কেউ অন্যায়ভাবে একজন লোকও খুন করে, তাহলে তার পরিত্রাণ নেই। তোমার পাপের ক্ষমা নেই, তোমাকে দোজখে যেতেই হবে।' এ কথা শুনে ইসরাঈলী বললো, 'আমাকে দেখছি দোজখে যেতেই হবে, এটা ধ্রুব সত্য। তাহলে তোমাকেও খুন করে খুনের সংখ্যাটার শতপূর্তি করে যাই।' এ কথা বলে সে সাধুপুরুষটাকে খুন করলো। তারপর সে আর একজন সাধুপুরুষের নিকট যেয়ে স্বীকার করলো, সে একশোটি খুন করেছে, এখন কিভাবে তার মুক্তিলাভ হবে'। এই সাধুপুরুষ বললেন, 'অকপট মনে অনুশোচনা করো ও বিধর্মীর দেশ থেকে হিজরত করো।' এ কথা শুনেই সে তওবাহ্‌ করলো এবং নিজের দেশ দেকে বিদেশ যাত্রা করলো। পথে কিন্তু তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। এবং করুণার দূত ও শাস্তির দূত দু'জনেই তার দেহ থেকে আত্মা পৃথক করতে হাযির হলেন। করুণার দূত বললেন, দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার অধিকার তাঁরই, কারণ লোকটি তওবাহ্‌ করেছে এবং হিজরতও

করেছে। শান্তির দূত স্বীকার করলেন, লোকটি যদি অন্য রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারতো, তাহলে কাজটি করার অধিকার করুণার দূতেরই হতো। কিন্তু তিনি নিজের অধিকার দাবী করলেন ও শাস্তি দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে চাইলেন। তাঁর যুক্তি এই যে, লোকটি বিধর্মীদের দেশ ত্যাগ করে মু'মেন মানুষের দেশে হিজরত করতে সমর্থ হয়নি। তখন দূত দু'জন যেখানে লোকটি শুয়েছিল, সেই জায়গাটি মেপে দেখলেন এবং ফলে জানা গেল যে, লোকটির একখানি মাত্র পা সীমানা অতিক্রম করে ইসলাম-শাসিত দেশে পৌঁছেছে। তখন করুণার দূত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঘোষণা করে সংগে সংগে বিনা-শাস্তিতে লোকটির মৃত্যু ঘটিয়ে দিলেন, আর লোকটিও আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত মু'মেন মানুষের দলভুক্ত হয়ে গেল। তোমরা শুনলে, কিভাবে হিজরত মৃত্যুর পরেও পুরস্কৃত হয়। অতএব আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে হিজরত করার সামর্থ্য দেন। আর অতি শীঘ্র হিজরত করো, নাহলে বিধর্মীর দেশেই তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে''।[৩৮]

এ-সব অসংখ্য বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা এবং পাটনার প্রচারকেন্দ্র ও বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফরকারী প্রচারক-দল ছাড়াও ওহাবীরা জনগণকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আর একটি চতুর্থ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল। প্রাথমিক খলিফারা প্রচারকদের স্থানবিশেষে স্থায়ীভাবে বাস করার ইচ্ছা সমর্থন করতেন এবং জনসাধারণ ইচ্ছা করলে সে সুযোগও দিতেন। এভাবে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে বহু বিদ্রোহী-বসতি গড়ে উঠেছিল। এ-সব জিলাকেন্দ্রের কর্মকর্তারা পাটনা প্রচার কেন্দ্রের সংগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করতো এবং প্রত্যেকেরই টাকা-পয়সা ও মানুষ সংগ্রহ করবার নিজস্ব ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকতো। ১৮৭০ সালে এরকম দু'টি জিলাকেন্দ্র ভেঙে ফেলা হয় ও তাদের প্রধান প্রচারকদের আদালতে নিরপেক্ষ বিচারের পর প্রত্যেককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয় ও সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করে নেওয়া হয়। তখন যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, তাতে যে-কোনো বিদেশী সরকার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চেয়ে নিজেদের ন্যায়পরায়ণতায় কম

৩৮ Calcutta Review : cii, p 388-89 থেকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

আস্থাবান হতে পারতো। আমি এখানে সংক্ষেপে একজন কয়েদীর কার্যকলাপের বর্ণনা করছি।

প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে একজন খলীফা নিম্ন-বংগের মালদহ জিলায় প্রচারকার্যে আসেন[৩৯]। ক্ষেত্র আশাপ্রদ দেখে স্থানীয় একটি গ্রামে তিনি কয়েক বছর স্থায়ীভাবে বাস করেন। তিনি একটি স্থানীয় মেয়েকে বিবাহ করেন ও একটি মকতবে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ছোট ছোট গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা তার নিকট পড়াশুনা করতো। এভাবে তিনি জিলার জোতদারদের পরিবারগুলিতে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি প্রবল এবং উৎকটভাবেই বিদ্রোহ প্রচার করতেন। জিহাদের জন্য তিনি বাশিন্দাদেরকে বাঁধাধরা নিয়মে চাঁদা দিতে অভ্যস্ত করে তোলেন এবং প্রতি বছর সীমান্তের বিদ্রোহ-বসতিতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পাটনা প্রচারকেন্দ্রে টাকা-পয়সা ও মানুষ প্রেরণ করতেন। একজন সামান্য চাষীকে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী করিৎকর্মা ধর্মীয় কর আদায়কারী[৪০] করে গড়ে তোলেন। সে আদায়ী করের এক-চতুর্থাংশ মজুরী হিসাবে গ্রহণ করতো। কালক্রমে সে গ্রামের সরদার হয়ে ওঠে। বহুবছর ধরে সে বিনাবাধায় নিজের কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু ১৮৫৩ সালে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের মনে সন্দেহ জাগে। তখন এই ধর্মীয় কর আদায়কারীর খানা-তল্লাসী করা হয় এবং তার ফলে এমন সব চিঠিপত্র বের হয়ে পড়ে, যার দ্বারা তার সব বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ প্রমাণিত হয়। পাঞ্জাবে মাত্র কিছু দিন পূর্বে সীমান্তের বিদ্রোহী বসতিতে যে জিহাদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়, তার সংগেও তার যোগাযোগ প্রমাণিত হয়[৪১]।

তখনই জিলাকেন্দ্রের কর্মকর্তাকে আটক করা হয়। কিন্তু ছোটখাট ষড়যন্ত্রকারী সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক উপেক্ষার মনোভাবহেতু কিছুদিন পরেই তাকে খালাস দেওয়া হয়। এ-রকম ক্ষণস্থায়ী মেয়াদেও

---

৩৯ তাঁর নাম আবদুর রহমান, লখনৌর অধিবাসী এবং প্রথম খলিফাদের অন্যতম বিলায়েত আলী কর্তৃক নিয়োজিত।

৪০ তাঁর নাম রফিক মণ্ডল।

৪১ ১৮৫২ সালে যখন চতুর্থ দেশীয় বাহিনীকে হাত করার চেষ্টা করা হয় এবং পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট এই মতবাদীদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দেন এবং তারাও বলপূর্বক তাদের সম্বন্ধে আরও তদন্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করে।

তার পক্ষে বিদ্রোহাত্মক করাদি আদায় করা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তখন সে এ-সব ধর্মীয় কর আদায়ের কাজটি পুত্রের হাতে ছেড়ে দেয় [৪২]। এই পুত্রও ন্যস্ত কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যে কর্মচারীটি তার মামলার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁর নিরপেক্ষ ও সত্যিকার গুণাবধারণক্ষম ভাষায় বলা যায়, 'এই সময় থেকে বিচারের দিন পর্যন্ত মানুষ সংগ্রহ করে জিহাদ বাঁচিয়ে রাখতে সে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল'।[৪৩] এ-সব সে নিশ্চিন্ত ভাবে করতো, জিলা-কর্তৃপক্ষের দ্বারা এতটুকু উত্যক্ত না হয়ে। রোমের অগস্তাস সাম্রাজ্যের শাসনকর্তার মতো পাক-ভারতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও শাসিত সম্প্রদায়গুলির ধর্মীয় বিশ্বাস বা কুসংস্কার-সমূহে হস্তক্ষেপ করবার ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক অনিচ্ছা ছিল। এজন্য ধর্মীয় আচারের অন্তরালে রাজবিদ্রোহ বেশ নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু ১৮৬৫ সালের সরকারী মামলায় মালদহ জিলাকেন্দ্র বিদ্রোহের সংগে যে কতোখানি জড়িত ছিল, তা প্রমাণিত হল [৪৪]। এ-সব সাবধানবাণী সত্ত্বেও এই লোকটি সীমান্তের যুদ্ধের জন্যে মানুষ ও টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলো, প্রকাশ্যে গ্রামে গ্রামে যেয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতে লাগলো এবং ১৮৬৮ সালে সে যখন দেখলো যে, নিজের লোকেরা উদারভাবে টাকা-পয়সা দিতে ইতস্ততঃ করছে, তখন নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে পাটনার খলীফাকে আনিয়ে লোকদের উৎসাহ জাগিয়ে তুলবার কাজে প্রবৃত্ত হল। তিনটি পৃথক জিলা জুড়ে তাঁর এলাকা ছিল [৪৫] এবং গঙ্গানদীর মোহনার দিকে উভয় তীরের সমস্ত এলাকায় ও ছোট ছোট দ্বীপেও অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের উপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। সীমান্তের বিদ্রোহী-বসতিতে তাঁর দ্বারা কি সংখ্যক মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিল, কখনো তা সঠিক নির্ণীত হবে না, কিন্তু

৪২ মালদহের মওলভী আমীর উদ্দীন।

৪৩ Report filed with the record of the Maldah Trial of 1870, official papers.

৪৪ মওলভী আহ্‌মদ উল্লাহ্‌র বিচারকালে। তিনি সেসন জজ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হয়। পরে ফাঁসীর হুকুম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে বদল করা হয়েছিল।

৪৫ মালদহ জিলার সমগ্র এলাকা এবং মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জিলার কিছু অংশসহ।

সীমান্তের একটি মাত্র বিদ্রোহী ঘাটিতেই চারশ ত্রিশজন মুজাহিদের মধ্যে শতকরা দশজনের বেশী প্রেরিত হয়েছিল তাঁর দ্বারা।

তাঁর কর আদায়ের পদ্ধতি ছিল সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামগুলিকে তিনি হল্‌কায় ভাগ করে নিতেন। প্রত্যেক হল্‌কায় একজন আদায়কারী থাকতো। সে আবার প্রত্যেক খানায় বা বাড়ীতে কর আদায়ের জন্য প্রতি গ্রামে একজন আদায়কারী নিযুক্ত করতো, তাদের হিসাব পরীক্ষা করতো এবং আদায়কৃত সমস্ত টাকা জিলাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতো। নিয়ম মাফিক প্রত্যেক গ্রামে একজন আদায়কারী থাকতো, কিন্তু জনবহুল গ্রামগুলিতে আরও লোকের দরকার হতো। সেগুলিতে থাকতো একজন ধর্মনেতা[৪৬], যার কাজ ছিল নামাযে ইমামতি করা ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় করা। একজন কর্মকর্তা[৪৭], সে ওহাবীদের দুনিয়াবী কাজকর্ম দেখাশোনা করতো এবং আর একজন কর্মচারী[৪৮] যে মারাত্মক চিঠিপত্র ও বিদ্রোহের জন্য আদায়ী দান চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করতো।

এই দান ছিল চার রকমের। প্রথমটি হলো সারা বছরের হস্তগত সম্পত্তির উপর শতকরা আড়াই টাকা। তাকে বলা হতো 'শরীয়তী দান'[৪৯]। প্রথমাবস্থা থেকেই এই দান বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যয়িত হতো। এই কর অবশ্য নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তির উপর ধরা হতো। পাটনার খলীফা[৫০] সীমান্ত থেকে ফিরে এসে দেখলেন, এই বাবদ আদায়ী টাকার অংক প্রচুর নয়। এজন্য মসজিদে যে-সব সদ্‌কা ও ফিত্‌রা ফরয হিসাবে আদায় হতো এবং পূর্বে কেবল গরীব লোক-দেরকেই বিতরণ করা হতো, সে সব তিনি জিহাদের জন্য গ্রহণ করতে লাগলেন। এভাবে যা ছিলো গরীবের প্রাপ্য, তা তিনি উৎপীড়ন ও বিদ্রোহের কাজে ব্যয় করতে লাগলেন। এ-সব দান ফরয হিসাবে মুসলমানেরা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব উপলক্ষে আদায় দিয়ে থাকে।

৪৬ দ্বীন-কা-সরদার।
৪৭ দুনিয়া কা--সরদার।
৪৮ ডাক-কা-সরদার।
৪৯ যাকাত।
৫০ ইনায়েত আলী।

উপবাস ও আত্মশুদ্ধির মাসের [৫১] শেষে ধর্মীয় আনন্দ-উৎসবের ঘটা হয় [৫২]। তখন মসজিদে নামাযে শরীক হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান মনে করে যে, কিছু অর্থ গরীবকে দান করা কর্তব্য, অন্যথায় সারা মাসের সমস্ত সাধনা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। দানের এই টাকাই [৫৩] পাটনার খলীফা বিদ্রোহের মূলধনে আত্মসাৎ করেছিলেন। তিনি একটা নতুন করেরও প্রবর্তন করেন, যা থেকে অত্যন্ত গরীবেরও রেহাই ছিল না। তিনি নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক গৃহে প্রতিটি লোকের প্রতি বেলার খাবার থেকে একমুঠি চাউল পৃথক করে রেখে দিতে হবে এবং এভাবে সংগৃহীত চাউল গৃহকর্তাকে জুমা নামাজের শেষে গ্রাম্য আদায়কারীর নিকট জমা দিতে হবে। এভাবে গোলাভরা শস্য আদায় হতে লাগলো এবং জিহাদের জন্য প্রকাশ্যে বিক্রয়ও হতে লাগলো। এ-সব আদায় অবশ্য ধর্মীয় কর আদায়কারীরা অধিকার হিসাবে নিম্নতর হারে আদায় করতো। পরিণামদর্শী খলীফা নতুন মতাবলম্বীর উৎসাহ কিংবা বক্তৃতার সময় উত্তেজনার মুখে মানুষের হঠাৎ উদ্বেলিত অনুভূতিকেও কাজে লাগাবার ব্যাপারে যথেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি কর আদায়ের বিনিময়ও প্রবর্তন করেন। সেগুলি উপরোক্ত ন্যায্য আদায়ের উপরেও আদায় করা হতো। নেতৃস্থানীয় আদায়কারীরা বছরে একবার নিজ নিজ এলাকায় বড়ো পরবের সময় প্রত্যেক গ্রামে সফর করতেন এবং প্রত্যেক পরিবার যেন বিগত বারোমাসের দেয় কর সম্পূর্ণভাবে আদায় দেয়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে খোঁজ নিতেন।

টাকা-পয়সা ও মানুষ সংগ্রহ করার জন্য এই ধরনের শক্তিশালী জিলাকেন্দ্র সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। যে হতভাগা লোকটিকে আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছি, সে ছিল বহুর মধ্যে একজন। তার কর্মকেন্দ্র ছিল নিম্ন-বংগ থেকে উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার শাহী সড়কের উপরে এবং এজন্য এটি প্রত্যেক প্রচারক কর্তৃক উচ্চাঞ্চলে কিংবা নিম্নদেশে সফরকালে বিশ্রামস্থান হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। যে দু'জন

৫১ রমযান মাস।

৫২ ঈদ-উল-ফিতর্ বা রমযান-কা-ঈদ।

৫৩ ফিতর।

খলীফা সীমান্তের মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন[৫৪], তারাও তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আর বিদ্রোহী-বসতির বর্তমান নেতাদেরও একজন[৫৫] সফরকালে তার সংগে ছিলেন। পাটনা প্রচার-কেন্দ্রের নেতারা জিলা-কর্তৃপক্ষের সংগে সফরের সময় তার গৃহে মেহ্মানও হতেন। পূর্বে তার শহরটি[৫৬] জিলার সদর থেকে এবং থানা থেকেও দূরে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। ভীষণ তুফানে শহরটি ধ্বংস হয়ে গেলেও এই আন্দোলনের বিস্তৃতির সহায়তাই করেছিল। গঙ্গানদী সামনে ও পিছনে প্রবলবেগে ঘুরপাক খেয়ে দক্ষিণ তীরের সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে ফেলে, তার ফলে ওহাবী বসতির কোনো চিহ্ন থাকে না। বাশিন্দারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ নদীর পূর্ব তীরে নয়া সৃষ্ট চরে আশ্রয় নেয়। বাকী সবাই অন্য ছোট ছোট চরে ঘর বাঁধে; কিন্তু তারা সেখানেই ছোট ছোট বিদ্রোহীদল গড়ে তোলে। নদীর বুকে কোন নতুন চর উঠলেই ওহাবীরা সেটা দখল করে নেয় এবং নতুন পল্লী গড়ে তোলে।

এখন বেশ স্পষ্টতঃ ধারণা করা যেতে পারে যে, এরকম দীর্ঘ-কালস্থায়ী ও বহু বিস্তৃত অসন্তোষ ভারত সরকারের গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। গত সাত বছর ধরে একের পর এক রাজদ্রোহী আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত হচ্ছে। বাস্তবিক সীমান্তে এক একটা ধর্মান্ধ যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাম্রাজ্যে এক একটা করে সরকারী মামলাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জিলা থেকে সমাগত বহু আসামী তাদের একই অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ করছে, না হয় বিচারের অপেক্ষার আছে। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর, একমাস পূর্বে, আরও পাঁচজন আসামী সেসন আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেছে। যাদের ইতিমধ্যে শাস্তি হয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে হলে যারা বিচারের অপেক্ষায় আছে, তাদের বিষয়েও কিছু না বলে এ-আলোচনা

৫৪ এনায়েত আলী ও মকসুদ আলী।

৫৫ ফয়াজ আলী।

৫৬ নারায়ণপুর।

করা শক্ত ব্যাপার। কারণ, তাদের সকলেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ এক সংগে বিজড়িত হয়ে রয়েছে। তবুও পাক-ভারতীয় ইতিহাসে এসব সরকারী মামলার কাহিনী এক অদ্ভুত প্রসংগ এবং সেগুলির পূর্ণ বিবরণী উপযুক্তভাবে বিবেচনা না করে বাংলাদেশের এই ষড়যন্ত্রের শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। এ জন্য আমি এমন একটি মামলার আলোচনা করবো, যেটি সময়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে পুরাতন এবং যে-সব বিচারাধীন হতভাগ্য আসামী এখনও দোষী বলে সাব্যস্ত হয়নি, তাদের কোন রকমে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে সে-সব জিনিসও আমি সযত্নে পরিহার করবো।

১৮৬৪ সালের সরকারী মামলা হচ্ছে ১৮৬৩ সালের মারাত্মক ধর্মান্ধ যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি। বিগত কয়েক বছরের সরকারী মামলার মতো এই মামলায় কোন দেশীয় বাহিনীর দু'চারজন সিপাহীর কিংবা কোনো প্রচারকবিশেষের রাজদ্রোহ সম্বন্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়নি। এবার বহু প্রদেশে শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত এবং উপযুক্তভাবে গুপ্ত ব্যবস্থা ও আত্মরক্ষার উপায় সম্বলিত এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে আম্বালার সেসন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ড্‌স কুড়িদিন শুনানীর পর একটি সরকারী মামলার রায় দেন। ব্রিটিশ রাজ্যে এগারো জন মুসলমান প্রজা এ মামলায় রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল মুসলমান সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক, সবচেয়ে উচ্চ বংশজ একজন আলীম, একজন সেনানিবাসের কন্‌ট্রাক্টর ও কসাই, একজন মহাজন, একজন সিপাহী, একজন ভ্রাম্যমাণ প্রচারক, একজন গৃহভৃত্য ও একজন চাষী। ইংরেজ আইনজ্ঞরা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। আইনের খুঁটিনাটি ও অন্যান্য সূত্র ধরে তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল। ছয় জন ভারতীয়[৫৭] এসেসর জজের সংগে আদালতে বসেছিলেন। বিচারশেষে আট-জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড ও বাকী তিনজনের প্রতি আইনের চরম দণ্ড বা ফাঁসির হুকুম হয়।

বিশাল উত্তর-প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে নানা গোত্রের লোক বাস করে। তাদের গায়ের রঙ নানা ধরনের এবং ভাষাও বিভিন্ন। তার দরুন

৫৭ বলা বাহুল্য, ছয়জনই ছিলেন হিন্দু (অ)।

লণ্ডন শহরে একজন ইতালীয় সহজেই একজন ইংরেজ হিসাবে আত্ম-পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হলেও একজন বাঙালীকে পাঞ্জাবী বা পেশোয়ারী হিসাবে ভুল করা একেবারে অসম্ভব। ১৮৫৮ সালের সীমান্ত-যুদ্ধের পর আমাদের কর্মচারীরা লক্ষ্য করলো, নিহত দুশমনদের মধ্যে এমন অনেক রয়েছে, যাদের গায়ের রঙ নির্ভুলভাবে কালো ও তামাটে, যা একমাত্র নিম্নবংগের জলাভূমি-আকীর্ণ বাষ্পময় আবহাওয়ার মধ্যেই সম্ভব। এই সূত্র ধরে তখন অবশ্য কোন তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের শেষে অস্থায়ী অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা কমানো হয় এবং অনেক উপযুক্ত লোককে ঘোড়সওয়ার পুলিশ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান[৫৮] আম্বালার নিকটবর্তী একটি জিলায়[৫৯] সার্জেন্টের পদে উন্নীত হয়। ১৮৬৩ সালের মে মাসের প্রাতে সে যখন টহল দিচ্ছিল, তখন সে লক্ষ্য করলো যে, চারজন বিদেশী উত্তরমুখী শাহী সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে। তাদের বেঁটে গঠন, গায়ের ময়লা রঙ এবং চুরুক দাড়ি দেখে তখনই এই সিপাহীর স্মরণ হলো যে, ১৮৫৮ সালের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বাঙালী রাজদ্রোহী-দেরকেও সে এই চেহারাতেই দেখেছে। সে তাদের সংগে আলাপ জুড়ে দিল এবং গোপনে জেনে ফেললো যে, তারা মুল্‌কা থেকে প্রত্যাগত বাঙালী প্রচারক, দেশে ফিরে যাচ্ছে নতুন মানুষ ও টাকা-পয়সা চালান দিতে।

লম্বা পাঞ্জাবীটি তখন রাজদ্রোহী বাঙালী চার জনকে গ্রেফতার করলো। তারা মুসলমান ভাই হিসাবে অনেক কাকুতি-মিনতি জানালো, সে যা ঘুষ চাইবে, তাই দিতে স্বীকৃতি জানিয়ে বল্‌লো যে, স্থানীয় থানেশ্বর শহরের বাজারের মহাজন জাফর খাঁ সব টাকাটাই নগদ দিয়ে দেবে। কিন্তু পুরানো সিপাইটি ছিল নিমক-হালাল। সে তখনই তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট চালান দিল। যদি ম্যাজিস্ট্রেট তখনই তাদেরকে বিচারার্থে সোপর্দ করতেন, তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, সংগে সংগে সমস্ত ষড়যন্ত্রটা আবিষ্কৃত হয়ে যেতো এবং তাহলে মুজাহিদ বাহিনী

৫৮ তার নাম গুজন খাঁ।

৫৯ কর্ণাল জিলা।

আমাদের টহলদারী সৈন্যকে আক্রমণ করতে সাহসী হতো না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বেঁচে যেতো। তখন সাম্রাজ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করছিল। থানেশ্বর একটি আভ্যন্তরীণ ছোট জিলা। একে তো রাজদ্রোহের অপরাধের সংখ্যা খুবই কম, তদুপরি টাকা-পয়সা আদায়ের জন্য মিথ্যা অজুহাতে চালান দেওয়ার প্রবণতাও ভারতীয় পুলিশের মধ্যে খুব বেশী। এজন্য এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই চার জন নিরীহ ধরনের মুসাফিরকে বিচারার্থে সোপর্দ করতে অস্বীকার করে শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে যা প্রকৃত বিচার বলে গণ্য হত, সে-অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন। কিন্তু এবার যা ঘটলো, তা নিরানব্বইর পরে একশো নম্বরের ঘটনা।

ঘোড়সওয়ার সৈন্যটি আসামীদেরকে খালাস দেওয়ায় অপমান বোধ করলো। তার রিপোর্টে সন্দেহ করা হয়েছে, এটাই তার পাঞ্জাবী মানসে আঘাত দিলো। কারণ, তখনও তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একটা অজানা বিপদ ঘনিয়ে আসছে, যার ফলে আমাদের সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে পারে।

সে তখন এমন একটা পন্থা অবলম্বন করলো, যার সংগে স্পার্টার দৃঢ়তার প্রচলিত কাহিনী কিংবা রোম-ইতিহাসে বর্ণিত বিশ্বস্ততার আশ্চর্য কাহিনীরও তুলনা হয় না। সে ছুটি না নিয়ে চলে গেলে তা চাকরি ত্যাগ করারই শামিল হত। কিন্তু সুদূর উত্তরাঞ্চলে তার একমাত্র পুত্র ছিল, যাকে তার পারিবারিক সম্মানকে বাদ দিলে সে দুনিয়ার অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালবাসতো। তার জন্মগ্রাম ও সীমান্তের মধ্যে আমাদের বহু ঘাটি ছিল এবং সবসময়েই সেগুলি লুণ্ঠনকারীদের কিংবা পলাতক বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকতো। সীমান্তের ওদিকে জিহাদী বসতি এবং বসতিবাসীরা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এজন্য উক্ত ঘাটিগুলি আমাদের সাম্রাজ্য থেকে নিয়মিতভাবে তাদের জন্যেই চালান না-দেওয়া যে-কোন অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহগ্রস্ত হয়েছিলো। এক্ষেত্রে সিপাহী-পিতা ভালোভাবেই জানতো যে, তার পুত্র যদি বিদ্রোহের বেশে জিহাদী বসতিতে যোগ দিতে গিয়ে আমাদের ঘাটীগুলি থেকে রেহাইও পেয়ে যায়, তাহলেও গুপ্তচর হিসাবে ওহাবীদের হাতে

ফাস দড়িতে তার মৃত্যু অবধারিত। তবুও পিতা পারিবারিক সম্মানের দোহাই দিয়ে পুত্রকে আদেশ করলো মুল্‌কায় যেতে এবং তাকে বলে পাঠালো যে, আমাদের সাম্রাজ্যের বুকে বসে যে-সব ষড়যন্ত্রকারী বাইরের সীমান্তে সাহায্য পাঠাচ্ছে তাদের নামগুলি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত সে যেন সেখান থেকে ফিরে না আসে।

পুত্র যথাসময়ে চিঠি পেলো ও পরদিনই গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হলো। কি পরিমাণ তার দুঃখভোগ হয়েছিল এবং কিভাবে সে অতি অল্পের জন্য ফিরে এসেছিল, সে কাহিনী তার পরিবার ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণে জানা গিয়েছিল যে, সে ওহাবীদের চক্ষে একেবারে ধূলা দিয়ে সিত্তানার বসতিতে তাদের সংগে মিশেছিল। তারপর ফিরে আসার সময় আমাদের ঘাটিগুলিও নির্বিঘ্নে পার হয়ে, বামে ও ডাইনে এতোটুকু ইতস্ততঃ না করে, শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে পথশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও রোগগ্রস্ত হয়ে এক সন্ধ্যায় সোজা পিতার কুটিরপ্রান্তে হাজির হয়। পুত্র পিতাকে এই গোপন সংবাদ দেয়ঃ 'লোকে যাকে খলীফা বলে, থানেশ্বরবাসী মুন্‌শী জাফরই সেই ব্যক্তি, যিনি বাঙালীদেরকে ছোট ছোট বন্দুক ও রাইফেল দিয়ে চালান দিতেন। সেদিন সার্জেন্টটি মুসাফির চার জনকে ছেড়ে দিলে থানেশ্বর বাজারের যে মহাজন তখনই ঘুষের সব টাকা দিয়ে দিতেন, তিনি এই জাফর খাঁ-ই।'

কঠোর পাঞ্জাবী পিতার এই হৃদয়গ্রাহী ছবির চেয়ে বিশ্বস্ততার উৎকৃষ্টতর নজীর আমার জানা নেই। নিশ্চুপ হয়ে গর্বিত ভংগীতে সে ঘোড়ার পিঠে দৈনন্দিন টহলদারীর কাজ করে যাচ্ছে। সব সময় মনে তার এই ভাবনা যে, তার কথা অবিশ্বাস করা হয়েছে। এভাবে মাসের পর মাস কেটে যায়, আর সে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে, তার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটছে। নিজের সম্মান বাঁচাতে এবং যে সব বিদেশী প্রভু তাকে সন্দেহ করেছে তাদের রক্ষা করতে সে তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে। এরূপ অপূর্ব প্রতিশোধস্পৃহার নিকট আমাদের অতিসাবধানী ইংরেজসুলভ কর্তব্যবুদ্ধির অনুতপ্ত হয়ে মাথার টুপি খুলে সম্মান দেখানো উচিত। অবশ্য এ কথা স্মরণ করে আনন্দ হয় যে, ভারত সরকার সময়ে সময়ে মারাত্মক ভুল করলেও তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে কখনও ভুলে যায় না।

থানেশ্বর শহরের বাজারের মহাজন জাফরের ব্যক্তিগত কাহিনী অতীব বিচিত্র। অতি সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে চরিত্রবলে তিনি নিজ শহরের লমবরদারের[৬০] মর্যাদায় উন্নীত হন। একদা তিনি এক সফরকারী ওহাবীর বক্তৃতা শুনতে থমকে দাঁড়ান। তাঁর বক্তৃতায় সহসা এই ধনী নাগরিকের ধর্মজ্ঞান প্রবল হয়ে ওঠে। মসজিদে যে-সব দুর্নীতি চলে, সে বিষয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেন এবং জন বানিয়ানের মতো গভীর ধর্মীয় সাধনার পর তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে ওহাবী বলে প্রচার করেন। তারপর থেকেই তিনি কায়মনোবাক্যে ধর্মীয় সংস্কারে অগ্রসর হন।

এই নয়া দীক্ষিত জাফর আত্মবিশ্লেষণে বহু সময় ব্যয় করতে লাগলেন এবং সাধনক্ষেত্রে আপন আত্মার সঙ্গেও তিনি বোঝাপড়া করতে লাগলেন কঠোরভাবে। তিনি নিজের ধর্মোপলব্ধির একটা বিবরণীও লিখতে শুরু করেছিলেন 'জাফরের উপদেশ' শিরোনামা দিয়ে। সেটি একটি সরকারী মামলায় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক দলীল হয়েছিল।

"আমি এই গ্রন্থ লিখতে শুরু করছি মঙ্গলবার, ১৮ই জিলহজ, ১২৭৮ হিজরীতে[৬১]। এর খতম হওয়া আল্লাহ্‌র মর্জি। আমি কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলিনি, শুধু দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত যে-সব ঘটনার সংগে নিজে জড়িয়ে পড়েছি, সেইসব ঘটনা উল্লেখ করেছি। আমি এই কথাই বলতে চাই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। মানুষ, জ্বীন, ফেরেশ্‌তাহ্‌, পশু, বৃক্ষলতা, যা কিছুই দুনিয়ায় জন্মায়, সবই সময়-কালে নাশ হয়ে যায়। আমার নিজের কথা হলো এই: দশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিনি। পিতার মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল দশ কি বারো এবং ছোট ভাই ছিল মাত্র ছ'মাসের। আমার মায়ের অভিভাবকত্বে আমরা মানুষ হই। মায়ের কোনো বিদ্যাশিক্ষা ছিল না, ধর্মশিক্ষাও ছিল না। ছেলেবেলায় আমি লেখাপড়ার কথা ভাবিনি, কেবল ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতুম। আমার একটু জ্ঞান হলেই পড়াশুনা আরম্ভ করি।

---

৬০ লমবরদার অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের রাজস্ব আদায় বিষয়ক প্রতিনিধি।

৬১ জুন, ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ।

"১৮৫৬ সালে আমি আর্যি-লেখকদের সংগে যোগ দেই। কিছু কালের মধ্যেই উকিলরা ও আর্যি-লেখকরা নিয়ম ও আইন-কানুন সম্বন্ধে আমার উপদেশ নিতে থাকে। এ সবে আমার জ্ঞান হয়ে ওঠে সবার চাইতে বেশী।" আর্যি-লেখকরা ছিল মামলার এক রকম ক্ষুদে তদ্‌বীরকার। তারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফরিয়াদীদের আর্যি লিখে দিতো এবং ছয় আনা থেকে দেড় টাকা মজুরী পেতো। জাফরের পশার ছিল খুব। কিন্তু বিধর্মীদের আদালতে এভাবে পয়সা রোজগার তার মনঃপূত ছিল না। "বরং এই পেশায় আমার ধর্মজ্ঞানে ক্ষতি হতো। এ রকম পেশা চালানো কখনই ভাল নয়। আমি যদি একাজ না করতুম, তাহলে আমার ঈমান আরও তাজা থাকতো। কিন্তু আমার পেশা আমার ধর্মকর্মের ক্ষতিই করেছে, আমার ধর্মানুরাগে নিরানন্দ এনে দিয়েছে। যখন কোর্টের কাজ ছেড়ে ছুটি পেতুম, তখন দু'একদিনের জন্য হলেও মনটা ভাল থাকতো। বিধর্মীদের সংগে মুসলমান কর্মচারীদের মেলামেশাতেও আমার ঘৃণা হতো, আমার মন বিষাক্ত হয়ে উঠতো।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আইন-ব্যবসায়ে জাফরের পশার বেড়ে ওঠে এবং নিকটবর্তী বহু বিখ্যাত জমিদার তাঁকে পারিবারিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত রাখে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং দুনিয়াবী সাফল্যকে কখনো তিনি ধর্মজ্ঞানের উর্ধ্বে তোলেননি। তাঁর সংস্পর্শে যে কেউ আসতো, সে-ই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তো। হযরত মুহম্মদের মতো তিনি নিজ গৃহেই প্রথম দীক্ষা দান করেন। তাঁর একজন কেরানী চরম বিপর্যয়ের দিনেও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং আম্বালার সেসন জজের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় তাঁর পাশেই একই মতের সহযোগী হিসাবে দণ্ডায়মান ছিল।

১৮৫৭ সালের 'মিউটিনি' আরম্ভ হলে জাফর বারো জন অতি বিশ্বাসী অনুগামী নিয়ে সীমান্তের বিদ্রোহী বসতিতে উপস্থিত হন। অনভ্যস্ত যুদ্ধকালেও তাঁর চরিত্রবল ফুটে ওঠে এবং বিদ্রোহাত্মক সকল গোপন তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য কর্মী হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের সকল আশা-ভরসা নির্মূল হলে তিনি থানেশ্বরে ফিরে আসেন ও পুনরায় আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় প্রায়ই

তিনি আল্লাহ্‌র সেই অমোঘ বিধানের কথা চিন্তা করতেন, যার দরুন বিধর্মীরাও জয়ী হয়ে গেল এবং সেই সংগে চিন্তা করতেন নিজের অবাঞ্ছিত পেশা সম্বন্ধে, যা তাঁর ভাষায় ছিল, 'আর্যি-লেখা সবচেয়ে নোংরা কাজ।' প্রকাশ্যে শক্তিপ্রয়োগ তো নিষ্ফল হয়ে গেল, অতঃপর ষড়যন্ত্রের দ্বারা কি সম্ভব হয় দেখা যেতে পারে। জাফর শীঘ্রই বহুদূর বিস্তৃত ওহাবী আন্দোলনের একজন সভ্য হলেন। তাঁর ঘৃণিত পেশা সত্ত্বেও তাঁর গোপন ক্রিয়াকলাপের জন্য তিনি যেন ধর্মীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হলেন; কারণ এই সময়ে তিনি লিখেছেন—'সকলেই জানুক, আমি এ-সব পালন করে যাচ্ছি এক মহান ব্যক্তির নির্দেশে এবং এক গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে।'[৬২]

এই 'মহান ব্যক্তি' ছিলেন পাটনার মওলবী ইয়াহ্‌য়িয়া আলী, পাক-ভারতীয় ওহাবীদের ধর্মীয় অধিকর্তা। আর গোপন উদ্দেশ্যটা ছিল মহাবনে অবস্থিত ওহাবী বসতিতে নতুন মুজাহিদ ও যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠানো, কারণ বৃটিশরাজের সংগে তখন তাদের প্রকাশ্যে সংঘর্ষ চলছিল।

পাটনা প্রচার-কেন্দ্র সম্বন্ধে, যার নেতা তখন ছিলেন ইয়াহ্‌য়িয়া আলী, আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। ১৮৬৪ সালের মামলার পূর্বে স্থানটি সারা পাক-ভারতে এই সম্প্রদায়ের খানকাহ্ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। সাদিকপুর লেনের বাম দিকে বাড়ীগুলি অবস্থিত ছিল, সামনে ছিল অনেকখানি খোলা জায়গা। বাড়ীগুলির বহির্ভাগ অত্যন্ত নিরানন্দ ও জীর্ণ অবস্থায় ছিল। ভারতীয় ইট ও চুন-বালির তৈরী এ বাড়ীগুলি একটা বর্ষার বৃষ্টিতে ধৌত হলেই এরকম দশাপ্রাপ্ত হয়, আর এজন্য প্রাচ্যদেশীয় জাঁকজমক সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণায় এগুলি বড়ো মলিন দেখায়। বাড়ীগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘরটি ছিল একটি অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের মসজিদ। এখানে দিনের প্রতি ওয়াক্তের

---

৬২ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ শাস্তিদানকালে জাফরের চরিত্র এভাবে অংকিত করেছেন: এই আসামীর তীব্র শত্রুতা, বিদ্রোহাত্মক কর্ম ও অপকর্মে বাহাদুরীর তুলনা নেই। সে শিক্ষিত ও নিজ গ্রামের সরদারও ছিল। তার অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো লঘুকরণ অবস্থাও নেই। Record of the Ambala State Trial in 1864; official papers.

নামায পড়া হতো এবং প্রতি শুক্রবারে একটা খুত্‌বা দেওয়া হতো। শুক্রবারের এই খুত্‌বা বা বক্তৃতা ছিল উগ্র ধরনের—তাতে কাফেরদের সংগে জিহাদের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হতো। তবে শ্রোতাদেরকে সাবধানও করে দেওয়া হতো যে, ঈমান ব্যতীত কাজের কোনো মূল্য নেই। তাদের ধর্মীয় জীবনে সমূহ বিপদের উপস্থিতি সম্পর্কেও তাদের সতর্ক করা হতো। এ ছাড়া, এ খুত্‌বায় আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের প্রতিও বিশেষ তাগিদ দেওয়া হতো। তাতে তুলনামূলক আলোচনা থাকতো হযরত মুহম্মদের সহজ-সরল ইবাদতের ধারার সংগে বর্তমান জটিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নানারকম ভাঁড়ামি, যথাতথা সিজদাহ্ ও জানু দ্বারা মসজিদ স্পর্শ করার পদ্ধতি প্রভৃতির। আরও থাকতো তাদের জন্য তীব্র নিন্দা, যারা ওহাবী জিহাদ বা হিজরত গ্রহণ করতো না।

সাধারণভাবে বলা যায়, খুত্‌বাগুলিতে এতো উচ্চস্তরের ধর্মীয় জীবন যাপনের শিক্ষা থাকতো, যা সাধারণ বুদ্ধির মানুষের সাধ্যের অতীত। আর এজন্য শ্রোতারা মনের মধ্যে স্থায়ী স্মৃতি হিসাবে একটা তীব্র অস্বস্তিকর ভাবের বোঝা নিয়ে যেতো। তবে শহরের অন্যান্য মসজিদের প্রচারকরা, সাদিকপুর লেনের প্রচারকদের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা স্বীকার করলেও, তাঁদেরকে শরীয়তের অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদী হিসাবে তীব্র নিন্দা করতো।

প্রধান খলীফা ও খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলী পাটনা প্রচার-কেন্দ্র দৃঢ় অথচ শান্তভাবে চালনা করতেন। নিম্নবংগের জিলাগুলি থেকে যে-সব নও-মুজাহিদকে সফরকারী প্রচারকরা চালান দিতো, তাদেরকে হৃদ্যতার সংগে খানকায় গ্রহণ করা হতো। তাদের মধ্যে যারা আশাপ্রদ, তাদেরকে তিনি প্রচারক হিসাবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে নিজে শিক্ষা দিতেন, আর যাদেরকে বিদ্রোহী-বসতিতে শীঘ্রই পাঠানো দরকার হতো, তাদেরকে ছেড়ে দিতেন একজন সাধারণ ভাইয়ের হেফাযতে। সে তাদেরকে জিহাদের উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলতো, ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে তাদেরকে মাথা ঘামাতে দিত না। এই সাধারণ ভাইটি[৬৩] ছিল প্রচারকেন্দ্রের

৬৩ আবদুল গফ্‌ফার।

খাজাঞ্চি ও খুবই কাজের লোক। কবি চসার বর্ণিত 'শান্তভৃত্যের' চেয়ে সে কম ধুরন্ধর ছিল না এবং একাই সে খানকার সাংসারিক কাজকর্ম নির্বাহ করতো, নও-মুজাহিদদের কাছে জিহাদের মহান কর্তব্য সম্বন্ধে দৈনিক উগ্র বক্তৃতা দিতো এবং খতিব সাহেব অন্য বিষয়কর্মে ব্যস্ত থাকলে মাঝে মাঝে ছাত্রদের ধর্মতাত্ত্বিকতা সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতো। তবে সে যা করতো, আন্তরিকতা নিয়েই করতো। আর সর্বশেষে সে নিজের খতিবের পাশে আম্বালার কাঠগড়ায় নিঃশংকচিত্তেই দাঁড়িয়েছিল।

খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর বহু কর্তব্য ছিল। পাক-ভারতীয় ওহাবীদের ধর্মীয় অধিকর্তা হিসাবে তাঁকে সমস্ত সফরকারী প্রচারকের সংগে পত্রালাপ করতে হতো। তিনি নিজেই একটা কঠিন সাংকেতিক ভাষার উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন, যার দরুন অজস্রভাবে টাকা-পয়সা সাম্রাজ্যের অন্তস্তল থেকে সীমান্তের বিদ্রোহী-বসতিতে নির্বিঘ্নে চালান দেওয়া হতো। তিনি মসজিদের নামাযে ইমামতি করতেন। মুজাহিদদের জন্য তিনি যেমন প্রত্যেকটি রাইফেল পরীক্ষা করতেন, সেই রকম ছাত্রদের উদ্দেশে ধর্মতাত্ত্বিকতার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং নিজেও গভীর অধ্যয়ন করে আরবী পণ্ডিতদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রকারীদের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল নও-মুজাহিদদেরকে পাটনা প্রচার-কেন্দ্রে অর্থাৎ তাদের সাংকেতিক ভাষায়, ছোট কারখানা থেকে সীমান্তের বিদ্রোহী-বসতি অর্থাৎ বড় কারখানায় চালান দেওয়া। বাঙালী মুজাহিদকে সফরকালে রাস্তায় হাজারো বিশ্রী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলির ভেতর দিয়ে তাকে প্রায় দু'হাজার মাইল অতিক্রম করতে হতো এবং তখন তার দৈহিক আকৃতি ও ভাষা তাকে প্রত্যেক গ্রামেই বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করতো। এই কঠিন কাজেও ইয়াহ্‌য়িয়ার পরিচালন-প্রতিভার চরম বিকাশ হয়েছিল। এই সমগ্র গমনপথে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত খানকাহ্‌শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং প্রত্যেকটিকে একজন বিশ্বস্ত শিষ্যের কর্তৃত্বাধীনে দিলেন। 'এভাবে তিনি সুদীর্ঘ উত্তরপথ কতকগুলি সুবিধাজনক অংশে ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহীরা যখন অজানা প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে নিরাপদে বিচরণ করতো, তখন তাদের পূর্ণ আশ্বাস থাকতো যে, প্রত্যেক মঞ্জিলের

বন্ধুজন তাদের আগমনের অপেক্ষায় আছে। পথিপার্শ্বের খানকাহ্‌গুলির রক্ষকরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক, কিন্তু সকলেরই এক লক্ষ্য ছিল, তা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন। এরা প্রত্যেকেই ছিল স্থানীয় ষড়যন্ত্র-সমিতির কর্তাব্যক্তি। এ সব লোক নির্বাচনে তিনি মানব-চরিত্র-জ্ঞানের প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছিলেন; কারণ ধরা পড়ার ভীতি কিংবা পুরস্কারের প্রলোভন তাদের একজনকেও নেতার বিপদমুহূর্তে বিপক্ষে টানতে পারেনি।'

সবার উপরে ইয়াহ্‌য়িয়া আলী ছিলেন সদ্‌বংশজাত। তিনি পাটনার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সংগে সদ্ভাব রেখেই চলতেন। তাঁর পরিবারের একজন আমাদের সরকারের একটা অবৈতনিক পদে বহাল ছিলেন, অথচ আর একজন আমাদের সীমান্তের বিদ্রোহী দলকে অভিযানে পরিচালনা করতেন। স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় এই ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম দান করেন, পূর্বে কখনো সেরূপ ভাষা আদালতে আর উচ্চারিত হয়নি।

তিনি বলেছিলেন: 'এই আসামী ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মামলায় যে বৃহৎ রাজদ্রোহের তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তিনিই ছিলেন তার মূল। তিনি ছিলেন ধর্মীয় প্রচারক এবং তিনি তাঁর পাটনার মসজিদ থেকে ভাবগম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে জিহাদের ঘৃণার্হ মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি টাকা-পয়সা সংগ্রহ এবং জিহাদের বাণী (কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) প্রচারের জন্য বহু নায়েব নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শত-সহস্র প্রদেশবাসীকে রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহে বিপথগামী করেছিলেন। তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ ভারতের সরকারকে একটা সীমান্ত-যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং তার দরুন শত শত লোক নিহত হয়েছে। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, এজন্য অজ্ঞতার অজুহাত তাঁর পক্ষে খাটে না। তিনি যা কিছু করেছেন, সবই পূর্বে ভেবে-চিন্তে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সুতীব্র রাজদ্রোহ হিসাবেই করেছেন। তিনি উত্তরাধিকারক্রমে একটা ধর্মান্ধ রাজদ্রোহীর বংশজাত। তিনি ধর্মীয় সংস্কারকের মর্যাদা দাবী করেন, কিন্তু বাংলা দেশে তাঁর হিন্দু স্বদেশবাসীদের মতো যুক্তি ও বিবেকের কাছে আহ্বান না জানিয়ে তিনি সরাসরি রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মাধ্যমে মনোবাঞ্ছা সফল করতে চেয়েছেন। আর এজন্য সরকারের বিরুদ্ধে উন্মত্তের মতো

ষড়যন্ত্র করেছেন, অথচ সম্ভবতঃ এই সরকারই ভারতীয় মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং নিঃসন্দেহে ধর্মীয় স্বাধীনতা আনয়ন করেছেন।'

মহাজন জাফর ও খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলী ১৮৬৪ সালের মামলায় জড়িত আসামীদের মধ্যে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের দুই ধর্মীয় নেতা হিসাবে প্রথম স্থান দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিভাও নিষ্প্রভ হয়ে যায় দিল্লীর কসাই ও পাঞ্জাবের বৃটিশ বাহিনীর মাংস সরবরাহকারী মুহম্মদ শফীর নিকট। এই লোকটি উত্তর-ভারতের এক বড়ো ব্যবসায়ী বংশজাত। ভারত সরকারের সংগে তার পরিবারের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে হলে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলের যুদ্ধ-বিগ্রহে ফিরে যেতে হয়। মুহম্মদ শফীর প্রপিতামহ ও পিতামহ ছিল সামান্য মেষপালক। কিন্তু কিছুটা ফটকাবাজী এবং কিছুটা মিতব্যয়িতা করে তারা সাংসারিক অবস্থার খুবই উন্নতি করেছিল। তখনকার যুগই ছিল ভাগ্যকে গড়ে তোলার—ভাগ্যকে ধরে রাখবার নয়। যুদ্ধকালীন দানই ছিল চালু এবং সৈন্যবাহিনীকে হামেশা চলাফেরা করতে হতো বলে আমাদের কমিসরিয়ট বা রসদ-বিভাগকে উত্তর-ভারতের পশু সরবরাহকারীদের সংগে পরিচিত হতে হতো। সম্ভবতঃ এই রাজদ্রোহীর পূর্ব-পুরুষদের ভাগ্যোদয় হয়েছিল ১৭৬৯ সালের মন্বন্তরে[৬৪] যখন ইংলণ্ডবাসীরা সর্বপ্রথম পাক-ভারতের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়। সেই শতকের শেষের দশকগুলিতে আমি দেখতে পাই যে, শফীর পিতামহ একটা দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে এবং কমিসরিয়ট সম্পর্কিত কর্মচারীদের পরম সন্তোষের সংগে বড়ো বড়ো ঠিকেদারী কাজ করছে। শফীর পিতাও এ-সব ব্যবসায় বেশ ফলাও করে তুলেছিলো। ছোট ছোট মেষপালকদের আগাম দাদন দিয়েও তার হাতে যথেষ্ট টাকা থাকতো এবং এ-সব টাকা সে চড়া সুদে কর্জ দিতো মোটা রকম বন্ধক রেখে। এভাবে তার পুত্র অগাধ টাকার মালিক হয়। কিন্তু ভারতীয় মনোভাবের অনুসারী হয়ে সে পৈতৃক ব্যবসায় চালাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বিরাট মহাজন ও কসাই

---

৬৪ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (বাংলা ১১৭৬ সালের) হিসাবে বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদ বাক্যে পরিণত (অ)।

হিসাবেই সে তার দুষ্কর্ম চালিয়ে যায় এবং সেই দুষ্কর্মের প্রতিফল স্বরূপ-ই শেষে তাকে আম্বালার কারাগৃহে ফাঁসির হুকুম পাওয়া আসামীর কুঠুরীতে অবস্থান করতে হয়।

খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলী ছিলেন ষড়যন্ত্রের মাথা, আর এই লোকটি ছিল তার দক্ষিণ হস্ত।

হিন্দুস্থানে বড়ো বড়ো প্রত্যেক শহরে তার এজেন্সী ছিল এবং সুদীর্ঘ উত্তর-পথের উপর অবস্থিত সাতটি প্রধান বৃটিশ ক্যান্টনমেন্ট বা সেনানিবাসে মাংস সরবরাহের তার ঠিকেদারী ছিল। রক্তের সম্বন্ধে কিংবা ব্যবসায়ের দরুন পাঞ্জাবের ঘরানা ব্যবসায়ীদের সংগে তার সম্পর্ক ছিল। উত্তর-ভারতে দিন দিন তার অনুগ্রহজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ব্যবসায়ের দরুন সীমান্তের ওদিকের বহু মেষপালক-গোত্রের সংগে তার নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বছরে বছরে সে লক্ষ লক্ষ টাকা বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে আদায় করতো এবং কারবারের দিক দিয়ে সে হুকুমবরদারের মতোই সময়নিষ্ঠ ও আজ্ঞাবহ ছিল। এভাবে সে কমিসরিয়ট-কর্মচারীদের চক্ষে এমনই ধূলা দিয়ে কারবার করতো যে, মহারানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পরেও সে সেনাবাহিনীকে মাংস সরবরাহের ঠিকেদারী কাজে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল।

এভাবে আমাদেরই ভৃত্য হিসাবে যে বহুধা-বিস্তৃত নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি সে লাভ করেছিল, তা-ই সে প্রয়োগ করলো আমাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। সে ছিল এই ষড়যন্ত্রের পোদ্দার। সে-ই বিদ্রোহী বসতির সাহায্য ও পুষ্টির জন্য কৌশলের সংগে টাকা-পয়সা পাঠাবার ফন্দি-ফিকির করতো। অথচ এ-সব টাকা সরকারই তাকে সেনাবাহিনীর ঠিকেদার হিসাবে আদায় দিত। তার মধ্যে কোনো ধর্মীয় উৎসাহের স্থান ছিল না। কোনো নির্বোধ ধর্মান্ধতাও তাকে অবিবেচনার পথে চালায়নি। কোনো সাধুসন্তসুলভ আত্মোৎসর্গের অপবাদও তার ছিল না। সে বরাবরই ছিল একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী, হীন ষড়যন্ত্রকারী এবং ইচ্ছা করেই সে এই দুরূহ বিপজ্জনক কারবারে জড়িত ছিল শুধু সমানুপাতে উচ্চ মুনাফার লোভে। তার ভরসা ছিল যে, পথ বিপদসংকুল হলেও তার বুদ্ধিবৃত্তি ও উচ্চাবস্থা তাকে সব বিপদ কাটিয়ে সঠিক পথে চালান করবে।

মহাজন জাফর ও খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলী কোন রাজভক্তির ছল করেননি। তাঁরা আমাদের নিকট থেকে কিছু প্রত্যাশাও করেননি। অকপট ধর্মভীরু মানুষ হয়েও তাঁরা নিজেরদেরকে বিষাক্ত অস্ত্রে বিদ্ধ করেছিলেন—আর সে-সব পেয়েছিলেন একটা মিথ্যা ধর্মীয় ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে। এখন লারটেস (Laertes)-এর মতোই তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য দিলেন। ইতিহাস তাদের ভাগ্যের কথা প্রায় করুণার সংগে আলোচনা করতে পারে, কিন্তু মুহম্মদ শফী সম্পর্কে এরূপ কোন মনোভাব আশা করা যায় না। সে আমাদের হাত চাটতো কামড় দেবার মতলব নিয়ে। সে ষড়যন্ত্রকারী সহযোগীদের নিকট থেকে সুদ নিত এবং মোটা অংকের লাভের বিনিময়ে বিপজ্জনক হলেও জামানতের কারবার চালাতো। ১৮৬৪ সালের সরকারী মামলায় আম্বালার কাঠগড়ায় হাজির অন্যান্য ধর্মভীরু ও ক্ষুদে রাজদ্রোহীর তুলনায় সে ছিল অনেক বড়ো। সে ছিল সিসেরোর বক্তৃতাবলীতে বর্ণিত রোমান প্রজাতন্ত্রের পতনকালীন মহাপাষণ্ডদের সমগোত্রীয়। সে ছিল ওপিয়ানিকাশ (Oppianicus)-এর হৃদয়হীনতা ও লেন্টুলাস (Lentulus)-এর বিচক্ষণতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ। মানোয়ারী জাহাজ চোখে পড়তেই জলদস্যুদের সংগ ত্যাগ না করাই হয়েছিলো তার চালের একমাত্র মারাত্মক ভুল।

আম্বালার কোর্টে দিনের পর দিন যে-সব রাজদ্রোহী বিচারার্থে দাঁড়িয়ে থাকতো, তাদের মধ্যে চার জন প্রধান ব্যক্তির[৬৫] সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। বাকী আট জন সম্বন্ধে বিচারকারী জজ শাস্তিদানকালে তাদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাই উদ্ধৃত করলে যথেষ্ট হবে :

আসামী রহিমের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার গৃহেই এ-সব ষড়যন্ত্র পাকানো হতো। তার ঘরেই বাঙালী মুজাহিদরা জমায়েত হতো ও আশ্রয় নিতো। তার ভৃত্যই ষড়যন্ত্রের তহবিলদারী করতো,

---

৬৫ পাটনা প্রচারকেন্দ্রের খতিব ইয়াহ্‌য়িয়া আলী ও খাজাঞ্চি আবদল গফ্‌ফার; থানেশ্বরের মহাজন জাফর, যে নও-মুজাহিদগণকে পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে চালান দিতে এবং ব্রিটিশ বাহিনীর মাংস সরবরাহকারী মুহম্মদ শফী—যে চক্রান্তকারীদের টাকা-পয়সা চালান করতো এবং সেনাবাহিনীর সরকারী ঠিকেদার হওয়ার সুযোগ নিয়ে সেনা-চলাচলের খবরাখবর ফাঁস করে দিত।

নও-মুজাহিদের খাবার যোগাতো এবং আদায়ী টাকা-পয়সা বিদ্রোহী বসতির ওহাবীদের নিকট চালান দিত। আর তারই ভগ্নিপতি ইয়াহ্‌য়িয়া আলী তাঁর অন্দরমহলে ষড়যন্ত্রের বক্তৃতা দিত। সামর্থের দিক দিয়ে সে ছিল ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং সে ততো মশহুর হয়েও ওঠেনি। কিন্তু সে যথাসাধ্য সরকারের বিরুদ্ধতাই করেছে।

আসামী ইলাহী বখশের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার হাত দিয়েই পাটনা কেন্দ্রের মওলবীরা সংগৃহীত টাকা-পয়সা মুল্‌কা ও সিত্তানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য থানেশ্বরে জাফরের নিকট চালান করতো।

আসামী পাটনার হুসাইনীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে ইলাহী বখশের চাকর ছিল। ষড়যন্ত্রের টাকা-পয়সা চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাকে বহাল করা হয়েছিল। ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর নির্দেশে আবদুল গফ্‌ফারের নিকট প্রাপ্ত বহু সোনার মোহর তার নিকট ছিল এবং সেগুলিকে একখানা কুর্তার ভিতরে লুকিয়ে সেলাই করে সে পাটনা থেকে দিল্লীতে আসামী জাফরের নিকট বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, মনি-অর্ডারযোগে প্রাপ্ত ছয় হাজার টাকা সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং এ-সব কাজ যে রাজদ্রোহাত্মক, এ-কথা বিশেষভাবে জেনেই সে চাকরি গ্রহণ করেছিল।

আসামী কাজী মিয়াজানের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে বাংলাদেশে জিহাদ প্রচার করতো ও নও-মুজাহিদ সংগ্রহ করতো। সে টাকা-পয়সা সংগ্রহ ও চালান এবং চিঠি-পত্র প্রভৃতি আদান-প্রদানের জন্য পাটনা প্রচার-কেন্দ্রের ও পাহাড়ে অবস্থিত ধর্মান্ধদের একজন কর্মঠ সহযোগী ছিল। তার গৃহে মুল্‌কা ও পাটনা থেকে লেখা সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের রাজদ্রোহাত্মক চিঠি-পত্র পাওয়া গেছে এবং সে সবে তার তিন চারটি ছদ্মনাম (aliases)-ও দেখা গেছে।

আসামী আবদুল করীমের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত পাটনার মনি-অর্ডারগুলি ভাঙিয়ে আনা এবং এ বিষয়ে ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর সংগে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে সে-ই ছিল মুহম্মদ শফীর (মাংস সরবরাহকারী) খাস অনুচর।

আসামী থানেশ্বরের হুসাইনীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে সে আসামী মুহম্মদ জাফর ও মুহম্মদ শফীর দালাল ছিল

এবং মহারানীর দুশমনদের দেবার জন্য জাফরের কাছ থেকে মুহম্মদ শফীর নিকট দু'শ নব্বইখানি স্বর্ণখণ্ড[৬৬] পারাপার করার সময় সে ধরা পড়েছে।

আসামী দুই নম্বর আবদুল গফ্‌ফারের বিরুদ্ধে[৬৭] প্রমাণিত হয়েছে যে, সে পাটনার ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর শিষ্য ছিল, থানেশ্বরে নও-মুজাহিদ ভর্তির কাজে আসামী জাফরের সাহায্য করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল এবং সে সাহায্য করেও ছিল। তাছাড়া, ষড়যন্ত্র বিষয়ে সে আসামী ইয়াহ্‌য়িয়া আলীর সংগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করতো।[৬৮]

এই মামলায় যে ষড়যন্ত্রের বিষয় উদ্‌ঘাটিত হলো, তার তিনটি প্রধান লক্ষণ ছিল: প্রশংসনীয় বিচক্ষণতা, যার দরুন এরূপ বহুধাবিস্তৃত ষড়যন্ত্র পরিকল্পিত ও সাধিত হয়েছিল; আশ্চর্য গোপনীয়তা, যা দিয়ে তার জটিল কার্যসমূহ নির্বাহিত হতো এবং অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততা, যা তার সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এর সাফল্য নির্ভর করেছিল একটা সুকৌশল পন্থায় ছদ্মনাম চালানো এবং একটা সাংকেতিক ভাষার উপর। তার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া গেল[৬৯]। কিন্তু এটা বিশ্বাস না করে পারা যায় না যে, সেনাবাহিনীর ঠিকেদার ব্যতীত প্রত্যেক রাজদ্রোহীই সে যে আল্লাহ্‌র রাহে চলেছে, এই ধ্রুব বিশ্বাস নিয়েই কাজ করে গেছে এবং মৃত্যুপণে সে নিজের প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত থেকেছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য বুদ্ধিমানের মতো তাদের প্রতি এরূপ ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র রাজদ্রোহীও

---

৬৬ সোনার মোহর।

৬৭ পূর্বে বর্ণিত আবদুল গফ্‌ফার থেকে পৃথক ব্যক্তি।

৬৮ ১৮৬৪ সালের মামলার বিবরণী প্রদানকালে আমি উক্ত সালেই যে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তারই সাহায্য নিয়েছি। এ-সব তথ্যই কোর্ট থেকে সই-মোহরকৃত নকল থেকে নেওয়া। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্র ও সরকারী বিবরণী থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৬৯ যুদ্ধকে বলা হতো মামলা; আল্লাহ্‌কে উকিল; সোনার মোহরকে বড় লাল, মোতি, সোনার বোটাওয়ালা দিল্লীর জুতা কিংবা লাল পাখী; সোনা পাঠাবার কালে মোহরকে বলা হতো তসবীর লাল দানা এবং টাকা পাঠাবার সময় কিতাব বা তৈজসপত্রের দাম হিসাবে উল্লেখ করা হতো; হুণ্ডি বা মনি-অর্ডার পাঠাবার সময় তাদের বলা হতো সাদা পাথর, আর টাকার অংক তসবীর সাদা দানার সংখ্যায় জানানো হতো—Official Records.

শহীদের মর্যাদালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রদেশের সবচেয়ে উচ্চ আদালত আপীল শুনানীর পর তাদের অপরাধ সম্বন্ধে স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের রায় বহাল রেখেছে, কিন্তু তিনটি জ্বলন্ত ক্ষেত্রেও ফাঁসির হুকুম বদল করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ দিয়েছে[৭০]।

তবু ১৮৬৪ সালের সরকারী মামলা ১৮৬৩ সালের প্রতিশোধমূলক অভিযানের মতই রাজদ্রোহীদের উৎসাহ হ্রাসে সামান্য কার্যকরী হয়। আভ্যন্তরীণ মতভেদের দরুন তারা সীমান্তে কয়েক বছর শান্তভাব অবলম্বন করলেও ইতিমধ্যে আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বেশ জোরালোভাবে জিহাদ প্রচারিত হচ্ছিল। পূর্ববংগের প্রতি জিলাই তখন রাজদ্রোহে কলংকিত হয়ে উঠেছিল এবং গঙ্গানদীর সমস্ত গতিপথে, অর্থাৎ পাটনা থেকে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত ভূভাগের মুসলমান কৃষকেরা জিহাদী বসতির সাহায্যের জন্য সাপ্তাহিক দান পৃথক করে রাখায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এই দানের কতোটুকু অংশ সত্যিসত্যিই সীমান্তে পৌঁছাতো, সে কথা বলা শক্ত। টাকা-পয়সা চালান দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠলে প্রচারকেরা সে-সব দিয়ে নিজেদেরকেই উদারভাবে সাহায্য করতো, যা প্রাথমিক অবস্থার উৎসাহের সময় কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বাংলা ব-দ্বীপের ধর্মান্ধ মুসলমানরা ফারায়েযী[৭১] নামে চিহ্নিত, ওহাবী

৭০ Para 182—184 of the Judgement in Appeal by the Judicial Commissioner of the Punjab, dated 24th, August 1864.

৭১ ফারায়েযী আরবী ফরিযাহ্, বহুবচন ফারায়েয্, অর্থাৎ ফরয্ শব্দ থেকে উৎপন্ন। তারা পাঁচটির মধ্যে প্রথম দুইটিকেই ফরয অর্থাৎ মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে, বাকী তিনটি কুরআন বা হাদীস সমর্থিত নয় বলে অস্বীকার করে। ইসলামের এই পাঁচটি বিধি হলো: (১) ফরয্ (এ থেকে ফারায়েযী), যার অস্বীকারে মুসলমান কাফের হয়ে যায়; (২) ওয়াজিব, যা ত্যাগ করলে মুসলমানদের পাপ হয়; (৩) সুন্নাত্, পালন না করলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও ভীতি প্রদর্শন (ইতাব) উদ্রেক হয়; (৪) মুস্‌তাহাব, যা পালন না করলে অপরাধ হয় না, কিন্তু করলে পুণ্যলাভ হয়; (৫) মুবাহ, যা পালন করা না করা সমান। ফারায়েযীরা তাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শরকতউল্লাহ্ (শরীয়তুল্লাহ্)-কে গ্রহণ করে, তিতুমীরকে নয়। তিনি ১৮২৮ সালে ঢাকায় নিজের মতবাদ প্রচার করেন।

শরীয়তুল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র দুধু মিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার লিখিত 'A fascinating Chapter in the History of East Pakistan প্রবন্ধ Islamic Review : June, 1951 সংখ্যায় দেখুন (অ)।

নামে নয়। আর ফারায়েযী শব্দে ইসলামের তফসীর বা ব্যাখ্যাস্থলভ সব আচার-অনুষ্ঠান ও অপ্রয়োজনীয় অংশসমূহের অস্বীকারকারীদের বুঝায়। তারা নিজেদের বলে নও-মুসলমান এবং পূর্বদিকস্থ জিলাগুলিতে তাদের সংখ্যা অত্যধিক। ১৮৩১ সালে একজন স্থানীয় নেতা কিভাবে তিন হাজার লোক জমায়েত করেছিল এবং 'কলিকাতা মিলিসিয়ার' একটা অংশকে পরাজিত করেছিল, শেষে কিভাবে স্থায়ী বাহিনী পাঠিয়ে তাদের শায়েস্তা করতে হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ১৮৪৩ সালে সম্প্রদায়টি এমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয়ে ওঠে যে, সরকার কর্তৃক বিশেষ তদন্তের দরকার হয়ে পড়ে। বাংলার পুলিশ-বাহিনীর অধিকর্তা রিপোর্ট দেন যে, তাদের একজন প্রচারকের অধীনে প্রায় আশি হাজার লোক একত্র হয়েছে; তারা তাদের একজনের সমস্যা গোটা সম্প্রদায়ের হিসাবে বিবেচনা করে এবং সহযোগী ভ্রাতাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে তারা কোনো কাজই অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে না[৭২]। শেষের দিকে খলীফারা, বিশেষতঃ ইয়াহ্‌য়িয়া আলী নিম্নবংগের ফারায়েযী-দেরকে উত্তর-ভারতে ওহাবীদের সংগে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর গত তের বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত হিসাবে এবং বিচারাদালতের কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে তাদেরকে সমানভাবে পাশাপাশি থাকতে দেখা গেছে।

১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত মানুষ ও টাকা-পয়সা সংগ্রহ পূর্বের মতো সমানভাবেই চলেছিল, আর ষড়যন্ত্র বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটা বিশেষ দফতর স্থাপন করতে হয়েছিল। বর্তমান সময়ে ওহাবীদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে ও তাদের সংযত রাখতে একটা প্রদেশেরই যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অধ্যুষিত একটা বৃটিশ জিলার শাসন, বিচার ও পুলিস-বিভাগের খরচের সমতুল্য হবে। এই আপদটা এমনভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন্‌খান থেকে তার বিরুদ্ধে কাজ শুরু করতে হবে, তা জানাই মুশকিল ছিল। প্রত্যেক জিলাকেন্দ্র শতসহস্র পরিবারে অসন্তোষ ছড়ায়

---

৭২ Letters No. 1001 dated 13th. May 1843, and No. 50 of 1847 from Commissioner of Police for Bengal, etc.

আর তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সাক্ষী হচ্ছে তার নতুন অনুগামীরা, যারা মৃত্যু বরণ করবে, তবু নিজের উস্তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে পুলিসের এবং সীমান্তের ঘাটিগুলিতে জংগীবিভাগের তৎপরতা সত্ত্বেও ১৮৬৮ সালে জিহাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর একটা ব্যয়সাধ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। সেই বছরই বাংলা দেশের অন্তস্তলে রাজবিদ্রোহ প্রচারের জন্য মালদহ জিলা-কেন্দ্রের প্রধান কর্তা পাটনার খলীফার পুত্রকে আহ্বান করলেন। আদালতের সাধারণ এলাকার মাধ্যমে এ রকম সংকটজনক অবস্থা আয়ত্তে আনার অনুপযুক্ততা দেখা দেওয়ায় সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে এ-সব বিষয়ের মুকাবিলা করতে হলো। ১৮১৮ সালে আইনসভা যথারীতি স্বীকার করেছিল যে, মাত্র গুটিকয়েক বিদেশী নিয়ে গঠিত তৎকালীন আমাদের সরকারকে বিজিত জাতির বিরাট লোকসংখ্যার নিকট সর্বদাই বিপদমুখে থাকতে হয়। তাই ষড়যন্ত্রকালে এক্তিয়ার মতো হাজতে আটক রাখার জন্য তখন শাসন-বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ ধরনের জাতীয় সংকটের মুকাবিলা ইংলণ্ডে করা হয় 'হেবিয়াস্ কর্পাস্' আইন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে। কিন্তু ভারতে এ রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ হবে, দেশে প্রায় সামরিক শাসন চালু করার মতো ভীষণ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বর্তমান অবস্থায় মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় মাত্র অপরাধী, আর মুসলমান জাতি পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পাক-ভারতীয় জনসংখ্যার এক-দশমাংশ মাত্র। অতএব হেবিয়াস কর্পাস্ বন্ধ করার অনুরূপ কোন আইন দেশে জারী করা হলে এদেশের খাঁটি বাশিন্দা হিন্দু জাতি ন্যায়তঃ এই অভিযোগ করতে পারে যে, তাদের চিরন্তন ভীষণ শত্রু মুসলমানদের রাজদ্রোহের জন্যই তাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। আর সত্যকথা বলতে গেলে, মুসলমান জাতির সুন্নী ও শীয়া সম্প্রদায় থেকেও এই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ উঠবে যে, ওহাবী বিরুদ্ধ-বাদীদের সংগে তাদেরকেও নিষেধাজ্ঞার অভিশাপে সমানভাবেই ফেলা হয়েছে।

অবিচারটা আরও ভীষণ হয়ে উঠবে আর একটি কারণে, যা সৌভাগ্য-ক্রমে ইংলণ্ডে অজ্ঞাত, কিন্তু ভারতে খুবই প্রবল। ধনী হোক, গরীব হোক, বাঙালী প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর হিংস্র হয় এবং শত্রুর উপর প্রতিশোধ

নেয় কোনো ভীষণ রকম জোরজবরদস্তি করে নয়, আইনের আশ্রয় নিয়ে। সে আইন-আদালতের আশ্রয় নেয় ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, যে উদ্দেশ্যে একজন ইংরেজ তার ঘোড়ার চাবুক, কিংবা কালিফর্নিয়াবাসী তার লম্বা ছোরা ব্যবহার করে। এখানে ফৌজদারী মামলায় আসামী করা হয় নির্ভুল রকমে শাস্তিদান করার জন্য। অতএব পাক-ভারতে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন অচল করার অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দুশমনের দয়ার উপরই ছেড়ে দেওয়া হবে। পুলিসী বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সত্য আর্যির তুলনায় বহু বিরাট সংখ্যক মিথ্যা আর্যি দাখিল হয়ে থাকে। আর বাঙালীরা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মামলা সাজাবার দুরূহ কায়দাটি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রপ্ত করে ফেলেছে। অতএব হেবিয়াস্ কর্পাসের অধিকার কোনো রকমে ক্ষুণ্ন করার অর্থ হোল, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের প্রবল সুযোগ দেওয়া। নিরীহ লোক সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকবে, কখন তাকে আটক করা হবে ও রাজদ্রোহের মিথ্যা অপরাধে জেলে পাঠানো হবে, আর প্রতিশোধপরায়ণ হিংসুক লোক নিরন্তর জয়লাভের আনন্দে উল্লসিত থাকবে।

তবুও ইংলণ্ডে মহারানীর মন্ত্রীরা যেমন সাময়িকভাবে হেবিয়াস্ কর্পাস্ অচল করবার ক্ষমতা ভোগ করেন, সেই রকম ষড়যন্ত্রের সংকটকালে আটক করার ক্ষমতা না থাকলে পাক-ভারতে বৃটিশ শাসন একমাসও নিরাপদ থাকবে না। এজন্য আইন-সভা শাসন বিভাগকে এই ধরনের একটা সীমিত ক্ষমতা দান করেছেন স্থায়ী বিশেষ অধিকার হিসাবে, কিন্তু তাও এ রকম সাবধানতার সংগে সুরক্ষিত করা হয়েছে যে, অপব্যবহারের কোন সুযোগ সেখানে নেই। একমাত্র সর্বোচ্চ সরকারের এ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে এবং সর্বোচ্চ সরকারকেও এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় একমাত্র সকৌন্সিল গবর্নর-জেনারেল কর্তৃক একটা যথারীতি হুকুমের বলে। আইনের ভূমিকায় আবার তার ব্যবহার একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষমতা বৃটিশ সরকার কর্তৃক বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে মিত্রতা উপযুক্তভাবে বজায় রাখার ক্ষেত্রে, বৃটিশ সরকারের আশ্রিত ভারতীয় রাজাদের এলাকায় শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিদেশের সংগে সংঘর্ষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে নিরাপত্তার ব্যাঘাত হওয়ার

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে[৭৩]। এ-সব কয়েদীর সংগে সদ্ব্যবহার করার জন্য বিশেষ নিয়মও লিপিবদ্ধ করা আছে। আইনে এ-সব কয়েদীর মর্যাদা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর থেকে সাবধানে পৃথক করা হয়েছে এবং তাদের আটক থাকা অবস্থাকে বন্দিত্ব না বলে 'ব্যক্তিগত অবরোধ' বলা হয়েছে। তারা সরকার থেকে একটা ভাতাও পেয়ে থাকে। তাছাড়া সরাসরি সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেলের নিকট যেকোন আবেদন বা আর্যি করবার স্বাধীনতাও তাদের আছে[৭৪]। এ রকম রাজবন্দীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সরকারের প্রধান কর্তাকে জানানো যে, আটকের দরুন তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে কিনা এবং মঞ্জুরীকৃত ভাতা তার নিজস্ব ও পরিবারের খাওয়া-পরা সম্বন্ধে তার 'সামাজিক মর্যাদার' উপযুক্ত কিনা[৭৫]। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তারই এক্তিয়ারে কিংবা তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে, কিন্তু সরকার যদি উপযুক্ত বিবেচনায় তার সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে, তাহলে সে-সম্পত্তি সব রকম নিলাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তা সে খাজনার দায়েই হোক, কিংবা দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রির দায়েই হোক। বস্তুতঃ কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের অধীনে সম্পত্তির মতো তারা সব সুবিধাই পেয়ে থাকে। তাছাড়া, অহেতুক বিলম্বিত আটক নিরোধের জন্য আইনতঃ সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। শাসন-বিভাগের হুকুমে আটক রাজবন্দীর দেখাশোনার দায়িত্বে বহাল প্রত্যেক কর্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে রাজবন্দীর আচরণ, স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে বছরে দু'বার সরকারের প্রধান কর্মকর্তার নিকট সরাসরি রিপোর্ট দাখিল করা। তার ফলে সকৌন্সিল গভর্ণর-জেনারেল বিবেচনা করতে পারেন যে, রাজবন্দীর আটক অবস্থা চলতে থাকবে, কিংবা পরিবর্তিত হবে[৭৬]।

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ১৮৫৮ সালের অভিযান ও পরবর্তীকালীন তদন্তের ফলে যে সংঘটির অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রতি যদি এই আইনটি প্রয়োগ করা হতো তাহলে বৃটিশ ভারত ১৮৬৩

৭৩ Regulation III. of 1818, clause I.
৭৪ Idem: clause V.
৭৫ Idem: clause VI.
৭৬ Regulation III. of 1818, clause III.

সালের সর্বনাশা যুদ্ধ থেকে রেহাই পেতো। মাত্র কয়েকজন বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তির আটকের ফলে আমরা আম্বালা পাশের প্রায় এক হাজার ব্যক্তির হতাহত হওয়ার ও বহু লক্ষ টাকার ক্ষতির দায় থেকে রেহাই পেতাম। এমন কি, এই বিপজ্জনক যুদ্ধের পরেও ১৮৬৪ সালের সরকারী মামলায় যে বিষম ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পেলো, তাও যদি শাসন-বিভাগের দ্বারা কঠিনহস্তে ধরপাকড় করে ভেঙে ফেলে দিতাম, তাহলে হয়তো সব রকমে আমরা ১৮৬৮ সালের কালো-পাহাঁড়ের অভিযান থেকেও পরিত্রাণ পেতাম। কিন্তু আমার অন্যত্র আলোচিত[৭৭] কারণসমূহের জন্য ভারত সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ চালে এটা স্বীকার করতেও ঘৃণা করে যে, তাদের সম্মুখে রাজনৈতিক বিপদ ওঁৎ পেতে আছে এবং সে বিপদই বারেবারে শাসন সংকট ঘটাতে প্রয়াস পেয়েছে। ভারতের জন্য ইংলণ্ড যে ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছে এবং এই দেশটা মহারানীর শাসনে যাওয়ার পর থেকে বৃটিশ ধনপতিরা যে বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা এখানকার রেলওয়েতে, খাল-খননে ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছে, সে-সব আমাদের কর্তৃত্বের সাময়িক উৎখাতের ফলেও চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আমাদের সীমান্তে বায়সাধ্য বহু সংগ্রাম-সংঘর্ষ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আদালত কর্তৃক শাস্তিদানের পরেও এই ধর্মান্ধ সংঘটিকে শায়েস্তা করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৮৬৮ সালে বাধ্য হয়ে সরকার অপরাধীদের ধরপাকড় করার ক্ষমতাটা কঠিন হাতে প্রয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে এতোটুকু আঘাত না দিয়েও এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে এবং তার দরুণ গণ-আন্দোলনের এতোটুকু ঢেউও না উঠতে পারে। কয়েক বছর পূর্বেই প্রতিটি জিলার রাজদ্রোহী নেতাদের নাম-তালিকা কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়েছিল। হিন্দু জনসাধারণও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতো, আজ কিংবা কাল হোক, সে-সব রাজদ্রোহীকে বন্দী করা হবেই। এবার সবচেয়ে নামজাদা রাজদ্রোহ প্রচারকদেরকে বন্দী করা হলো এবং তার দরুন তাদের অনুগামীদের মধ্যে যে মন্ত্রশক্তি কাজ করছিলো, তাও ভেঙে গেল। আর ক্রমে ক্রমে যারা টাকা-পয়সা চালান

---

৭৭ Annals of Rural Bengal : 1864, Vol. I. P. 24.

করতো এবং ১৮৬৪ সালের মামলার আসামী মাংস সরবরাহকারীর[৭৮] মতো এ-সব রাজদ্রোহাত্মক ঝুঁকিদার কাজে জামানতের ব্যবসা চালিয়ে মোটা টাকা রোজগার করতো, সেই সব গুপ্ত ও নীচ অথচ অর্থশালী রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণ আসতে লাগলো।

গত সাত বছরে পাঁচটি সুবৃহৎ সরকারী মামলা দায়ের হয়েছে এমন সব জিলায়, যেগুলি পরস্পর থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ সবগুলিই একই ষড়যন্ত্রের সূত্রে জড়িত। বস্তুতঃ এক একটি মামলা থেকে মনে হতো যে, আরও বহু মামলার সৃষ্টি হবে। এক প্রদেশের রাজদ্রোহীকে খুঁজে বের করতে দেশের দূরদূরান্তরে অন্ততঃ আধাডজন রাজদ্রোহের গুপ্ত গুহার ভূগর্ভস্থ চোরাপথেরও সন্ধান বের করতে হতো। ১৮৬৪ সালের আম্বালা মামলায় যে সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ হলো, তার থেকে ১৮৬৫ সালের পাটনার মামলাও অনিবার্য হয়ে পড়লো। আর দু'টির সমন্বয়ে যে-সব ঘটনা ব্যক্ত হলো, তার দরুন অনেকগুলো নতুন ধরপাকড় অনুষ্ঠিত হলো, যার ফলে হলো ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মালদহ মামলা, উক্ত বছরের অক্টোবর মাসে রাজমহল মামলা আর এই সদ্য-অনুষ্ঠিত মশহূর মামলা, যার বিচারশেষে সবে মাত্র আর একদল জিহাদীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড দেওয়া হয়েছে (১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ)। এ-সব দণ্ডপ্রাপ্ত রাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে, কিংবা যে-সব হতভাগ্যের দল নযরবন্দী বা হাযতবন্দী হয়ে বিচারের অপেক্ষায় আছে, তাদের বিরুদ্ধে জনতার আক্রোশ উত্তেজিত করতে আমি চাইনে। এ-সব ক্ষেত্রে উত্তম উপায় হচ্ছে, বিচারের ধীর গতির উপরেই সব ছেড়ে দেওয়া; কারণ শেষ হয়ে যাওয়া মামলাগুলি থেকে জ্বলন্ত ঘটনা বেছে নিয়ে তুলে ধরার ফল ভাল হবে না। তবে পাঠকের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় যে, ওহাবী মামলা বলতে কি বোঝায়, কি রকম জিদের সংগে মোটা টাকা ফি দিয়ে ইংরেজ ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে এ-সব মামলা লড়া হয় এবং তাঁরাও আইনের প্রতিটি দোষ-ত্রুটির ছল বা তৃণখণ্ড কিভাবে চেপে ধরেন আর সরকারকেই বা কি বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, সেজন্য শেষ মামলাটির শুধু কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছি। এই মামলার জন্য

৭৮ মোহাম্মদ শফী।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দু'মাস ধরে প্রাথমিক তদন্ত হয়। তারপর দায়রা জজের আদালতে একমাস তিন সপ্তাহব্যাপী শুনানী হয়। তখন আদালতের অধিবেশন হয় আটত্রিশ দিন, এক শ' উনষাট জন সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিরাট সংখ্যক দলিল-দস্তাবেজও সাক্ষ্য হিসাবে পঠিত হয়। এখন দায়রা আদালত থেকে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি আপীলে শুনানী অবস্থায় আছে। কিন্তু কবে তা শেষ হবে এবং কি পরিমাণ অর্থব্যয়ই বা হবে, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহস পাবেন না।

সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ণ এক বছর ধরে এ-সব মামলা ধর্মান্ধ জনসাধারণের মধ্যে চলতে থাকলে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে গোঁড়াশ্রেণীর লোকদের ঘৃণা কিভাবে জাগ্রত হতে পারে। উপরোক্ত মামলাটি হাইকোর্টে আসার কিছু পূর্বেই একজন মুসলমান ঘাতক বাংলার চীফ-জাস্টিস্‌কে তাঁর আদালত-গৃহের সোপানশ্রেণীতেই ছুরিকাঘাত করলো। আমি যখন এ-সব বিবরণ লিখছি, তখন ইংরেজ ও মুসলমান জাতির মধ্যে উত্তেজনা এমন চরমে উঠেছে যে সৌভাগ্য-ক্রমে মিউটিনির পর এতদিন তা আর দেখা যায়নি। পাক-ভারতীয় বিদ্যুৎ বহ্নিতে ভরে উঠেছে এবং তার বিস্ফোরণ এড়ানো কিছু সামান্য দৃঢ়তা ও জ্ঞানের কাজ নয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাখানায় দেওয়ার পূর্বে আমি অবশ্য ভীতিসঞ্চারকারী কিংবা বিপদ সম্বন্ধে উত্তেজক বর্ণনাদানকারীর মতো অবস্থার প্রতিবাদ না করে পারিনে। পাক-ভারতের অপরাধসমূহ দমন করার পক্ষে ব্রিটিশের আদালত সত্যিই যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন। এমনও হয়তো প্রয়োজন বিবেচিত হতে পারে যে, শাসন বিভাগের হাতে ইতিপূর্বেই ন্যস্ত ধরপাকড়ের ক্ষমতাটা আরও শক্তিশালী করা উচিত। কিন্তু প্রশ্নটি আইন-সভার পক্ষে প্রশান্তভাবে বিবেচনা করবার মতো। একটা সদ্যহারা বিরাট ক্ষতির ছায়াচ্ছন্ন রোষ ও ঘৃণায় ফেটে পড়া জাতির হঠকারী সংকল্পের মধ্যে তা আশা করা যায় না।

ইতিমধ্যে এসব ধরপাকড় ও তার ফল সরকারী মামলায় এই ধর্মান্ধ সম্প্রদায়টি মুসলমানদেরকে যে কোন বিপদের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে তারা শেষ পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা এখন

এই বিরুদ্ধবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে নিজেদেরকে প্রকাশ্যে পৃথক হিসাবে দেখিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এইজন্য তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই জিহাদ সম্বন্ধে নিজেদের আলেমদের ফতোয়া প্রচার করছে এবং ওহাবী রাজদ্রোহকে প্রকাশ্যে নিন্দা করছে। এ-সব অপূর্ব দলীল-পত্র সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। ধর্মান্ধদের ষড়যন্ত্রও এখন ভাঙনের মুখে। তার সবচেয়ে ভালো কর্মী নেতারা এখন হাজতে বন্দী, আর বাকী সব ভাবছে যে, এ পরিস্থিতিতে বাড়াবাড়ি করলে তাদের জন্যও অনুরূপ ভাগ্য অপেক্ষমান। কিন্তু অস্ত্রধারী বস্তিটা তুচ্ছ হলেও এখনো সীমান্তে বেঁচে আছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে তা একটা বিরাট ধর্মীয় জোটের বীজক্ষেত্রের রূপ গ্রহণ করতে পারে। আজই সকালে আমি যখন এই অধ্যায়টি শেষ করতে চলেছি[৭৯], তখন একটা ভারতীয় সংবাদপত্র, যার খবর প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য, প্রচার করছে যে, কালো পাহাড়ে আরও একটি অভিযান করা হয়েছে। গত ৪ঠা জুন তারিখে একটা আদিজাতি সদলবলে নীচে নামে এবং বাশিন্দাদের প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়[৮০]। এই উৎপীড়নের সংবাদ পাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যেই তৃতীয় পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনী এবং চতুর্থ পাঞ্জাব অশ্বারোহী বাহিনীর একটা দল নিকটবর্তী ঘাটি থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার ফলাফল আজও জানা যায়নি। আর এই হামলার মূলে ধর্মান্ধতা, না অন্যকিছু কাজ করেছে, তাও এখনো নির্ধারিত হয়নি। শুধু এইমাত্র জানা গেছে যে, গত কয়েকমাস ধরে ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রগুলি আর একটি আফগান যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা করছে। আর যদিই বা এমন কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের ভাগ্যে থাকে, তাহলে আমাদের উচিত, সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ওহাবী ষড়যন্ত্রটাকে প্রথমেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। তাতে করে নিশ্চয়ই কোনো সামান্য বিপদ এড়ানো হবে না।

৭৯ Simla, June 14. 1871 (1st Edition)

৮০ Pioneer, June 12. reached Simla, June 14

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম আলেম সমাজের ফতোয়া

বাংলাদেশে ওহাবীরা বিদ্রোহের বেড়াজাল বিস্তারকালে তাদের স্বদেশবাসীর নিকট থেকে কিছু কম বাধা পায়নি। মুসলমান মযহাব-গুলি ধর্মীয় মতবাদের বিভিন্নতার জন্যে পরস্পরকে এতোখানি ঘৃণা করে যে, প্রত্যেক দল মনে করে, তাদের বিরুদ্ধবাদীরা খ্রীস্টান হয়ে গেছে। তাছাড়া, অর্থশালী ও কায়েমী স্বার্থশ্রেণীর লোক, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, জিলার মধ্যে ওহাবীদের উপস্থিতিকে একটা স্থায়ী আপদ হিসেবে বিবেচনা করে। রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ওহাবীরা সমান বিপ্লবী হিসেবে তাদের কার্যকলাপ লুথার বা ক্রমওয়েলের মতো সংস্কারমূলক নয় বরং রবস্‌পীয়ের ও এন্টাওয়াপের টানকোলিনের[১] মতো ধ্বংসাত্মক। শেষোক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবকে যেমন ইউট্রেক্টের যাজকসম্প্রদায় অভিশাপ হিসেবে গণ্য করে আর্তনাদ তুলেছিল, সেইরকম ওহাবীদের উপস্থিতিতে গত অর্ধশতাব্দী ধরে আর্তনাদ তুলেছে মসজিদে কিংবা সড়কের ধারে খান্‌কায়[২] একর বারো জমিসম্বলিত প্রত্যেক মুসলমান মোল্লা। ১৮১৩ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত কোনো ওহাবী জীবনের আশংকা না নিয়ে মক্কাশরীফের রাস্তায় হাঁটতে পারতো না এবং বেইজ্জত ও উৎপীড়নের ঝুঁকি না নিয়ে এখনো পারে না।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও জমিদার ও যাজকীয় কায়েমী স্বার্থ শ্রেণী সব পরিবর্তনকে সমানভাবে বিভীষিকার চোখে দেখতো।

---

১ টানকোলিনের সম্প্রদায় ছিল খাঁটি চার্চভুক্ত। তিনি সর্বদাই তিন হাজার সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে ফিরতেন এবং লোক তাঁকে দেবদূত কিংবা তার চেয়েও উর্ধ্বস্তরের বিবেচনা করতো। তিনি গোসল করলে তারা সে পানি পবিত্র জ্ঞানে পান করতো।—Milman's History of Latin Christianity, vol V, P 389, ed. 1867.

২ সাধারণ কোন মাযার, যার সঙ্গে একটা আমবাগান, কিংবা কিছু জমি ওয়াকফ করা থাকতো।

মুসলিম জোতদারেরা মসজিদে স্বার্থরক্ষা করতে সদাসচেষ্ট ঠিক যেমন ইংরেজ জোতদার সদাসচেষ্ট প্রতিষ্ঠিত চার্চের স্বার্থ রক্ষার্থে। যে কোন ধরনের মতভেদ, তা সে ধর্মীয় হোক বা রাষ্ট্রীয় হোক, কায়েমী স্বার্থ-শ্রেণীদের পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতীয় ওহাবীরা দুই বিষয়েই চরম বিরুদ্ধবাদী—ধর্মের দিক দিয়েই আনাব্যাপ্টিস্ট্ কিংবা পঞ্চমরাজ্যের[৩] বাহিনীর মতো, আর রাজনীতির দিক দিয়ে কমিউনিস্ট ও লাল গণতান্ত্রিকদের মতো। যে সব মুসলমান তাদের মতবিরুদ্ধ ছিল, মহাপাপী হিসেবে তাদের উপর ওহাবীরা চরম আঘাত হানতো। ১৮২৭—৩০ সালে পেশোয়ারের একজন একগুঁয়ে মুসলমান শাসকের উপর হিন্দু শিখদের মতোই ওহাবীদের ধর্মনেতা ভীষণরূপে অস্ত্র হেনেছিলেন। ১৮৩১ সালে কলকাতার চতুর্দিকে চাষীবিদ্রোহের সময় ওহাবীরা সমান নিরপেক্ষতা দেখিয়ে হিন্দু ও মুসলমান জোতদারদের গৃহে হানা দিতো ও লুটপাট করতো। বস্তুতঃ মুসলমান জোতদাররাই চরম শাস্তি পেতো এবং একবার এ-সব লুণ্ঠকেরা তাদের একজন বিরুদ্ধবাদী মুসলমান-ভাইয়ের কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে তাদের সরদারের সংগে শাদী দিয়ে দিয়েছিল। পনেরো বছর পর ওহাবীদের সম্বন্ধে সরকারী বিবরণীতে বলা হয়, "প্রায় আশি হাজার লোক নিম্নশ্রেণী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, আর মানুষ হিসেবে তারা সমান অধিকার দাবী করতো'[৪]। এ-রকম চরম দাবী পৃথিবীর যে-কোনো জোতদার শ্রেণীর পক্ষে বিরক্তিকর ও অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।

আর তাছাড়া, এ ধরনের ধর্মীয় চাষীবিদ্রোহ কোনো পুঁজিপতি কিংবা সুখী শ্রেণীর প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশের একটা বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণী (এবং খুব ধনশালী ও শক্তিশালীও বটে) বরাবরই ওহাবীদের পক্ষে ছিল। মুচি-চামারেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নীচু স্তরের লোক। সে হিন্দুর পরম

৩ পিউরিটান বিপ্লবীদের চরমবাদীরা; তারা দানিয়েল পরবর্তী চারটি খ্রীস্টশত্রুর রাজত্বের পর পৃথিবীতে যীশুখ্রীস্টের নতুন ধর্মরাজ্যের আশা পোষণ করতো —(অ)।

৪ Mr. Dampier, Commissioner of Police for Bengal, in letters already cited.

পবিত্র জন্তু 'গোমাতার' মৃতদেহে পাপহস্তক্ষেপ করে ও তার মৃত্যুতেই লাভবান হয়। জন্মাবধিই সে অশুচি, ভদ্রসমাজের গণ্ডীর বহির্ভূত এবং যতোই তার ধন-সম্পদ ও ইষ্টসিদ্ধি হোক, তার ঘৃণ্য জীবিকাহেতু কখনো সে সম্মানার্হ হতে পারে না। খাঁটি হিন্দুর মতোই সে এই অপমানজনক অবস্থা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করে। সে বেশ জানে যে, কৃতকার্যের জন্য সে কখনো সমাজের উচ্চস্তরে উঠতে পারে না, এজন্য তার মাথাব্যথাও নেই। তার কোনো নিতাচার বা সাধুতায় প্রতিবেশীর সম্ভ্রম আকৃষ্ট হয় না। তার জন্য সে অসুখীও নয়। গাঁয়ের গরুগুলি যদি খুব বেশী সংখ্যায় মরে এবং তার প্রচুর চামড়া আমদানি হয়, তাতেই তার সুখ। আর যদি গরুগুলি বেশী সংখ্যায় না-ই মরে, তাহলে সে মৃত্যুর মন্থর গতিটা দ্রুততর করে দেয় কিছু সেঁকোবিষের সদ্ব্যবহার করে। এরকম হতভাগ্য শ্রেণীর লোক কখনো ছোটখাটো খুচরা ব্যবসায়ের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। এজন্য চামড়ার মতো ভারতের একটা প্রধান ব্যবসায় মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতে একচেটিয়া হয়ে আছে। পবিত্র 'গোমাতার' চামড়ার ব্যবসায় সম্বন্ধে হিন্দু-মনে যে প্রবল সংস্কার আছে, মুসলমানদের এর কোনো বালাই নেই। এজন্য চামড়া-রফতানির কাজে মুসলমান ব্যবসায়ীদের হলো একচেটিয়া অধিকার এবং তার দরুন তারাই হলো অন্যতম সবচেয়ে ধনী দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। কিন্তু তারাও হিন্দু সম্প্রদায়ের চোখে বিষম বিদ্বেষ ও ঘৃণার পাত্র। এই অবজ্ঞাকেও এ-সব মুসলমান সুদে-আসলে শোধ দিয়ে থাকে। তারা বেশ জানে যে, যদি ব্রাহ্মণরা কখনো ক্ষমতা হাতে পায়, তাহলে তারাই হবে কাফেরদের হাতের প্রথম বলি। এজন্য তারাও হিন্দু কাফেরদেরকে তাদের হাতের যোগ্য বলি হিসেবে বিবেচনা করে। এই চামড়া ব্যবসায়ীরাই হলো ওহাবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অর্থশালী ও ধনশালী সমর্থক, যে ওহাবীদের বীজমন্ত্র হলো বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা।

কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, ওহাবীরা কোনো একটি অর্থবান ও শক্তিশালী শ্রেণীবিশেষের দয়ার উপরেই নির্ভরশীল নয়। তাদের প্রচণ্ড আবেদন হচ্ছে মুসলমান জনগণের নিকট, আর তাদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক, একটা অশান্ত আশা-নিরাশার

পক্ষে নিঃসন্দেহে তা উপযোগী। আমি আগেই বলেছি এবং এখনো আনন্দের সংগে বলছি যে, তাদের মধ্যে এমন হাজার হাজার খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আত্মনিগ্রহকে জীবনের প্রথম কর্তব্য হিসাবে জ্ঞান করেন। এই দিকটাই তাদের সমগ্র সংগঠনের উপর কল্যাণ করছে এবং বিষয়-বাসনাদগ্ধ সরকারী লোকদের চোখে সম্ভ্রম, এমন কি ধর্মীয় পবিত্রতা এনে দিয়েছে। মহৎ মানসের ওহাবীর মনে নিজের জন্য ভয় নেই, অন্যের জন্য দুঃখ নেই। তার জীবনের পথ ঋজু ও পরিষ্কার এবং কোনো সাবধানবাণী বা শাসনবাণী তাকে ডাইনে বা বামে নোয়াতে পারে না। বর্তমানে বাঙলা দেশের কোন এক কারাগারে এমন একজন সম্ভ্রান্ত শ্বেতশ্মশ্রু মুসলমান আটক আছেন, যাঁর জীবনে কোনো মালিন্য নেই এবং তাঁর একমাত্র অপরাধ এই যে, তিনি একজন একরোখা ভীষণ বিদ্রোহী। প্রায় গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর রাজবিদ্রোহের কাহিনী কর্তৃপক্ষ সম্যক অবগত আছেন এবং তিনিও পরিষ্কার জানতেন যে, তাঁর কার্যকলাপ বেশ সুবিদিত। তাঁকে প্রথমে সাবধান করে দেওয়া হয় ১৮৪৯ সালে—তারপর ১৮৫৩ সালে, পুনরায় ১৮৫৭ সালে। ১৮৬৪ সালে তাঁকে প্রকাশ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ডেকে এনে শেষবারের মত সাবধান করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সব সাবধানবাণী তিনি কানে তোলেননি। অবশেষে ১৮৬৯ সালে তাঁকে নযরবন্দী করে রাখতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা বড়ো শক্ত ব্যাপার। যে ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসে বাস্তবিকই ধর্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সরকার স্বভাবতঃই সংকোচ বোধ করে। এজন্য এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ শুধু তাঁকে মৃদুভাবে ব্যক্তিগত আটকে রেখেই অন্যের অনিষ্ট-সাধন থেকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে।

ওহাবীর জীবন মোটেই মসৃণ কিংবা আরাম-আয়েশের নয়। যারা এই নয়া মতবাদে বিশ্বাস আনে, তাদেরকে প্রথমে সালিয়ানা আয়ের একটা মোটা অংশ এই সম্প্রদায়ের পোষণের জন্য অবশ্যই দান করতে হয়। আর যারা আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ও সীমান্তের বিদ্রোহী বসতিতে যোগদান করে, তাদের ভাগ্যে থাকে চরম দুর্ভোগ। বিগত সরকারী মামলাগুলিতে এ সব নও মুজাহিদের সাক্ষ্যে যে সব কাহিনী

পাঠ করেছি, তার চেয়ে দুঃখময় কোনো কিছু আমি জীবনে পড়িনি। বিচারকদের রায় থেকে জানা যায় যে, পূর্ববাংলার প্রত্যেক জিলা থেকেই ওহাবী প্রচারকরা সাধারণতঃ কুড়ি বছরের নীচের তরুণদেরকে ছলনায় ভুলিয়ে দলে দলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা করতো তাদের পিতার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে। তারা হাজার হাজার চাষী পরিবারে ডেকে এনেছিল দুঃখ-শোকের পশরা, সমগ্র পল্লীজীবনে নিরন্তর সৃষ্টি করেছিল একটা উৎকণ্ঠার ভাব, বিশেষ করে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণশ্রেণীর জন্য। যে ওহাবী পিতার সাধারণের চাইতেও একটু বেশী যোগ্যতাময় ও ধর্মনিষ্ঠ ছেলে আছে, সে বলতে পারতো না, কোন্ মুহূর্তে তার ছেলে হঠাৎ ঘর থেকে উধাও হয়ে যাবে। এভাবে যে-সব তরুণকে ভুলিয়ে আনা হত, তাদের অধিকাংশ মারা যেত মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে কিংবা তরবারির মুখে। যারা ফিরে আসতো এবং খুব কমই আসতো, তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরতো যে, তাদেরকে শুধু হাতিয়ারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দরকার ফুরিয়ে যাবার পর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাদের ভাগ্যে সবচেয়ে কম দুর্ভোগ ঘটেছে, তাদের একজনের কাহিনী হলো এই—'আমি হলুম পাটনার খলীফা সাহেবের মুরীদ। আমার বয়স যখন দশ কি বারো, তখন রামপুর বোয়ালিয়ায় (সাক্ষীর বাড়ীর অতি নিকটে নিম্নবংগের একটি শহর) তাঁর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করতে যাই। উস্তাদরা জিহাদের পরিকল্পনা করছিলেন এবং তার সাহায্যার্থে টাকা-পয়সাও পাঠাচ্ছিলেন। আমার বয়স যখন পনেরো, তখন আমায় জিহাদে যোগ দিতে পাঠানো হয়। আমরা পাটনা ও দিল্লী হয়ে অগ্রসর হলুম (সীমান্তের ঘাটি তখন প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে)। আমি পাটনার খলীফার সংগে এক রাত্রি কাটালুম। দিল্লী থেকে আমার সংগীরা চলে গেল, কিন্তু আমি সেখানে দেড় বছর রয়ে গেলুম একজন আলেমের নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য। তারপর একদল বাহিনী যখন দিল্লী হয়ে সীমান্তের ঘাটিতে যাচ্ছিল, তখন আমি তাদের সংগে যোগ দিলুম ও গুজরাট পর্যন্ত গেলুম। আরও কিছুদিন পর আর একটা দল এলো। আমি তাদের সংগে পাহাড় অঞ্চলে গেলুম। সেখানে আমায় আশ্বাস দেওয়া

হলো যে, ইমাম সৈয়দ আহ্‌মদ পুনরায় উদয় হয়েছেন। এখানে আমি আবিষ্কার করলুম যে, কোনো ইমাম সাহেব উদয় হননি এবং সমস্তটাই ভাঁওতা। তখন আমি ও অন্য সকলে রাগ করে দিল্লীতে ফিরে আসি। তারপর একজন আরবের লোক দিল্লীতে এলেন এবং আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, ইমাম সাহেব সিত্তানায় উদয় হয়েছেন। তিনি আমাদেরকে পুনরায় জিহাদে যোগ দিতে প্ররোচিত করলেন। আবার আমি ফিরে গেলুম ও ইমাম সাহেবের উদয় হওয়ার প্রশ্ন তুল্‌লুম। কিন্তু কোনো জওয়াব মিললো না। আমি শীঘ্রই আবিষ্কার করলুম যে, আমরা পুনরায় প্রতারিত হয়েছি। তারপর একদল ব্রিটিশ বাহিনী আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসে, কিন্তু আমি দিল্লীতে পালিয়ে আসি। তারপর আমি নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছি'[৫]।

এই হলো একজন সবচেয়ে যত্ন নেওয়া নও-মুজাহিদের কাহিনী, যে নিজে আঘাত না খেয়ে পালিয়ে এসেছে। যারা মহামারী, শীত-বর্ষা ও দারিদ্র্যের ঘা খেয়েছে, তাদের আরও দুঃখময় কাহিনীর বর্ণনা আমি দিতে চাইনে। তবে কোনো একটি জিলায় একটি মাত্র মুজাহিদ সীমান্ত থেকে ফিরে এলে ওহাবীদের কাজের এতো বেশী ক্ষতিসাধন হয়, যা কোন সরকারী মামলায় সম্ভব নয়। তার উপস্থিতিতেই ধর্মান্ধ তরুণদের, যারা জিহাদে যাওয়ার দাবী জানাতো, স্থায়ীভাবে মোহ ভংগ হয়ে যায়। আর বহু সত্যিকার খাঁটি ওহাবীও এমন কোনো ফতোয়া শুনতে চাইতো, যা তাদেরকে জিহাদ করার ফরয থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

গত কয়েক বছরে এ সব ফতোয়া শীতেঝরা পাতার মতো সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ওহাবী প্রচারকেরা কেবল ধর্মান্ধ জনগণের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা দেশবাসী সর্বস্তরের মুসলমানদের ঘাড়ে জিহাদ করার দায়িত্বটা চাপাতে চেয়েছে। এখন, সুখী শ্রেণীর মানুষের পক্ষে এটা একটা সংকটজনক অবস্থা যে, হয় তাকে এই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রে যোগদান করতে হবে, না হয় বে-দীন্

৫ দিনাজপুরের জজ আদালতে ১৮৭০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে মুহম্মদ আব্বাস আলীর দেওয়া সাক্ষ্য থেকে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া। আমি পারত-পক্ষে প্রকৃত নাম ব্যবহার থেকে বিরত হয়েছি।

বা ধর্মত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে বিপদ এড়িয়ে এ আন্দোলনে চাঁদা দেওয়া কিছুকাল ধরে বেশ চলেছিল, কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষ ধরপাকড় করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করার পর বিদ্রোহে সাহায্য করাটা বিপজ্জনক খেলা হয়ে উঠলো এবং কেবলমাত্র বেশী গোঁড়া শ্রেণীর ব্যক্তিরাই এ কাজে ঝুঁকি নিতে রাযী হলো। ধনবতী বিধবাদের নিকট থেকে সাহায্য আসতে লাগলো খুবই কম। আর যাদের দেশের সামান্য কিছু ঝুঁকি আছে, তারাও জিহাদের জন্য মসজিদে চাঁদা দিতে বিরত হতে লাগলো। অন্যপক্ষে ওহাবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ধর্মান্ধরা বিধর্মী সরকারের ভয়ে যারা দ্বীনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলো, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দার ঝড় তুললো। তারা দলত্যাগীদেরকে দোষ দিল ভীরু ও স্বার্থসন্ধানী বলে এবং যে নীতির অনুসরণ করে সুখী শ্রেণীর লোকেরা এক সংগে আল্লাহ্‌র ও দুনিয়ার সেবা করতে চায়, তাদের সেই নীতি অবলম্বনের তীব্র নিন্দা করলো।

অর্থশালী মুসলমানরা এ-সব ভর্ৎসনা কিছুকাল হজম করলো। কিন্তু তাদের পেছনে ছিল সমগ্র কায়েমী স্বার্থভোগী মোল্লা সম্প্রদায়। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাদের পক্ষ সমর্থন করতে একত্র হলো। তারা ওহাবীদের জিহাদমন্ত্রের মৌল নীতিরই বিরুদ্ধতা করতে লাগলো। তারা অস্বীকার করলো যে, মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কোনো রকম বাধ্যবাধকতা তাদের আছে। গত কয়েক মাস ধরে এই মত সমর্থনে গাদাগাদা ফতোয়া জারি হয়েছে। এমনকি, ভারতীয় মুসলমানদের মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো বিপজ্জনক ধর্মীয় দায় থেকে মুক্তি দিতে মক্কাশরীফের তিনজন প্রধান মুফ্‌তীর মতও গ্রহণ করা হয়েছে[৬]।

এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিধান দেওয়া কিছু কম ওকালতি বুদ্ধির কাজ নয়। কুরআনের বাণীর সরল অর্থ এই যে, ইসলামের অনুসারীরা সারা দুনিয়া নিজেদের অধিকারে আনবে এবং বিজিতদেরকে শুধু

---

৬ হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মযহাবের তিন মুফতী। মক্কায় হাম্বলী মযহাবীদের সংখ্যা কম এবং তাদের কোন মুফতী নেই।

ধর্মান্তর গ্রহণের কিংবা প্রায় গোলামির অবস্থা বরণের অথবা মৃত্যুবরণ করবার সুযোগ দেবে[৭]। একটা আধুনিক 'নেশন'-এর অভাব-সংকট সমাধানের উপযোগী করে কুরআন লিখিত হয়নি। তা লিখিত হয়েছিল একটা স্থানীয় যুদ্ধপ্রিয় আরব গোত্রের উৎপীড়িত, আক্রমণকারী ও বিজয়ী সম্প্রদায়ের ক্রমিক ভাগ্য পরিবর্তনের ভূমিকার উপযোগী করে[৮]। কুরআনের কঠোর সংগ্রামশীলতা ও ধর্মান্ধতা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা ক্রমে শান্তস্নিগ্ধ করে আনা হয়েছে। তার একগুঁয়ে উৎকট গোঁড়ামি থেকে একটা সুষম বে-সামরিক রাষ্ট্রনীতিও উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু জিহাদ সম্বন্ধে রসূলের বাণীগুলি অবিকৃতভাবেই মুসলিম শরীয়তী আইনে রূপায়িত হয়েছে। ভারতীয় পাঠ্যপুস্তক সুবৃহৎ বিধানগ্রন্থ 'হিদায়া'তে তো কাফেরদের সংগে জিহাদ করা ও আনুষংগিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যায়ই লিখিত হয়েছে। এর আবশ্যকতার উপরও শরীয়তী আইনের বড়ো বড়ো আলেম বলিষ্ঠ ভাষায় জোর দিয়েছেন; কিন্তু অধুনা মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে উত্তেজনাময় আলোচনা চলছে, তাতে কুরআনের উল্লেখ আছে খুবই কম। সব দলই নীরব সম্মতিতে এই প্রশ্নটাকে তাদের পবিত্র গ্রন্থের মূল বচন থেকে শরীয়তী আইনের (যার ভিত্তিমূলও আগেরটি থেকে) সীমানার মধ্যে এনে ফেলেছে।

এটা অবশ্যই আমাদের ও মুসলমানদের পক্ষে আনন্দের কথা যে, এ-সব ফতোয়ার লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি ও রাজভক্তি। যদি এ-সব ফতোয়া রাজদ্রোহের সমর্থনে হতো, তাহলে অবস্থা কি ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতো, তা ভাষায় বলা যায় না। এরকম একটা প্রশ্নই যে উঠতে পারে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভারতীয় আধিপত্যের

---

৭ হান্টারের এ উক্তি অশোভন ও ভিত্তিহীন। তাঁর মতো সাবধানী লেখক প্রত্যেক তথ্যের নযীর দিয়েছেন, কিন্তু এই তথাকথিত বাণীর কোনো নযীর দেননি। কুরআনে এমন কোনো বাণীই নেই---(অ)।

৮ হান্টারের এ উক্তিও অশোভন ও অমূলক। তাঁর মতো পণ্ডিতের নিশ্চয়ই জানা উচিত যে, কুরআন কোনো মানবলিখিত বাণী নয়। দ্বিতীয়ত, কুরআন কোনো স্থানবিশেষের উত্থান-পতনের কাহিনী নয় বা উপযোগী করে রচিত গ্রন্থ নয়---(অ)।

ভিত্তিমূল কি বিপদ্‌সংকুল। কারণ, এ কথাটা কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলে না যে, যে-সব ফতোয়া আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে, সে-সবের দরুনই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্দম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে। এমনকি, বাদশাহ্ আকবরকেও তাঁর ক্ষমতার অত্যুচ্চ শিখর থেকে প্রায় ভূলুণ্ঠিত হওয়ার অবস্থায় পড়তে হয়েছিল জৌনপুরী আলেমদের একটি ফতোয়ায়, যাতে বলা হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আইনসংগত। তারপরেই বাঙলা দেশে ভীষণ ফৌজী বিদ্রোহ ঘটে এবং তারপর থেকে নিম্নবংগের বহু ভুঁইয়ার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং সরকারের চোখে তাঁরা হয়ে যান কতকটা যেন সামন্ত রাজা। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির একজন মুসলমান রাজদ্রোহী একটি শহরে দিল্লীর শাসন ঘোষণা করেই এক স্থানীয় মুসলমান দরবেশের নিকট যান ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার একটি ফতোয়া প্রার্থনা করেন। ইউরোপে তুর্কীর শাসন-দরবার যখনই বুলগেরিয়ায় কিংবা অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সৈন্য চালনা করতে ইচ্ছা করতো, তখনই আলেম সমাজের একটি ফতোয়া বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কর্তব্য ও তার পুরস্কার সম্বন্ধে প্রলোভন দেখিয়ে সৈন্যবাহিনীর উত্তেজনা রীতিমতোভাবে বৃদ্ধি করতো। খ্রীস্টানরাও ঠিক এই কাজই করতো এবং শেষ ক্রুসেড্‌গুলির সময় ঠিক একই দাওয়াই প্রয়োগ করে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য'-এর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা হতো। মুসলিম দেশগুলিতে বিধর্মীদের নিঃশেষ করার জন্য এ রকম ধর্মীয় বিধান তাদের শরীয়তী আইনের উচ্চস্তরে মীমাংসাপত্র এবং আমি যখন ১৮৬৭ সালে কনস্টান্টিনোপলে ছিলাম, তখন এ-সব ফতোয়া অতি সহজেই সংগৃহীত হয়েছিল। মাত্র কিছুকাল পূর্বেও মিসরের পাশা ও তুরস্কের সুলতান ধর্মীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভীষণতম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, এ-সব বিদ্রোহীর বিশ্বাস ছিল যে, আমীরুল মু'মেনীন শরীয়তী আইন ত্যাগ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ফরয হয়েছে এই ধর্মত্যাগীকে ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া। অতএব আমাদের পক্ষে এটা একরকম শুভ লক্ষণ যে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান বাদশাহের বিরুদ্ধে যে শহর[৯] থেকে বিদ্রোহ

৯ জৌনপুর।

ঘোষণার ফতোয়া প্রচারিত হয়েছিল, ঠিক সেই শহর থেকেই একজন আলেম এগিয়ে এসেছেন[১০] ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ঘোরতর প্রতিকূল এই ফতোয়া নিয়ে।

গত কয়েক মাস ধরে ভারতীয় দু'টি প্রধান সম্প্রদায় শীয়া-সুন্নী বিশেষ অনুধাবনের পর এই বৃহৎ প্রশ্নের জওয়াবে যে বিবিধ মীমাংসায় উপনীত হয়েছে, আমি এখানে সে-সবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

মহারানীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার কর্তব্য সম্বন্ধে শীয়া সম্প্রদায়, অন্য সব বিষয়ের মতো এই ব্যাপারেও, পৃথকভাবে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে বিষয়টি আলোচনা করেছে। আর এই মতামতটা হচ্ছে সেই সম্প্রদায়ের, যেটা পাক-ভারতে কোনোকালে সংখ্যাবহুল ছিল না এবং মুসলিম গোঁড়া সরকারের আমলে যারা এমন উৎকট উৎপীড়নে অভ্যস্ত ছিল, যা কোনো বৃটিশ শাসক কখনো সমর্থন করবেন না। এই ছোট্ট ফারসী কিতাবটি[১১] যা মাত্র কিছুদিন আগে জিহাদ প্রসংগে রচিত হয়েছে, ভারতের মুসলমান বাশিন্দার নয়-দশমাংশের নিকট মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু শীয়া আইনের একজন বিশিষ্ট আলেমের মতামত হিসেবে এ বইখানির গুরুত্ব অনেকখানি; কারণ এতে শীয়া মযহাবের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নযীরগুলি, বিশেষ করে অযোধ্যার ভূতপূর্ব শাহের একজন মাননীয় পীর সাহেবের মতামত আলোচিত হয়েছে। শীয়ারা সংখ্যাবহুল না হলেও ভারতের ইতিহাসে তারা বহু মহৎ ব্যক্তির নাম উপহার দিয়েছে। আর জিহাদ করার কর্তব্য নিয়ে যে আলোচনার ঝড় গত চার বছর ধরে প্রত্যেক শহরে বয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের মতামতগুলিও তারা বেশ সার্থকতার সঙ্গে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছে।

শীয়া মতের মৌল ভিত্তি হচ্ছে বারো ইমামে বিশ্বাস করা, যাঁরা আল্লাহ্‌র রসূল থেকে সরাসরি ধর্মীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

১০ মওলবী কেরামত আলী কলকাতা মোহামেডান্ লিটারারী সোসাইটিতে ১৮৭০ সালের ২৩শে নবেম্বর যে বক্তৃতা দিয়েছেন।

১১ 'জিহাদের সংজ্ঞা, যে অর্থে শীয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে'—মুনশী আমীর আলী খান বাহাদুর রচিত, কলকাতা, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ। ইনি মশহুর জাস্টিস্ আমীর আলী থেকে পৃথক ব্যক্তি—(অ)

এখনো একজন ইমাম উদয় হয়ে এই মহামহিম বংশের ধারা পূরণ করবেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি পাপীদের চক্ষুর অন্তরালে বাস করছেন। তাঁর উদয় না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের পশরা নামতে থাকবে এবং মুমিন লোকেরা ধর্মবিরোধী সুন্নী, খ্রীস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাতে নির্যাতন ভোগ করবে। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব-উৎসব হবেই এবং এ প্রতিশ্রুত ইমাম উদয় হবেনই। সেদিন সব অন্যায় ন্যায় হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার সব মানুষ আল্লাহ্‌র সত্যধর্মে দীক্ষিত হবে। এই শীয়া পুস্তিকাখানির বক্তব্য এই যে, ততদিন পর্যন্ত শুধু মানুষের চেষ্টায়, কিংবা বিদ্রোহে, সংগ্রামে-সংঘর্ষে এই মহাসমাপ্তি আনয়ন করা অসম্ভবকাজ। যারা এই মতে বিশ্বাসী নয়, পুস্তিকাখানি তাদেরকে ধর্মীয় ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা করেছে। 'বর্তমানে যে-সব ভ্রষ্ট বিদ্রোহী হযরত মুহম্মদের বাণী জ্ঞাত নয় এবং সত্য থেকে দূরে চলে গেছে, তারাই বৃথা আশা করে ও বোকার মতো জিহাদের অর্থ ও কর্তব্য সম্বন্ধে কুতর্ক করে।' 'এই হিন্দুস্তানে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে মাত্র দু'টি মযহাবই ধর্মনিষ্ঠ---শীয়া ও সুন্নী। মুসলমানদের বাকী সম্প্রদায়---তা ওহাবী হোক কিংবা নিজেদেরকে ফারায়েযী ইত্যাদি যাই বলুক, সবাই সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং এজন্য তাদের উপর নির্ভর করা যায় না।' 'জিহাদ' শব্দের তিনটি অর্থ[১২] বুঝিয়ে দিয়ে পুস্তিকাটি নির্দেশ দেয় যে, 'জিহাদ যে অর্থে কাফেরদের সংগে ধর্মযুদ্ধ বুঝায়, তা ন্যায়সংগত হতে হলে সাতটি শর্ত পূরণ করতে হবে: প্রথম, যখন সত্য ইমাম উদয় হবেন ও জিহাদের হুকুম দেবেন। দ্বিতীয়, যখন যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও শিক্ষিত যোদ্ধারা প্রস্তুত থাকবে। তৃতীয়, যখন জিহাদ ঘোষিত হয় বিদ্রোহী ও আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে[১৩]। চতুর্থ, যখন মুজাহিদ হয় সজ্ঞান---পাগল অথবা জ্ঞানহীন, অসুস্থ, খোঁড়া

---

১২ (১) জিহাদ-ফিল্লাহ্, যথা---সব গৌরবের অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রশংসাকীর্তনে নিরলস নিষ্ঠা। (২) জিহাদ-বা-নফস্-ই-আমারা অর্থাৎ নিজের প্রবল রিপুগুলিকে জয় করে নিজের বশে আনা ও আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে নিয়োজিত করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা ও অপব্যয়ী না হওয়া। (৩) জিহাদ-ফিদ্-দ্বীন অর্থাৎ শরীয়তের বিধানমতে কাফেরদের সংগে যুদ্ধ করা।

১৩ হারব-ই-কাফির।

অথবা অন্ধ নয়। পঞ্চম, যখন সে পিতামাতার সম্মতি নিয়ে জিহাদে যায়। ষষ্ঠ, যখন সে ঋণমুক্ত হয়। সপ্তম, যখন সফরকালীন ও পথের সরাইখানার খরচ মেটাবার এবং আপন পরিবারের ভরণপোষণ করবার জন্য তার নিজস্ব যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকে।

মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার যৌক্তিকতা এবং তার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না করে শীয়াদের বড়ো শর্ত এই হলো যে, জিহাদ করতে হলে ইমামের উপস্থিতি প্রয়োজন। এখন, এই ধর্মীয় নেতার মুখ মানুষ এখনো চোখে দেখেনি। তিনি এখনো উদয় হননি, কিংবা মুমিনদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। অতএব তাঁর উদয় না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ঘোষণার যে-কোনো প্রয়াসই ধৃষ্টতামাত্র ও পাপ। পুস্তিকাটি বলে, 'কোন্ সময় এই মাসুম বা নিষ্পাপ ইমাম উদয় হবেন, একমাত্র সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ই জানেন, আর কেউ তা জ্ঞাত নয়। ইমামের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ব্যতিরেকে রক্তপাত করা শীয়া আইনে একেবারে নিষিদ্ধ। ইমামের নির্দেশ ব্যতীত যারা বিদ্রোহ করে, তারা রাজদ্রোহী ও মহাপাপী।'

উপরের উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে সুন্নীদেরকে আঘাত করা হয়েছে, কারণ তারা বারেবারে প্রকৃত ইমামের নেতৃত্ব ছাড়াই জিহাদ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া তাদের সংগে শীয়াদের বহু নির্যাতনের ও শহীদ হওয়ার হিসাব-নিকাশ বাকী আছে। তীরটি ছোঁড়া হয়েছে একটি নির্দোষ ও উদার মনোভাব দেখিয়ে যে, সারা দুনিয়া শেষ সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হবে, কিন্তু তার খোঁচাটি বিপক্ষ সম্প্রদায়কে বিঁধবে তীব্রভাবে। ভারতীয় সুন্নী ও শীয়ারা ইসলামের অন্তিম বিজয়ে সমান বিশ্বাসী, কিন্তু সুন্নীরা বিশ্বাস করে যে, অন্তিম সময়ে তারা রসূলের বিধি-বিধান সমগ্র-ভাবে পালন করবে এবং সারা দুনিয়াকে ইসলামের ছায়ায় আনয়ন করবে। অন্যপক্ষে শীয়ারা বিশ্বাস করে যে, যখন পূর্ণবিজয় সমাগত হবে, তখন তা হবে খ্রীস্টান ও ইসলাম দু'টি মহান ধর্মের সমন্বয়ে (যদিও তা এক পক্ষের অনুকূলে হবে)। কাল পূর্ণ হওয়ার মুখে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন সকল মহৎ ধর্মেই আছে। হিন্দুদের একটি 'ভবিষ্যৎ পুরাণ', যেটি এমন এক কালের ভবিষ্যদ্বাণী করে। সেখানে আছে যে, তখন সকল মানুষ এক ধর্ম ও এক জাতিতে বিধৃত হবে। এমন কি, যখন বৌদ্ধ

ধর্মের উপর গোঁড়ামির ধ্বজা তুলে বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়েছিল[১৪], তখনও এই কথাই স্বীকার করা হয়েছিল যে, আমরা কলিকালের যে শেষ পর্যায়ে উপস্থিত, সেখানে মানুষের আত্মার মুক্তিলাভ ঘটবে তার ধর্ম ও জাতির কারণে নয়, তার পবিত্র জীবন ও সৎকর্মের কারণে। শীয়া মুসলমানদেরও এমনই একটা চরম ভবিষ্যৎ শুভ মুহূর্ত আছে, যখন সব খ্রীস্টান শীয়া মতাবলম্বী হয়ে একত্র হবে এবং সম্ভবত তা হবে সুন্নী মতাবলম্বীদের রক্তপ্রবাহের উপর দিয়ে, যারা প্রথম প্রথম শেষ ইমামকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। উপরোক্ত পুস্তিকাটি বলে: আমাদের মুসলিম আইনে পরিষ্কার বিধান আছে যে, যখন উপরে বর্ণিত ইমাম উদয় হবেন, তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্-সালাম) চৌথা আসমান থেকে নেমে আসবেন এবং তখন এই দু'জন মহাপুরুষের মধ্যে শত্রুতার বদলে মিত্রতাই প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতএব এটা জানতে পেরে আনন্দ হয় যে, আমাদের মুসলমান প্রজাদের অন্ততঃ একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় তাদের ধর্মের মৌল নীতি অনুসারে মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য নয়। অন্য মুসলমানরা যাই করুক, ভারতীয় মুষ্টিমেয় শীয়ারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে যে, তারা আমাদেরকে তরবারির মুখে সুন্নৎ করানো কিংবা ক্রীতদাস হওয়ার মতো অপমানকর অবস্থায় পড়তে বাধ্য করবেন না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা অভিনন্দনযোগ্য হলেও আমি এ কথা ভুলতে পারি না যে, শীয়ারা ধর্মের সংগে আপোষরফার নীতি[১৫] মেনে চলে বলে বিধর্মীদের সংগে তারা যে অঙ্গীকারই করুক না কেন, একদিক দিয়ে সেটা খেলো হয়ে যায়। এক ইরান ব্যতীত সারা দুনিয়ায় তারা নির্যাতিত এবং অন্যান্য নির্যাতিত সম্প্রদায়ের মতো তারা শরীর বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ধর্মজ্ঞানে আপোষরফার এমন একটা নীতি মেনে চলে, যা অন্যের চোখে আপন ধর্ম অস্বীকার করার মতোই ঠেকে। এভাবে একজন শীয়া তীর্থযাত্রী মক্কায় আপন আত্মার অনিষ্ট না ঘটিয়ে একজন সুন্নী হিসেবে চলে যায়। সুন্নী উৎপীড়কদের হাতে সংগীন অবস্থায় পড়লে

---

১৪ সম্ভবতঃ ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ।

১৫ 'তাকিয়া' অর্থাৎ চাচা-আপন-বাঁচা নীতি।

শীয়ারা নিজেদের বিশ্বাসের বিশিষ্ট মতগুলি হয় এড়িয়ে যায়, নয়তো অস্বীকার করে। আর কঠিন বিপদে, যেমন হালফিল সিরিয়ায় এবং মাঝে-মাঝে ভারতে এই ধর্মীয় ছলনা-নীতির কৌশল তারা তাদের অতি স্নেহে লালিত মতবাদগুলি অস্বীকার করে, এমন কি তাদের বারো ইমামকে লানত বা অভিশাপও দিয়ে থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির আশ্রয়ে তারা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং নির্যাতনের দরুন কপট আচরণের প্রলোভন থেকেও বেঁচে গেছে। বিদ্রোহ করার বাধ্যবাধকতা না থাকার দরুন তাদের এই ঘোষণা স্বতঃস্ফূর্ত এবং এটাও উত্তম যে, এরকম একটি ঘোষণা লিখিত হয়ে রইলো। এ দলীল আমাদের নিকট এসেছে শীয়া সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নজীর দ্বারা মোহর-চিহ্নিত হয়ে এবং এজন্য এটি এই সম্প্রদায়ের সকলেরই পক্ষে চিরকাল অবশ্য পালনীয়। অবশ্য এ রকম আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞা ছাড়াও শীয়ারা স্বভাবতই রাজভক্ত, কারণ তারা বেশ জানে যে, ভারতে কোনকালে হিন্দুরা বা সুন্নী মুসলমানরা যদি ক্ষমতা হাতে পায়, তাহলে শীয়াদের ভাগ্যে নির্যাতনেরই দিন নেমে আসবে। সুন্নীরা তাদের বিজয়ের দিনে এ কথাটি ভুলবে না যে, ইসলামের অন্তিম বিজয় মুসলমান ও খ্রীস্টানরা সমানভাবে ভোগ করবে বলে যে ফতোয়াটি ঘোষিত, সেটি প্রচারিত হয়েছে অযোধ্যার পূর্বতন শাহের প্রাসাদ থেকে। কিন্তু পূর্বতন শাহের রাজভক্তি এবং যে দলের তিনি প্রতিভু, তাদের রাজভক্তি অতঃপর দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে শোভা পাবে, যখন মনে হবে যে, শীয়া সম্প্রদায়ের এই পুস্তিকার খোঁচাটা ওহাবীদের ও সুন্নীদের অন্তরে সমানভাবে জ্বালা দিয়েছে।

এখন আমি বৃহত্তম সম্প্রদায়ের প্রচারিত ফতোয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

সুন্নীরা পাক-ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যায় বৃহত্তম। সম্প্রতি তারা সজোরে ঘোষণা করতে শুরু করেছে যে, মহারানীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে তারা ধর্মতঃ বাধ্য নয়। এই উদ্দেশ্যে তারা দুইটি পৃথক দফায় ফতোয়া সংগ্রহ করেছে এবং কলকাতা সোসাইটি[১৬] এই প্রশ্নের জওয়াবে সমস্ত সুন্নী মতামত একটি বলিষ্ঠ ভাষায় লিখিত পুস্তিকায়

---

১৬ Calcutta Muhammadan Literary Society—নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর তার সেক্রেটারী ছিলেন—(অ)।

সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাঁরা বাঙালী মুসলমানদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে কিংবা আমাদের সরকারে তাদের বিচারবিভাগীয় পদসমূহে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁদেরকে আমি এই ক্ষুদ্র ইশ্‌তেহার-খানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এটি সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের একটি জয়স্তম্ভ, কারণ পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞা দিয়ে আরম্ভ করে দু'টি ত্র্যবয়বী যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে শেষে তা একই আকাঙ্খিত মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে। উত্তর-ভারতের আলেমরা আলোচনা শুরু করেছেন পরোক্ষে ভারতকে শত্রুর দেশ[১৭] ধরে নিয়ে এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জিহাদ অপ্রাসংগিক। কলকাতার আলেমরা ঘোষণা করেছেন যে, ভারত ইসলামের দেশ[১৮] এবং সেহেতু ধর্মীয় বিদ্রোহ এখানে বে-আইনী। এই মীমাংসা যেমন অর্থশালী মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেবে---কারণ আমাদের সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী বসতিতে চাঁদা আদায় দেওয়ার মতো বিপজ্জনক দায় থেকে তারা রক্ষা পাবে---তেমনই আমাদেরকেও তৃপ্তি দেবে এই প্রমাণ দেখিয়ে যে, শরীয়ত ও পয়গম্বরদেরকে যেমন রাজভক্তির স্বপক্ষে, তেমনই রাজদ্রোহের স্বপক্ষেও টানা যায়।[১৯]

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিত্তশালী মুসলমানদের জন্য নয়, গোঁড়া জনসাধারণের জন্যই দরকার এই ফতোয়ার। ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশান দ্বারা শাসন-কর্তৃপক্ষকে বহুধাবিস্তৃত ষড়যন্ত্র দমনের জন্য ধরপাকড়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্র গত বিশ বছর ধরে সারা বাংলায় ধুমায়িত হয়ে উঠেছে এবং সময়ে সময়ে আমাদের পাঞ্জাব সীমান্তে ভীষণ দাবানলে ফেটে পড়েছে। এখন এই ক্ষমতার দরুন রাজদ্রোহ নিয়ে খেলা করা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সুখী শ্রেণীর লোকেরা, এমন কি যারা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল, তারাও এখন একটা অজুহাত দেখিয়ে এই অপকর্ম থেকে দূরে সরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে খুশী হয়েছে।

---

১৭ দারুল-হরব্।

১৮ দারুল-ইসলাম

১৯ পুস্তিকাটির শিরোনামা ছিল 'কলকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে ১৮৭০ সালের ২৩শে নবেম্বর, বুধবারের সভার কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।' এটি মওলবী কেরামত আলী জৌনপুরী কর্তৃক শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রতি ব্রিটিশ ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য বিষয়ক প্রশ্নের উপর প্রদত্ত বক্তৃতা।

এরা এখন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখাবার জন্য এই ফতোয়াকে আনন্দের সংগে গ্রহণ করবে। তারা এ-সবের বৈধতা নিয়ে চুলচেরা পরীক্ষা করবে না, বরং কোমল বিবেকের উপর আরাম-দায়ক মলম হিসেবে এগুলিকে গ্রহণ করবে। এই সুখকর দাওয়াই কিভাবে তৈরী হলো, সে সম্বন্ধে তারা কোন বিরক্তিকর প্রশ্ন উথাপন করবে না। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি তার স্বদেশবাসী ও আমাদের অভিনন্দযোগ্য এবং তার সেক্রেটারী মওলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমাদের শাসিত ভারতের একজন সুন্নী মুসলমান তার ধর্মীয় মর্যাদা সম্বন্ধে যে ভাবই পোষণ করুক না কেন, এখন সে দেখতে পাবে যে, তার মতানুযায়ীও সে আর আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য নয়। সে কি মনে করে যে, ভারত এখনো দারুল-ইসলাম? তাকে ইশ্‌তেহারটির ষষ্ঠ পৃষ্ঠা খুলে পড়তে দাও এবং সে দেখতে পাবে যে, সেই কারণেই মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বে-আইনী। সে কি মনে করে যে, ভারত দারুল-হরব্ হয়ে গেছে? তা হলেও তাকে এগারো পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পাদটীকা পড়তে দাও; তাতে সে দেখবে যে, সে কারণেও বিদ্রোহ করা অপ্রাসংগিক।[২০]

অতএব আমি আমার পরবর্তী আলোচনাসমূহে নিশ্চয়ই এমন প্রবৃত্তির পরিহার করবো, যার দরুন মওলবী আবদুল লতিফ সাহেব এই ইশ্‌তেহারটি প্রকাশ করে যে উপকার করেছেন, তাকে কোন রকমে তুচ্ছ করা হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি উপযুক্ত অনুসন্ধান না করেই এরকম ভাবি যে, কলকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির অভিমতই সারা ভারতের মুসলমানদের অভিমত, তাহলে আমাদের পক্ষে গুরুতর রাজনৈতিক ভুল করা হবে। ওহাবী মযহাবের গোঁড়া মতবাদীদেরকে

২০ এখানে এবং এই অধ্যায়ের অন্য সব জায়গায় আমি কলকাতার 'ইংলিশম্যান্' পত্রিকায় কিছুকাল আগে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছি, সে-সবের সদ্ব্যবহার করেছি। তার বর্তমান ও ভূতপূর্ব সম্পাদকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই যে, গত সাত বছর ধরে তাঁরা আমার যে-সব প্রবন্ধ আগ্রহের সংগে ছেপেছেন, সেগুলিতে আমি আমার ধারণানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার ও তাহার দাবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

কোনো যুক্তি-তর্কের কথায় কর্ণপাত করানোর কোন আশা করা যায় না ; তবুও একদল ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান আছেন, যাঁরা শরীয়তী আইনের খাঁটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার দ্বারাই চালিত হয়ে থাকেন।

মানুষের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সাধারণতঃ একটা বড়ো ফাঁক দেখা যায়, বিশেষ করে যখন তার মতামতগুলি কার্যকরী করতে যেয়ে রাজদ্রোহে জড়িত হওয়ার বিপদ-সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিরা ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকেন এই ফাঁকটা পূরণ করতে এবং বিশ্বাসকে কাজে রূপায়িত করতে। এ-সব ব্যক্তি এখনো জিহাদ করার কর্তব্যটাকে কেবল একটা অবাঞ্ছিত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁরাই হলেন সীমান্তের বসতির আর্থিক সাহায্যের প্রধান অবলম্বন। অতএব তাঁদেরকেই শান্তির পথে ও রাজভক্তির দিকে টেনে আনা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই আমি সুন্নীদের ফতোয়াগুলির বিশেষ আলোচনা করতে চাই, যাতে অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের উপর সেগুলির প্রভাব বিস্তৃতির ধারা অনুসন্ধান করা যায় এবং যাতে যে-সব মুসলমানের জীবনের নীতি হলো ধর্মীয় কর্তব্যসমূহে সদাজাগ্রত থাকা ও বিপদের ভীতি বা স্বচ্ছন্দ জীবনের লিপ্সা থেকে মনকে প্রভাবমুক্ত রাখা, তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়। এক বৃহত্তর অংশ যে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে চোখ বুজে থাকা কোন কাজের কথা নয়। কারণ আমাদের মুসলমান প্রজাগণ গত পৌনে এক শতক ধরে একদল বিদ্রোহী বাহিনীকে সর্বদাই প্রস্তুত করে রেখেছে, প্রথমে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে এবং তারপর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের বিরুদ্ধে। সুদূর বাংলা দেশ থেকেও তারা সীমান্তের বসতির জন্য দলের পর দল সুসজ্জিত বাহিনী পাঠিয়েছে। প্রত্যেক গ্রাম, এমন কি প্রত্যেক পরিবারই তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে এবং জিহাদের জন্য চাঁদা দিয়েছে। আমাদের কারা-কপাটের অন্তরালে দলে দলে দুর্ভাগ্য বিপথগামী রাজদ্রোহী প্রবেশ করেছে। আদালতগুলি একের পর এক রাজদ্রোহী নেতৃবৃন্দকে শাস্তি দিয়ে সাগরপারের নির্জন দ্বীপান্তরবাসে পাঠিয়েছে। তবুও সমগ্র দেশটা বরাবর টাকা-পয়সা ও মানুষ যুগিয়ে চলছে আমাদের সীমান্তে ইসলামের ছিন্ন আশার উদ্দেশ্যে এবং ক্রমাগত রক্তক্ষরা প্রতিবাদ তুলছে খৃস্টান শাসনের বিরুদ্ধে।

এ-কথা বলতে আমি খুবই দুঃখিত যে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপজ্জনক শ্রেণীর উপর কলকাতা সোসাইটির ফতোয়ার প্রভাব একেবারে শূন্যের কোঠায়। ইশ্‌তেহারটি অবশ্য জিহাদের বিরুদ্ধে দু'টি পৃথক ধারার যুক্তি দেখিয়েছে—একটি হলো সোসাইটির নিজস্ব মত, আরেকটি হলো উত্তর-ভারতের আলেম-সমাজের প্রকাশ্য ফতোয়াগুলি। ফতোয়াগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে-সব ফতোয়া পৃথকভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমি এখনই দেখাবো যে, জিহাদের বিরুদ্ধে মুসলমান শাস্ত্রের লিখিত বাণী থেকেই সে-সবের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমেই দেখাবো যে, ইশ্‌তেহারটির অভিজ্ঞ রচয়িতাদের ভুলের জন্যই তাঁদের যুক্তিটা খোঁড়া হয়ে গেছে। ইশ্‌তেহারটির উদ্দেশ্য হলো এইটে প্রমাণ করা যে, ভারত দারুল-ইসলাম এবং 'সেহেতু' মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ করা বে-আইনী। বিশেষ লক্ষণীয় যে, 'সেহেতু' কথাটি প্রথম পাতার প্রশ্নের মূল বিষয়ীভূত বর্ণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও লক্ষণীয় যে, মক্কাশরীফের মুফতীদের ও মওলবী আবদুল হকের দুটি প্রধান ফতোয়ায় এই বলিষ্ঠ ঘোষণাই সীমিত হয়েছে যে, ভারত দারুল-ইসলাম এবং খুবই সাবধানতা সহকারে এই সিদ্ধান্ত টেনে আনা বাদ দেওয়া হয়েছে যে, 'সেহেতু' জিহাদ করা বে-আইনী। সত্যকথা এই যে, খাঁটি শরীয়তী আইনের বিধান মতে বিপরীত সিদ্ধান্তটাই হবে নির্ভুল এবং মক্কার মুফতীরা ফতোয়া দেওয়ার সময় এটি সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন যে, ভারত দারুল-ইসলাম এবং তারপর মুসলমানদের হাতেই এই সিদ্ধান্তে আসতে ছেড়ে দিয়েছেন যে, শুধু এই কারণেই তাদের উচিত, যুদ্ধ করে কিংবা অন্য উপায়ে সে-সব কাফিরকে তাড়িয়ে দেওয়া, যারা হুকুমাত দখল করেছে এবং শতেক রকমে সাবেক মুসলমান বাদশাহ্‌দের ধর্মীয় ও আইনসংগত অনুষ্ঠান ও বিধি-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করেছে[২১]।

ইশ্‌তেহারটির যুক্তি হলো, ভারত এখনো দারুল-ইসলাম, কারণ মুসলমান শাসন আমলেও তাই ছিল এবং যদিও এখন একটা বিধর্মী জাত দেশটাকে দখল করে ফেলেছে, তবুও যে-তিনটি শর্তে দেশটাকে শত্রুর

২১ প্রথম পরিশিষ্টে মক্কার ফতোয়া দেখুন।

দেশ (দারুল-হরব্ অর্থাৎ লড়াইয়ের ঘর) বলা যায়, সেগুলি এখানে প্রযোজ্য নয়। এই তিনটি শর্তের নির্দেশ দিয়েছেন শরীয়তী আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানদাতা ইমাম আবু হানিফা। কিন্তু ইশ্‌তেহারটি কোনো পুরাতন ও সর্বজনমান্য গ্রন্থ থেকে সেগুলির উল্লেখ করেনি; বরাত দিয়েছে বাদশাহ্ আওরংযেবের আমলে সংকলিত ফতোয়া-ই-আলম্‌গীরীর। এই গ্রন্থটি পূর্বেকার গ্রন্থগুলির মূলনীতি থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে, অথচ এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, আবু হানিফার নির্দেশিত ও পুরাতন বিধানপুস্তকগুলিতে সন্নিবিষ্ট শর্তসমূহ ভারতে প্রযোজ্য এবং খাঁটি শরীয়তী বিধান মতে ভারত নিশ্চয়ই দারুল-হরব্। আমি আইনের দু'রকম ব্যাখ্যাই নীচে পর পর তুলে দিচ্ছি এবং পাঠকের উপরেই বিচারভার ছেড়ে দিচ্ছি:

> একটা দেশ যে জন্য দারুল ইসলাম থেকে দারুল হরব্ বা শত্রুর দেশ হয়ে যায়, তার তিনটি প্রধান শর্ত:

ইশ্‌তেহারটির তৃতীয় পাতায় উল্লিখিত ফতোয়া-ই-আলমগীরী অনুসারে—

১। যখন কাফেরের হুকুমাত প্রকাশ্যে চালু হয় এবং ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিপালিত হয় না।

২। যখন দেশটি এমন দেশের সীমানায় পড়ে, যেটি দারুল-হরব্ এবং দারুল-ইসলামের কোনো শহর সেই দেশ ও দারুল-হরবের মাঝখানে পড়ে না।

৩। যখন কোনো মুসলমানের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না; কিংবা যিম্মী (যে বিধর্মী স্থায়ীভাবে মুসলমান হুকুমাতের বশ্যতা স্বীকার করেছে) ইসলামী হুকুমতের যে-সব শর্ত-সুবিধা ভোগ করতো, সে-সবও আর থাকে না।

ফতোয়া-ই-আলমগীরী ব্যতীত ইমাদীয়া প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থ অনুসারে—

১। যখন কাফেরের হুকুমাত প্রকাশ্যে চালু হয়।

২। যখন দেশটি এমন দেশের সীমানায় পড়ে, যেটি দারুল-হরব্ এবং সে দেশের ও দারুল-হরবের মাঝখানে কোনো দারুল-ইসলাম পড়ে না এবং দারুল-ইসলাম থেকে সে দেশে সাহায্য আনা যায় না।

৩। যখন মুসলমান কিংবা যিম্মী কারও 'আমান-ই-আওয়াল' থাকে না (এই কথাটির পারিভাষিক ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হবে)[২২]।

যে তিনটি শর্ত পুরাতন ও আরও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে নির্দেশিত হয়েছে, বর্তমানকালে সেগুলি ভারতে প্রযোজ্য[২৩]। তাতে দেখা যাবে যে, প্রথম শর্তটিতে ফতোয়া-ই-আলমগীরী আরও কতকগুলি শব্দ জুড়ে দিয়েছে। এগুলির নীচে রেখা টানা আছে। অথচ তাদের কোনো উল্লেখ পূর্বেকার গ্রন্থগুলিতে নেই, যদিও সেগুলিতে আবু হানিফার মত সরাসরিভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মূল বচনে শুধু নির্দেশিত হয়েছে, 'যখন কাফিরের হুকুমাত প্রকাশ্যে চালু হয়।' আর এই শর্তটি বর্তমান সময়ে ভারতে অবিসংবাদীরূপেই খাটে। প্রথমটিতে একাংশ সংযোগ করে ইশতেহারটি দ্বিতীয় শর্তটির একাংশ বর্জন করেছে। খাঁটি মূল বচন অনুসারে ভারত হলো দুশমনের দেশ। তার ও ইংলণ্ডের (যেটি দারুল-হরব্) মাঝখানে এমন কোনো দেশ নেই, যা ভারতে সাহায্য পাঠিয়ে এ দেশকে দারুল-হরবে পরিণত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারে। ইংলণ্ড যখন ভারত জয় করেছিল, তখন মাঝপথে শুধু দরিয়াই ছিল, আর 'হামাবী' ও 'তাহ্তাবী'তে উল্লেখ আছে যে, দরিয়া হলো দারুল-হরব্। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইংলণ্ড থেকে ভারতে আসার প্রথম পথে এবং এখনো প্রধান পথে কোনো দারুল-ইসলাম নেই, যেখান থেকে হিন্দুস্তানে

---

২২ এ-সব মূল বচন ও বিভিন্ন ফতোয়া সংগ্রহের জন্য এবং সুন্নীদের ইশ্তেহারটির যুক্তিসমূহ অনুধাবনের জন্য আমি কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক বুকম্যান সাহেবের নিকট ঋণী। তিনি এখনো ইউরোপে ভারতীয় পাণ্ডিত্যের একটি উজ্জ্বলতম রত্নহিসাবে গণ্য হন।

২৩ ইমাম আবু হানিফার মত ছিল যে, উপরে উল্লিখিত তিনটি শর্ত পূর্ণভাবে পালিত হলেই মুসলমানদের দেশ দুশমনের দেশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁর দুই শিষ্য 'সাহিবান' অর্থাৎ ইমাম মুহম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ এই মত পোষণ করতেন যে, তিনটির যে-কোনো একটি পালিত হলেই হবে। কলকাতার সুন্নীরা 'সাহিবান'-এর মতের চেয়ে আবু হানিফার মতই পুরাপুরিভাবে পোষণ করেছে (ইশ্তেহারটির চার পাতায়); কিন্তু আমি দেখবো যে, ভারতে এখন তিনটি শর্তেরই উদ্ভব হয়েছে এবং তার দরুন আবু হানিফার ও তাঁর শিষ্যদের মতে দেশটি দারুল-হরব্ হয়ে গেছে।

সাহায্য পৌঁছাতে পারে। মুসলমানদের দেশ কাবুল অবশ্য ভারতের সীমান্তে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের প্রশ্নের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার কারণ এই যে, আবু হানিফা শুধু দুটো দেশের মাঝপথে অবস্থিত দেশের কথাই বলেছেন এবং আরো বলেছেন যে, সেই দেশটিকে এই দু'টির একটি যাতে দারুল-হরবে পরিণত হতে না পারে সেই ব্যাপারে সাহায্য করার ক্ষমতা সেই দেশটির থাকা চাই। এখন এ কথা কেউ ভাববে না যে, কাবুল, ইংলণ্ড ও ভারতের মাঝপথে অবস্থিত কিংবা ভারতের মুসলমানদেরকে কোনো সাহায্য পাঠাবার ক্ষমতাও কাবুলের আছে।

কিন্তু সবচেয়ে দারুণ অপব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে ইশ্‌তেহারটির তৃতীয় শর্তের বর্ণনায়। এই শর্তটির সব শক্তি নির্ভর করছে 'আমান-ই-আউয়াল' শব্দের ব্যাখ্যার উপর। ইশ্‌তেহারটি তার তর্জমা করেছে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'। কিন্তু এ দু'টি কথার আসল ভাব মোটেই পরিষ্কার হয়নি। 'আমান' শব্দের সরল অর্থ নিরাপত্তা এবং 'জামি-উর-রুমুজ'-এ 'আমান-ই-আউয়াল' শব্দের যে পরিষ্কার অর্থ দেওয়া হয়েছে, তাতে বুঝায় 'সামগ্রীক ধর্মীয় নিরাপত্তা ও মর্যাদা, যা মুসলমানরা নিজেদের হুকুমতে ভোগ করতো'। এই প্রামাণ্য গ্রন্থখানি, যার গুরুত্ব কলকাতার সুন্নী মুসলমানরাও অস্বীকার করতে সাহস করবে না, বলে যে, একটা দেশ তখনই দুশমনের দেশ হয়ে উঠে, যখন (১) মুসলমানরা ও তাদের যিম্মীরা ততোটুকু মাত্র 'আমান' (ধর্মীয় মর্যাদা) ভোগ করে, যতটুকু বিধর্মীরা স্বেচ্ছায় তাদেরকে দান করে, (২) এবং যে ধর্মীয় পূর্ণ মর্যাদা নিজেদের হুকুমতে তারা ভোগ করত এবং শাসকের জাতি হিসেবে যে মর্যাদা তারা তাদের বিধর্মী প্রজাদেরকে ভোগ করতে দিতো, যখন সে সবের আর অস্তিত্ব থাকে না। এখন এ কথা পরিষ্কার যে, বর্তমান ভারতে দু'টি শর্তই খাটে। যে 'আমান' অর্থাৎ ধর্মীয় মর্যাদা বর্তমানে মুসলমানরা ভোগ করে, তা একান্তই তাদের খৃস্টান শাসকদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তারা ততোটুকু পরিমাণেই তা ভোগ করে, যা আমরা তাদেরকে দিতে ইচ্ছা করি। এই পরিমাণটা নিশ্চয়ই পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদার চেয়ে অনেক কম এবং যা তারা পূর্বে ভোগ করতো, তার চেয়ে কম তো বটেই। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের নিকট থেকে মাশুল আদায় করে এবং তা দিয়ে গির্জা বানায় ও পাদরীদের ভরণ-পোষণ করে।

পূর্বে জিলায় জিলায় ও সুবায় সুবায় যে-সব মুসলমান শাসক থাকতো, তাদের বদলে এখন ইংরেজদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই সরকার মুসলমান বিচারক ও কাযীর পদ একেবারেই তুলে দিয়েছে[২৪]। এখন শূকরের গোশ্‌ত ও মদ প্রকাশ্য বাজারে বিক্রী হয়। আদালতে এখন ইংরেজী ভাষা চালু হয়েছে[২৫]। মুসলমান কার্যবিধি ও ফৌজদারী আইন একেবারে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আইন পাস করে দুর্ভাগিনী পতিতা রমণীদেরকে রক্ষা করা হয়েছে[২৬]। এই সরকার এমন কোন ব্যবস্থা করেননি, যা শরীয়তী কানুন অনুসারে প্রত্যেক রাজা করতে বাধ্য; অর্থাৎ লোকে মসজিদে হাযির হয় কিনা ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে কিনা, তা তদারকের কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের বে-সামরিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান মুসলমানদের বে-সামরিক ও ধর্মীয় মর্যাদার সংগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমাদের আদালতের আরযিতে যে সব সীলমোহর দরকার হয়, তামাদি সংক্রান্ত আমাদের আইন-কানুন, অনাদায়ী টাকার উপর আমাদের জজদের সুদ আদায় দেওয়ার নির্দেশ এবং আমাদের সমস্ত আইন-বিষয়ক কার্যবিধি ও ধর্মীয় উদারতা সবই মুসলমানী আইনের বিপরীত এবং যে 'আমান' অর্থাৎ মর্যাদা আমাদের মুসলমান প্রজারা নিজেদের হুকুমতে ভোগ করতো, তার উপরে এ-সব হলো অন্যায় হস্তক্ষেপ। যিম্মীদের অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্যের খ্রীস্টান ও অন্যান্য বিধর্মী প্রজাদের ধর্মীয় মর্যাদাও কম পরিবর্তিত হয়নি। এখন আর খ্রীস্টানরা যিম্মী নয় কিংবা প্রজা নয়; তারা এখন ভারতবিজয়ী ও শাসকের জাত। হিন্দু যিম্মীরাও আর মাথা পিছু কর দেয় না[২৭]। আর তাদেরও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আমরা শতেক পরিবর্তন এনে ফেলেছি। যেমন অগ্নিপরীক্ষার বিচার রদ করেছি, সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছি, জাতিভেদ প্রথা উপেক্ষা করেছি এবং হিন্দু ধর্মত্যাগী খৃস্টানদেরকে আইনতঃ স্বীকৃতি দান করেছি[২৮]। এক কথায়, 'আমান-ই-আউয়াল' অর্থাৎ মুসলমান ও যিম্মী

---

২৪ ১৮৬৪ সালের ১১ নম্বর আইন। পরে এ বিষয়ে আরও বলা হবে।
২৫ Minutes of 1st. April, 1837 (অ)।
২৬ The Indian Contagious Deseases Act XIV of 1868.
২৭ জিযুয়া।
২৮ Act XXI of 1850—(অ)।

উভয়েরই ধর্মীয় মর্যাদার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, আর এভাবে আবু হানিফার নির্দেশিত তৃতীয় শর্ত মুতাবিক ভারত শত্রুর দেশ (দারুল-হরব্) হয়ে গেছে।

প্রশ্নটির সমাধান আগে বহুবার হয়ে গেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তা দেখানো যেতে পারে। যতোদিন গ্রীস তুর্কীদের অধীনে ছিল, ততোদিন সে দেশ ছিল ইসলামের দেশ। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্বে মুসলমানদের অধীনতা ত্যাগ করে গ্রীস এখন শত্রুর দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, যদিও সেখানে এখনো বহু মুসলমান বাশিন্দা আছে। এই মন্তব্যটি দানুবীয় বিভিন্ন প্রদেশ, দক্ষিণ স্পেন এবং এ রকম হকুমতের বিপ্লব যে-সব দেশে ঘটেছে, তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য। আবু হানিফার মশহুর শিষ্য ইমাম মুহম্মদ তাঁর 'মবসুতে' বিধানটি এভাবে দিয়েছেন: 'যখন ইসলামের দেশ বিধর্মীর করতলগত হয়, তখনো তা ইসলামের দেশ থাকে, যদি বিধর্মীরা মুসলমান শাসক ও মুসলমান কাযী বজায় রাখে এবং নিজেদের আইন-কানুন প্রবর্তন না করে।' আমরা মুসলমান শাসকদেরকে সরিয়ে দিয়েছি, মুসলমান কাযীর পদ তুলে দিয়েছি, আমাদের আইন-কানুনও প্রবর্তন করেছি। অতএব ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভারত আর ইসলামের দেশ থাকতে পারে না। ওহাবীদের আরম্ভ এই ঘোষণায় যে, ভারত শত্রুর দেশ হয়ে গেছে এবং তা থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, সেহেতু তার শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কলকাতার ইশ্‌তেহারটিতে প্রথম অবস্থা অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাতে প্রমাণ মেলে যে, ভারত শত্রুর দেশ হয়ে যায়নি, এখনো ইসলামের দেশ আছে। অবশ্য এভাবে বিষয়টিকে সপ্রমাণ করতে ইশতেহারটি ব্যর্থ হয়েছে এবং তার দরুন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের উপর এটি মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি; অথচ তাদেরকেই আমাদের সপক্ষে টেনে আনা সবচেয়ে বেশী দরকার। উত্তর ভারতের আলিমরা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তাঁরা ওহাবীদের প্রথম সূত্র অর্থাৎ ভারত আর ইসলামের দেশ নয়, অস্বীকার করেন না, কিন্তু তা থেকেই তাঁরা স্বীকার করেন না যে, জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

আমার বিশ্বাস, এটাই হচ্ছে উপস্থাপিত দুরূহ সমস্যার প্রকৃত সমাধান। ভারত যদি ইসলামের দেশ থাকতো, তাহলে ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য মনে করতো। যদি ভারত এখনো আইনতঃ ইসলামের দেশ থাকতো, তাহলে আমাদের মুসলমান প্রজাদের এই অংশটি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং কার্যকরীভাবে দেশটাকে ইসলামের দেশে পরিণত করতে বাধ্য হতো। সব বিধান গ্রন্থেই লিখিত আছে: 'যদি কাফেরেরা খুবই পীড়ন করে, কিংবা ইসলামের দেশের[২৯] কোনো শহর জয় করে নেয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী ও শিশুর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য[৩০] হয়ে পড়ে বিধর্মী শাসককে আঘাত করা ও বিতাড়িত করা'। এটি এমন অবিসংবাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত বিধান যে, রুশরা ইসলামের দেশের উপর হামলা করা মাত্রই বুখারার সুলতান তাঁর প্রজাদের দ্বারা রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ভারত যদি এখনো ইসলামের দেশ থাকতো, তাহলে প্রত্যেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণার নতুন নতুন যুক্তি উপস্থিত হতো। আমাদের ধর্মীয় উদারতাই হতো ফাঁসির যোগ্য অপরাধ। উদাহরণ হিসেবে (অপরাধের মারাত্মক কারণগুলি বর্ণনা না করে) বলা যায়, মুসলমান শাস্ত্রীয় মূলবচনের বিধান এই যে, ইসলামের দেশে কোনো শাসক বা সুলতান যদি ইসলামের সংরক্ষণের ও বিকিরণের দিকে লক্ষ্য না রাখেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আইনসংগত হয়ে যায়। আকবরের রাজত্বকালে যখন তিনি হিন্দুদের প্রতি উদারতা দেখানোর শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে মুসলমান-আইন সংশোধিত করতে চেয়েছিলেন, তখন বিদ্রোহ করার নির্দেশ দিয়ে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল এবং কয়েকটা রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহও হয়েছিল। যদি ভারত ইসলামের দেশ থাকতো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এখন আরও বেশী অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়তো। কারণ, তারা শতেক উপায়ে শরীয়তী আইনে হস্তক্ষেপ করেছে, মুসলমান কাযীদের উৎখাত করেছে এবং সমস্ত ইসলামী কার্যবিধিই রদ করে দিয়েছে। এজন্যই আমি

---

২৯ বিলাদ-উল-ইসলাম।

৩০ ফরয্-আয়েন।

মক্কার মুফতীদের ফতোয়া অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখি; যখন দেখি যে, এই ধর্মান্ধতার ও উৎকট অনুদার গোঁড়ামির ঘাটিটি ঘোষণা করছে, ভারত দারুল-ইসলাম; কিন্তু কলকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি যেমন তা থেকে সিদ্ধান্তে আসে যে, সেহেতুই বিদ্রোহ করা বেআইনী, তাঁরা নিজেরা সেরূপ কোনো সিদ্ধান্তে না এসে তাঁদের ভারতীয় স্বধর্মীদেরকে এই সিদ্ধান্তে আসার সুযোগ দিয়েছেন যে, 'সেহেতু বিদ্রোহ করাই ফরয।'

এসব সত্ত্বেও এক শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান আছে, যারা এ সিদ্ধান্তে আসবে না। তাদের নিকট এটাই হবে সান্ত্বনা যে, কলকাতা মোহামেডান সোসাইটির মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান মশহুর আলিমদের[৩১] যবানিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, ভারত এখনো ইসলামের দেশ এবং সেহেতু বিদ্রোহ অপ্রাসংগিক। কারণ খ্রীস্টানদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও নীতি নিয়ে বিরোধের অন্ত নেই। পাঠককে এই শ্রেণীটির অন্তরের ভাব হৃদয়ংগম করবার জন্য আমি নীচে উক্ত সভায় এক শ্রদ্ধেয় শেখ সাহেবের বক্তৃতা তুলে দিচ্ছি[৩২], কারণ তার উপরেই ভিত্তি করে ইশ্‌তেহারটি রচিত

---

৩১ মওলবী কেরামত আলী জৌনপুরী; শেখ আহমদ এফিন্দী-এল-আনসারী; মওলবী আবদুল হাকিম; তাছাড়া ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত ও বাস্তবজ্ঞানী মওলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর।

৩২ শেখ আহমদ এফিন্দী-এল-আনসারী মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত বাশিন্দা ও হযরতের সাহাবা আবু আইয়ুব-এল আনসারীর বংশধর। তিনি এই শহরে কিছুদিন আছেন। তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বলেন যে, তিনি সোসাইটির সভ্য নন; কিন্তু তিনি যখন উপস্থিত আছেন, তখন তাঁকে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে, তার সংগে মুসলমানদের দুনিয়াবী ও এবাদত বন্দেগী সম্পর্কিত বহু করণীয় কাজের বৈধতার প্রশ্ন জড়িত আছে। আর তাঁর নিজেরও, এদেশ সফরের দরুন ও বহু বছর এদেশে বাস করায় ব্যক্তিগত আচরণের প্রশ্নও জড়িত আছে।

সভাপতি বলেন যে, তাঁর বক্তব্য মহফিল আনন্দের সংগে শ্রবণ করবে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর মতামতেরও বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে।

শ্রদ্ধেয় শেখ সাহেব অতঃপর বলেন যে, তিনি বহু দেশে সফর করেছেন ও দু'বার কনস্টান্টিনোপলে গেছেন। সেখানে তিনি প্রথম যান খলীফা মরহুম সুলতান মাহমুদ খানের রাজত্বকালে এবং সেবারে তিনি সেখানে দু'বছর বাস

হয়েছে। নিছক ইউরোপীয় দৃষ্টিভংগির থেকে ইংরেজরা ভারতীয় সমস্যাগুলির অপব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু তারাও দেখতে পাবে যে, তাদের বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যার ছয়গুণ অধিক এশিয়াবাসী প্রজারাও সমান অজ্ঞতা ও সমান দুঃসাহসিকতা সহকারে ভারতীয় সংকটের মুকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিকে বাঁকাভাবে ব্যাখ্যা করতে বেশ পটু।

করেন। দ্বিতীয়বার তিনি যান বর্তমান খলীফা সুলতান আবদুল আযীয খানের সিংহাসনে আরোহণের পর এবং চৌদ্দ মাস বাস করেন। তিনিআরও গেছেন মিসরে, সিরিয়ায় ও এশিয়াস্থ তুরস্ক সাম্রাজ্যের বহু শহরে ও দীর্ঘকাল সে-সব জায়গায় বাস করেছেন। বর্তমান তিনি চতুর্থবার ভারত সফরে এসেছেন। প্রায় উনত্রিশ বছর পূর্বে তিনি এ দেশে প্রথম আসেন এবং নানা জায়গায় সাড়ে সাত বছর বাস করেন। তিনি দিল্লীতে আড়াই বছর ও লক্ষ্ণৌয়ে শাহের মেহমান হিসেবে থেকেছেন নয় মাস। তখন শাহ তাঁর প্রতি খুবই আতিথেয়তা ও ভদ্রতা দেখিয়েছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে থেকেছেন দু'বছর, তারপর গেছেন বরোদায়; সেখান থেকে গেছেন আফগানিস্তানে, এবং সে-দেশে সাড়ে চার বছর সফর করেছেন। তিনি আফগানিস্তানে সফর করেছেন কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর ভ্রাতার সাহচর্যে এবং কাবুলে থাকাকালে আমীরের মেহমান ছিলেন। তারপর তিনি দু'বার এসেছেন ভারতে; কিন্তু তখন শুধু দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ ও সিন্ধু দেশে কাটিয়েছেন। এবারে প্রায় দু'বছর হলো এদেশে এসেছেন এবং বোম্বাই, ভূপাল, রামপুর, এলাহাবাদ, পাটনা, গয়া সফর করে শেষে কলকাতায় হাযির হয়েছেন। এবারেও তিনি সর্বত্র সহৃদয়তার সংগে গৃহীত হয়েছেন, বিশেষ করে ভূপালের মহামান্য বেগম সাহেবা ও রামপুরের মহামান্য নওয়াব সাহেবের কাছে। সব জায়গায় তাঁরা যে সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা দেখিয়েছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁর এ-সব সফরের বিশদ বিবরণ দেওয়ার কারণ এই যে, এতে দেশ-দেশান্তরে সফর করে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মেছে, বিশেষ করে চারদফা ভারত সফর করে। তার দরুন আজকের সভার বিশেষ আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে পর্ববর্তী বক্তারা যে-সব উক্তি করেছেন, সে-সব সমর্থন যাচাই করে দেখার সুযোগ তাঁর আছে। বিশেষ করে তুরস্কের মহামান্য সুলতান ও ইংলণ্ডের মহামান্য মহারানীর মধ্যে যে বন্ধুত্বের কথা সম্পাদক সাহেব বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সত্য কথা এই যে, সুলতান ও বৃটিশ জাতির মধ্যে যে রকম নিবিড় সম্পর্ক আছে, সে রকমটি সুলতান ও দুনিয়ার আর কোনো জাতির মধ্যে নেই। বক্তা হালফিলের একটি ঘটনার কথা জানেন, যা সুলতান ও বৃটিশ জাতির

যা হোক, কলকাতার ফতোয়া ভুল হলেও বহু সুখী শ্রেণীর বিত্তশালী মুসলমানদের নিকট তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু উত্তর ভারতীয় আলিম সমাজের ফতোয়াটিই হবে আরও বেশী দরকারী। এটি ওহাবীদের মতো স্বীকার করে যে, ভারত শত্রুর দেশ এবং তা থেকেই তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মাফিক রায় দান করে যে, বর্তমান মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে অনুগত শান্তিপ্রিয় প্রজা হিসেবে বাস করা। তাঁদের ফতোয়াটি পারিভাষিক

মধ্যে গভীর আন্তরিকতা বজায় থাকা সপ্রমাণ করে। কিছুদিন পূর্বে মিসরের খেদিব সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ভাব দেখান। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং সুলতান ভীতিব্যঞ্জক কড়া সুরে খেদিবকে এক ফরমান পাঠান, যা পালন করলেই সুলতান খেদিবের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করতেন। খেদিবও তাঁর প্রভু সুলতানের কড়া হুকুম পালন করতে ইতস্ততঃ করছিলেন এবং হয়তো ফরমান মানতেনও না। কিন্তু তার পূর্বে খেদিব সুলতানের ফরমানটা ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের নিকট পাঠিয়ে দিলেন ও তাঁর পরামর্শ চাইলেন। তাঁকে সংগে সংগে পরামর্শ জানিয়ে দেওয়া হলো। ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল খেদিবকে জানালেন, তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা থেকে এই নির্দেশ পেয়েছেন যে, খেদিব যদি সুলতানের ফরমান না মানেন, তাহলে তিনি সংগে সংগে এথেন্সে অবস্থিত ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে তারবার্তা পাঠাবেন অনতিবিলম্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে উপস্থিত হতে। খেদিব এ-কথা শুনেই হতাশ হয়ে পড়লেন এবং, বিদ্রোহ করার সব খেয়াল উবে গেল। তিনি তখনই ফরমানের প্রভুত্বব্যঞ্জক ও অপমানকর শর্তসমূহ পালন করলেন এবং বিনয় ও রাজভক্তির পথ ধরলেন। এ থেকেই সুলতান ও ব্রিটিশ জাতির মধ্যে নিবিড়তম সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। ইংরেজরা পূর্বেও সুলতানের হয়ে তাঁর এক দুশমনের সংগে লড়েছে। এখন এক বিদ্রোহমনা গৃহ-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও জানালো। যদি সুলতান একাই খেদিবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে যথেষ্ট ছিলেন, তবুও ব্রিটিশ জাতি পছন্দ করেননি যে, সুলতান এভাবে বিপদগ্রস্ত ও হয়রান হবেন। এটা আরও লক্ষণীয় যে, ইংরেজরা সে সময় খেদিবের সংগেও মিত্রভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু খেদিব ছিলেন সুলতানের প্রতিনিধি পর্যায়ের, এজন্য ইংরেজরা খেদিবের বন্ধুত্ব উপেক্ষা করল সুলতানের স্বার্থরক্ষার্থে। সংক্ষেপে বলা যায়, তখন যদি ইংরেজরা খেদিবের সংগে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি না দেখাতো, তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, খেদিব সুলতানের সংগে শক্তি পরীক্ষায় সাহসী হতেন; আর তাহলে এরকম গৃহযুদ্ধের পরিণাম কি ভয়ানক হতে পারতো, সমাগত ব্যক্তিরা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি তৎপরতা দেখানোর ফলেই

বৈশিষ্ট্যময় এবং আমি পরিশিষ্টে সেটি উদ্ধৃত করেছি। [৩৩] এখন আমি বিষয়টির আরও আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক দিক আলোচনা করবো।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ঠিক সেই প্রশ্নই উঠেছিল, যেটা ভারতীয় মুসলমানদেরকে বর্তমানে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজিত করে তুলেছে। তখন বিধর্মী মারাঠারা ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্যে হামলা করেছিল। পূর্বে যে-সব প্রদেশ মুসলমান কিংবা তাদের সুবাহ্‌দার কর্তৃক শাসিত হতো, সেগুলি বিধর্মী রাজবংশ অধিকার করে ফেলে। তখনই অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের নিকট এই প্রশ্ন ওঠে ঃ অতঃপর বিজেতার অধীনে তাদের মর্যাদা কি এবং বিদ্রোহ করা অবশ্য কর্তব্য কিনা।

সুলতান ও খেদিব উভয়ই গৃহযুদ্ধের বিষময় পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে যান। ইসলামের সুলতানের এমন অকপট বন্ধুর সংগে যারা যুদ্ধ করতে চায়, তাদের চেয়ে ইসলামের বড়ো দুশমন আর কোথায় আছে? তারপর হলো, ব্রিটিশ ভারত দারুল-ইসলাম কিনা। সভায় পূর্বোক্ত বক্তারা যে-সব মূল বচনের উল্লেখ করেছেন সে-সব ছাড়াও মক্‌কা ও মদীনা শরীফের সবচেয়ে জ্ঞানী ও ধর্মনিষ্ঠ মুফতীরাও একটি ফতোয়া দিয়েছেন। বক্তার মতে, বিষয়টির উপরে এটিই যথেষ্ট দলীল, কারণ, সে-সব ধর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী এ-দেশের পরিস্থিতি সম্যক বিবেচনা করে ঘোষণা করেছেন, ব্রিটিশ ভারত দারুল-ইসলাম।

এই ফতোয়ার বলেই আরবের একজন বাশিন্দা নিশ্চিন্ত মনে এ-দেশে আসে এবং ব্রিটিশ শাসকদের নিকট থেকে বেসামরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার কোন ছাড়পত্র না নিয়েই যতোদিন খুশী, এ-দেশে বাস করে। এ-সব ছাড়া, বক্তা যখন উনত্রিশ বছর পূর্বে এদেশে প্রথম আসেন, তখন দিল্লীতে ও লক্ষ্ণৌতে শত শত ধর্মনিষ্ঠ আলিম বাস করতেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সংগেই বক্তার হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তাঁদের কারও মুখে তিনি শোনেননি যে, ভারত দারুল-হরব। তাঁরা সকলেই এ-দেশকে দারুল-ইসলাম জানতেন এবং তখনো দারুল-ইসলামে পালনীয় সব বিধি-বিধান এখানে পালিত হতো। বক্তার জ্ঞান মতে তখনকার দিনেও জুমার নামায ও দুই ঈদের নামায আদায় করা হতো। এমন কোনো পরিবর্তন তখন নযরে পড়েনি, যা থেকে এ-দেশের দারুল-ইসলামের চিহ্ন পরিবর্তিত হতে পারে।

অভিজ্ঞ শেখ সাহেব তাঁর ভারত সফরকালে এমন সব নিরীহ ভদ্রলোকের সাহচর্যে এসেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমান জনগণ তখন কোন্ পথে চলেছিল, সে বিষয়ে তাঁরা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন।

৩৩ দুই নম্বর পরিশিষ্ট দেখুন (অ)

তখন এরূপ মীমাংসা হয় যে, যেহেতু মারাঠারা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ[৩৪] নিয়েই সন্তুষ্ট ও শাসনকাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করে না, সেহেতু ভারত তখনও ছিল দারুল-ইসলাম। মারাঠারা সুবাহ্ থেকে মুসলমান শাসকদেরকে সরিয়ে দেয়নি। তারা মুসলমান কাযী বজায় রেখেছিল। একজন মুসলমান সুবাহ্দারের মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় মুসলমানই নিয়োগ করা হতো। বাস্তবিক, সুদূর মারাঠা রাজ-দরবারে একটা নযরানা আদায় দিয়ে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীর নিয়োগ অনুমোদন এক রকম দাবীর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এ সম্বন্ধে যে ফতোয়া দিয়েছিলেন[৩৫] তা হলো এই: এখন আলোচনা করা যাক, যখন ইসলামের দেশ বিধর্মীর হস্তগত হয়, কিন্তু তারা মুসলমানদেরকে জুমার ও দুই ঈদের নামায পড়তে দেয়, ইসলামের কানুন বলবৎ রাখে ও মুসলমানদের ইচ্ছানুসারে আইন পালনের জন্য কাযী নিযুক্ত রাখে, কিন্তু তবুও মুসলমানদেরকে প্রার্থনা করতে হয় বিধর্মীদের নিকট একজন মুসলমান শাসক নিয়োগ করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কালেই এমন এক দেশের অস্তিত্ব আছে, যেখানে বিধর্মীরা মুসলমান শাসক নিয়োগ করে এবং যেখানে এখনো জুমার ও দুই ঈদের নামায আদায় করা হয়। কারণ বিধর্মী মারাঠারা আমাদের কয়েকটি সুবাহ্ দখল করে নিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে আইন কি বিধান দেয়, তা জানা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

'সত্য কথা এই যে, এ রকম প্রদেশ বিধর্মীদের করতলগত থাকলেও ইসলামের দেশই থাকে। কারণ, তার পাশাপাশি বিধর্মীর আইন বলবৎ করা হয়নি, শাসকরা ও বিচারকরাও মুসলমান—তাঁরা ইসলামী কানুন

---

৩৪ চৌথ।

৩৫ এই ফতোয়াটির জন্য আমি পুনরায় ব্লুকম্যান সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তিনি এটি সংগ্রহ করেন একটি আরবী কিতাব থেকে। তার লেখক ছিলেন কাযী মুহম্মদ আলী, ইব্নে মুহম্মদ শেখ আলী, ইবনে কাযী মুহম্মদ হামিদ, ইব্নে মওলবী তকিউদ্দিন মুহম্মদ সাবীর—যারনুয়ার ওমরের বংশধর। বইখানির নাম 'আহ্কাম উল-আরাযী' অর্থাৎ রাজস্ববিষয়ক নির্দেশাবলী এবং দারুল-ইসলামে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির বিধান-পুস্তক।

মুতাবেকই বিচার করেন এবং বিধর্মীরা তাদের জন্যও সব বিষয়েই ইসলামী কানুন অনুসারে চালিত হয় এবং মুসলমান কাযীরা বিধর্মীদের উপরেও দণ্ডাদেশ দান করেন।'

ভারত মুসলমানদের দেশ হিসেবে বলবৎ থাকার যে-সব শর্ত এখানে দেখানো হয়েছে, বর্তমানে তার একটিও চলিত নেই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের অবস্থা পূর্ণভাবেই হৃদয়ংগম করেছিলেন আর এজন্য যখন তাঁরা প্রদেশগুলি করায়ত্ত করেন, তখন মুসলমান কানুনই দেশের আইন হিসেবে বলবৎ রেখেছিলেন, সে আইন প্রয়োগ করার জন্য মুসলমান কাযী নিয়োগ করেছিলেন এবং যতোই ছোট হোক বা যতোই বড়ো হোক, সব কাজই তারা করতেন দিল্লীর মুসলমান বাদশাহের নাম ব্যবহার করে। বাস্তবিকই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী শাহীন বা রাজগীর চিহ্ন ধারণ করতে এতোই ভয় পেতো যে, মুসলমান শাসনধারার অকথ্য দুর্নীতির দরুন মুসলমানদের দিয়ে দেশ শাসনের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরও তারা মুসলমান বাদশাহের নায়েব হিসেবেই শাসন কাজ চালাবার ভান করতো। শেষ পর্যন্ত কিভাবে এই ছলনাটুকুও লজ্জাকর প্রহসনে পরিণত হয়েছিল এবং কিভাবে আমরা দিল্লীর বাদশাহের নামেই তংকা জারী করতে শুরু করে দিলেও হতভাগ্য বাদশাহকে আমাদের বৃত্তিভোগী হিসেবে খানাপিনার জন্য মাসিক ভাতা বরাদ্দ করে দিতে হয়েছিল সে-সব হলো ইতিহাসের কথা।[৩৬]

এ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস সাধারণতঃ তাঁরাই লিখেছেন, যাঁরা কখনো এ-দেশে পদার্পণ করেননি।[৩৭] এজন্য ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর এই আশ্চর্য সংঘর্ষের গুঢ় কারণ ইংলণ্ডবাসী সঠিক অনুধাবন করতে

---

৩৬ ১৭৭৩ সালে বাদশাহের নাম সামান্য পরিবর্তন করে তংকায় এ---সব কথা লেখা হতো: 'বাদশাহ্ শাহ আলম, যিনি হযরত মুহম্মদের ধর্মের রক্ষক ও আল্লাহ্র প্রতিচ্ছায়া, এই তংকা জারী করলেন সাত দুনিয়ার জন্য'। উল্টো দিকে লেখা হতো: ''মুর্শিদাবাদে উনিশ বাৎসরিক সিংহাসনারোহনের কালে জারী'।

৩৭ মাশম্যান ও মেডোজ টেইলার সাহেব রচিত উপাদেয় গ্রন্থগুলি ব্যতীত। আর এলফিনিস্টোন সাহেব এ আমলের লেখক নন।

সক্ষম হবে, এ আশা করা অন্যায়। আসল সত্য এই যে, আমরা যদি এক দশকের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে হকুমতের ভার হাতে নিতে তাড়াহুড়া করতাম, তাহলে আমরা মুসলমানদের এরকম নিরন্তর বিদ্রোহের সম্মুখীন হতাম, যা ভীষণতার দিক দিয়ে ১৮৫৭ সালের মিউটিনির চেয়েও বিপজ্জনক হতো। তাহলে মুসলমানদের সামগ্রিক মর্যাদাই সহসা ওলটপালট হয়ে যেতো এবং তার দরুন আমাদের অবস্থাটা হতো একটা বিধর্মী রাজশক্তির, যারা মুসলমানদের দেশ অধিকার করেছে ও করায়ত্ত রেখেছে। তখন ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ সংখ্যার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কারণ আমি আগেই দেখিয়েছি যে, এরকম অবস্থায় প্রত্যেক নর-নারী ও শিশুর কর্তব্য হচ্ছে, বিধর্মী রাজাকে আঘাত করা ও বিতাড়িত করা।[৩৮]

এই বিপজ্জনক অবস্থা এড়ানো গিয়েছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রশংসনীয় সংযমের ফলে, মুসলমান রাজশক্তিকে ধীরে ধীরে লয় পেতে দেওয়ায় ও এক মুহূর্তেই তার মৃত্যু না ঘটানোর ইচ্ছার দরুন। ভারত ইসলামের দেশ থেকে শত্রুর দেশে[৩৯] পরিণত হয়েছে ক্রমে ক্রমে ও একান্ত অগোচরে। বহু বছর ধরে আমি কেন্দ্রীয় ও জিলা সমূহের মহাফেযখানায় অধ্যয়ন করেও এমন কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট হতে পারিনি, যেখানে আঙুল দিয়ে দেখানো চলে যে, অমুক বিশেষ বৎসর বা দশক থেকে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা বহু পূর্বেই মুসলমান বাদশাহ্‌দের নামমাত্র ক্ষমতায় এতোটুকু হস্তক্ষেপ না করেও অধস্তন মুসলমান শাসকদের সরিয়ে ফেলেছি। বহু বৎসর ধরে এই নামমাত্র ক্ষমতাটা প্রহসনে পরিণত হওয়ার পরেও এবং বাস্তবপক্ষে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত, আমাদের তংকা জারী চলতো বাদশাহের নামাংকিত হয়ে।[৪০] আর আমাদের তংকায় ব্রিটিশ রাজার ছবি আঁকা শুরু করার পরেও আমরা মুসলিম কার্যবিধির বহুলাংশ মুসলিম

---

৩৮ ইমাম মুহম্মদ রচিত 'মবস্থত'

৩৯ অর্থাৎ দারুল-ইসলাম থেকে দারুল-হরবে।

৪০ কোম্পানীর টাকা ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ রাজার মাথার ছবি ধারণ করে ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নামাংকিত হয়ে জারী হয়।

সরকারী ভাষার[৪১] সংগে চালু রেখেছিলাম। এগুলি নিজের থেকেই ক্রমে ক্রমে লয় পেয়ে যায়। কিন্তু ১৮৬৪ সালেই আমরা সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, আমার মতে অবিবেচকের পদক্ষেপ গ্রহণ করি ও ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাস করে কাযীর পদ তুলে দিই।[৪২] এই আইনটাই এ-দেশকে নতুন সাম্রাজ্য হিসেবে শত্রুর দেশে পরিণত করার কাঠামোর উপর শেষ রঙ বুলিয়ে দিল, যার পুনর্নিমাণ কার্যে আমরা বুদ্ধিমানের মতো ঠিক একশো বৎসর ব্যয় করেছি (১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত)।[৪৩] মুসলমানদের শাসনধারা যেমন একদিকে অলক্ষ্যে লয় পেতে লাগলো, তেমনি আমাদের মুসলমান প্রজাদের পক্ষেও নতুন নতুন দফায় কর্তব্য গজাতে লাগলো। এভাবে ভারত সামগ্রিক-ভাবে শত্রুর দেশে পরিণত হওয়ার পূর্বে ইসলামের দেশের বাশিন্দা হিসেবে মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য সমূহও বিলীন হয়ে গেল। আমি আগেই বলেছি যে, এ-সব কর্তব্যের মধ্যে একটি হলো বিধর্মী বিজেতার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। কিন্তু যখন পরিবর্তনই হয়ে গেল, তখন নতুন দফায় দায়িত্বও এসে গেল। মুসলমানদের অবস্থারও সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে গেল। বর্তমান পুরুষ এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। দেশের মালিক হিসেবে থাকার পর সহসা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং পুনর্দখলের দায়ে পতিত হয়ে তারা এখন আইনের পরিভাষায় হয়ে পড়েছে 'মুসতামিন' অর্থাৎ আশ্রয়ের ভিখারী। তার দরুন তারা ইংরেজ প্রভুদের নিকট থেকে কিছু পরিমাণ বেসামরিক ও ধর্মীয় সুবিধা (আমান) পেয়ে থাকে। তারা অবশ্য মুসলমান শাসন আমলের পূর্ণ মর্যাদা[৪৪] পায়নি, কিন্তু যা পেয়েছে, তা তাদের আত্মার নিরাপত্তা ও তাদের জান-মাল রক্ষার জন্য যথেষ্ট। এখন তাদের ব্যক্তিগত নামায

৪১ অর্থাৎ ফার্সী ভাষা (অ)।

৪২ ১৮৬৪ সালের ১১ আইন।

৪৩ ১৭৬৫ সালে হয় মীরজাফরের মৃত্যু, কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সনদ লাভ, এলাহাবাদের সন্ধি এবং বাংলার গবর্ণর হিসেবে ক্লাইভের নিয়োগ---(অ)।

৪৪ ফতোয়া-ই-আলমগীরী ব্যতীত সিরাজীয়াহ্, ইবাদীয়াহ্ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আমান-ই-আউয়াল।

বা উপাসনা অনুষ্ঠানে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় না। আর তাদের ধর্মীয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলিও[৪৫] যথারীতি রক্ষিত হয়। এ রকম ধর্মীয় ও বেসামরিক স্বাধীনতা (আমান) যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ করার প্রতিদানে তারা এখন পঞ্চাশ বছর পূর্বের তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই আমাদের প্রজা হওয়ার অবস্থা মেনে নিয়েছে। অতএব যে-সব প্রামাণ্য মূলবচন তাদেরকে পূর্বে ইসলামের দেশের বাশিন্দা হিসেবে বিধর্মী আক্রমণকারীকে বাধা দিতে বাধ্য করতো, এখন শত্রুর দেশের বাশিন্দা হিসেবে সে-সব বিধিই তাদেরকে বাধ্য করবে বিধর্মী রাজার সংগে শর্তসমূহ পালন করতে ও তাঁর প্রজা হিসেবে শান্তির সংগে বাস করতে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ ঘোষণার কর্তব্যটাই ফুরিয়ে গেছে। সমকালীন মুসলমানরা ধর্মীয় বিধান অনুসারে বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতেই বাধ্য। তারা নিজেরা এর জন্য দায়ী নয় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে ও বিদ্রোহের দরুন যে ভীষণ বিপদ তাদের ইসলাম ধর্মে উপস্থিত হতে পারে, সে-সব বিবেচনা করেই তারা অস্ত্রধারণ করতে নিবৃত্ত হয়েছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্ভব হয়েছে, তা অনুসরণ করে যেতে তারা বাধ্য এবং যতোকাল আমরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্যাদি পালন করাবর মতো তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা (আমান) দিতে পারবো, ততোদিন তারা আমাদের প্রজা হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করতেও বাধ্য।

অবশ্য ইংরেজ শাসকরা যদি এই অলিখিত চুক্তি ভংগ করে এবং তাদের নামাযে হস্তক্ষেপ করে; কিংবা প্রকাশ্যে ইবাদত-বন্দেগীতে, মুসলমান প্রজাদের আরও বহুবিধ ন্যায়সংগত আচার-অনুষ্ঠানে কিংবা মসজিদ নির্মাণে, হজে যাওয়ায়, ওলি-দরবেশের মাযার যিয়ারতে ও পারিবারিক ইসলামী কর্তব্য পালনে কোনো রূপ বাধা দেয়, তাহোলে বিদ্রোহ করা নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত হবে। আর যদি সেরকম পরিস্থিতিতে

---

৪৫ ওয়াকফ্, খানকাহ্, মাদ্রাসা প্রভৃতি। হান্টারের এই উক্তি যে কত মিথ্যা, তাঁরই লিখিত চতুর্থ অধ্যায়ে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বিশেষতঃ হুগলীর হাজী মোহসীন কৃত ওয়াক্‌ফের আলোচনা প্রসংগে তা প্রমাণিত হয়েছে—(অ)।

আইনসংগত হলেও বিদ্রোহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে সামগ্রিক ভাবে হিজরত করা প্রত্যেক ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। যে-সব কারণে হিজরত করা দরকার হয়ে ওঠে, সে সবের বিধান দিয়েছেন শাহ্ আবদুল আযীয এবং শরীয়তের গ্রন্থেও রয়েছে সে সবের সুস্পষ্ট নির্দেশ।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি দেখাবো, হালফিল সে-সব শর্ত আমদানী করতে আমরাই বিপজ্জনক খাত খনন করেছি। কারণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য আমাদের মুসলমান প্রজাদের তাদের শাসকদের প্রতি কি কর্তব্য আছে শুধু এই দেখানোই নয় শাসিতের প্রতি শাসকের কর্তব্য সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল করানোও এর একটা উদ্দেশ্য। উত্তর ভারতের আলিমদের ফতোয়াটা, যে সম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছি, নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যাদের সদিচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া সবচেয়ে বেশী দরকার। কিন্তু এটা তাদের নিকট মাত্র ততোদিনই অর্থপূর্ণ হবে, যতোদিন আমরা তাদের অধিকার ও ধর্মীয় দাবীগুলি রক্ষা করে চলবো। এখন প্রত্যেকটি ওহাবী ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের একটা বৃহৎ অংশ, ভারতকে মনে করে শত্রুর দেশ। কিন্তু তাদের মধ্যেও বিবেকসম্পন্ন গরিষ্ঠ অংশ, বর্তমান হতাবস্থার জন্য হায়-আফসোস করলেও, পরিস্থিতির উপযুক্ত কর্তব্যপালনে ইচ্ছুক। সমগ্র কুরআন শরীফ এই ধারণার উপর নির্ভরশীল যে, মুসলমানরা হলো বিজেতার জাতি, বিজিতের নয়। আমি পূর্বেই দেখিয়েছি, বহু পূর্বে কুরআনকে দেখা গেছে, বেসামরিক নীতির প্রয়োজন পূরণের পক্ষে উপযুক্ত নয়, আর তার দরুন মুসলমান জাতিসমূহের চাহিদা পূরণার্থে তা থেকে একটা আইনতন্ত্র ও সাধারণ আইন ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছে। আমাদের মুসলমান প্রজাদের নিকট থেকেও কোনো রকম সোৎসাহ রাজভক্তি আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু আমরা যুক্তিসংগতভাবে এ আশা করতে পারি যে, যতোদিন আমরা তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করবো, ততোদিন তারাও যে অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের বর্তমানে এনে ফেলেছেন সেটা মেনে নিয়ে আমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে।

আলিম-সমাজের মধ্যে যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁরা বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদায় একটা পরিবর্তন আসছে,

সে পরিবর্তনটা এখন কাজে পরিণত হয়েছে। সময়ে সময়ে ফতোয়া জারী হয়েছে এবং সে-সব থেকে দেখা যায় যে, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভীরু সংকোচ সত্ত্বেও এই বিপ্লবটা একেবারে অলক্ষিত থাকেনি। এ-সব ফতোয়ার একটা ঘোষণা এই যে, ভারত ততোদিন দারুল-ইসলাম থাকবে, যতোদিন মুসলমান বিচারকেরা, যাঁদের পদ আমরা বর্তমানে তুলে দিয়েছি, শরীয়তী আইন প্রয়োগ করতে থাকবেন। এ-সব ফতোয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দু'জনের ফতোয়া—শামসুল্ হিন্দ্ শাহ আবদুল আযীযের এবং তাঁর ভাইপো শাহ আবদুল হাই-এর। আমরা যেমন ক্রমে ক্রমে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে লাগলাম, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরাও আমাদের সংগে তাদের সম্বন্ধ কি রকমের হবে তাই নিয়ে প্রবল আন্দোলন তুলতে লাগলো। এজন্য তাঁরা বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বিধানদাতাদের উপদেশ চাইলো এবং উপরোক্ত দুই দেশমান্য আলিম তাঁদের অভিমত জানালেন। এখানে তাঁদের ফতোয়াগুলি অক্ষরে অক্ষরে তুলে দেওয়া হলো।

শাহ আবদুল আযীয ঘোষণা করলেন: কাফিরেরা যখন মুসলমানদের দেশ দখল করে ফেলে এবং সে-দেশের মুসলমানদের পক্ষে ও নিকটবর্তী জাতির পক্ষে বিজয়ী কাফিরদেরকে বিতাড়িত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে কিংবা কোন কালেও এরকম বিতাড়নের ভরসা না থাকে; আর কাফিরদের এরকম শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে যে, তারা খেয়ালখুশী মতো ইসলামের বিধি-বিধান লোপ করে দিতে পারে কিংবা চালু থাকতেও দিতে পারে এবং দেশের মুসলমানদের কারও এমন শক্তি থাকে না যে, কাফিরদের বিনা হুকুমে দেশের খাজনা আদায় করতে পারে; কিংবা মুসলমান বাশিন্দারা নিজেদেরকে আর নিরাপদ ভাবতে পারে না—তখন রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায় সে দেশকে বলা হয় দারুল-হরব।

আমরা যখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলাম, তখন আলিম-সমাজের ফতোয়াও আরো পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, ভারত দারুল-হরব। মওলবী আবদুল হাই ছিলেন আবদুল আযীযের পরের পুরুষ। তিনি পরিষ্কার ফতোয়া দিলেন: কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত খ্রীস্টানদের সাম্রাজ্য এবং হিন্দুস্তানের অতি পাশাপাশি অবস্থিত দেশগুলি (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ) সবই শত্রুর দেশ (দারুল-হরব); কারণ সর্বত্রই

পৌত্তলিকতা (কুফ্‌র ও শির্‌ক) বলবৎ হয়ে গেছে এবং আমাদের শরীয়তী আইন আর প্রতিপালিত হয় না। যখনই কোনো দেশে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখনই সে দেশকে বলা হয় দারুল-হরব। সে-সব দীর্ঘ শর্ত এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু বিধানদাতাদের সর্ববাদীসম্মত অভিমত হচ্ছে এই: কলকাতা ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ শত্রুর দেশ (দারুল-হরব্)।

এ-সব ফতোয়ার সত্যিকার ফল ফলেছে। ওহাবীদের ধর্মোৎসাহ জ্ঞানের চেয়ে বেশী এবং তারা ভারতকে শরীয়তী পরিভাষায় শত্রুর দেশ ধরে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবশ্য কর্তব্য। যে-সব মুসলমান আরও শিক্ষিত, তাঁরা দুঃখের সংগে এ অবস্থাটা মেনে নিলেও এটাকে বিদ্রোহ করবার কারণ হিসেবে গ্রহণ করে না, ধর্মীয় সুবিধার সংকোচন হিসেবেই গ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ইসলামের দেশে ধর্মীয় মর্যাদা পূর্ণভাবে উপস্থিত বলেই জুমার নামায আদায় অবশ্য কর্তব্য। ভারতে শুধু বহু ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান এই নামায আদায় থেকে বিরত থাকে না, বহু মসজিদে এই নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না। এভাবে কলকাতার দু'জন অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান, যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে খুবই মশহূর, অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসার সাবেক প্রধান অধ্যাপক[৪৬] এবং সাবেক প্রধান কাযী[৪৭] জুমার নামায থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা ভারত কে শত্রুর দেশ হিসেবে মেনে নিয়ে এইটুকুকে ধর্মীয় অধিকারের হ্রাস হিসেবে মনে করতেন। তবু তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের রাজভক্ত ও মান্যবর কর্মচারী হিসেবেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। বহু মুসলমান ভারতের হতাবস্থা মেনে নিলেও জুমার নামায আদায়ের মানসিক সান্ত্বনাটুকুও ত্যাগ করতে চায় না। তাছাড়া আরও একদল মুসলমান আছে, যারা ওহাবীদের সংগে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যদি তারা দেখে যে, তার দ্বারা তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। উত্তর ভারতের আলিম-সমাজ হালফিল যে-সব ফতোয়া জারী করেছেন এবং সে-সবের যা

৪৬ মওলবী মুহম্মদ উজীহ।

৪৭ কাযী-উল্-কুযাত ফজলুর রহমান।

ঐতিহাসিক বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, সে-সব হাযার হাযার ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানকে সান্ত্বনা দেবে।

মুসলমান সম্প্রদায়কে যে-সব আলোচনা এতোদিন ধরে উত্তেজিত করেছে, সে সবের পরেও আমাদের শাসনে তাদের মৃদু সম্মতি হয়তো মনে হবে খুবই অল্প ফলদায়ক, কিন্তু পরমত-অসহিষ্ণু ইসলামের একজন অকপট অনুসারীর কাছে এটাইতো সর্বাধিক সম্মতি। অবশ্য খ্রীস্টানদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও পুরোপুরি বিবেকবান মানুষের সংখ্যা খুবই কম, আর একদল ইহলোক-সর্বস্বমনা লোক বরাবরই প্রতিষ্ঠিত সরকারের সপক্ষে থাকে। হিন্দু কিংবা মুসলমান হোক কোন তরুণই আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষাতয়নগুলি থেকে বের হওয়ার সময় অন্ততঃ পৈতৃক ধর্মকে অবিশ্বাস করার শিক্ষা না নিয়ে বেরোয় না। এশিয়ার বহুবর্ধিত ধর্মসমূহ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের হিমকঠিন বাস্তবতার সংস্পর্শে এলেই শুক্‌নো কঞ্চির মতো কুঁকড়ে যায়। আর উঠ্‌তি পুরুষের সংশয়বাদীরা ছাড়াও একদল সুখী শ্রেণীর লোক আছে, যারা ধর্মবিশ্বাসে শিথিল হলেও ধনসম্পদে পুষ্ট এবং নামাজ পড়ে, সাজগোজ করে মসজিদে যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামায় না। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে আমাদের প্রয়োজনে লাগলেও আমার নিকট এটা সব সময়েই অপ্রকাশনীয় বেদনার ব্যাপার রয়ে গেছে যে, ভারতে আমাদের অবস্থান প্রশ্নে সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তিরা আমাদের পক্ষে নেই। এ পর্যন্ত তাঁরা অটলভাবে আমাদের বিরুদ্ধে থেকেছেন। অতএব এটা সামান্য ব্যাপার নয় যে, এই নিরন্তর শত্রুতার ভাবটা অধুনা অবশ্য কর্তব্যের দায় থেকে দূরীভূত হয়েছে। আমরা এখনো তাদের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী যা আশা করতে পারি, সেটা হলো বাধা না দেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায়বান সরকার তাদের মৃদু

সম্মতির উপরই বরং অধিক নির্ভয়ে নির্ভর করতে পারে, কারণ তার পেছনে আছে ধর্মীয় কর্তব্যবুদ্ধি। কিন্তু অন্য পক্ষের সে-সব রাজভক্তিতে আদৌ নির্ভর করতে পারে না, কারণ স্বার্থোদ্ধারের স্থিতিহীন প্রেরণাই তার উৎস[৪৮]।

৪৮ সরকার যদি পরিণামদর্শীর মতো আলিম-সমাজের নিকট প্রকৃত চূড়ান্ত-ভাবে বিষয়টা উপস্থিত করতে চেষ্টা করতেন, তাহলে নীচের প্রশ্নটি এই আলিমদেরকে স্থায়ীভাবে কোনো একদিকে বেঁধে ফেলতে পারতো। সুখের কথা এই যে, বর্তমানে এমন কোনো কার্যসূচীর দরকার নেই; কিন্তু যদি কখনো প্রকাশ্যে রাজভক্তির পরীক্ষাটা দরকার হয়েই ওঠে, তাহলে প্রশ্নটার চরম রূপ হবে এই:

প্রশ্ন—ওলামায়ে ও ফোকাহায়ে দ্বীন, নীচের সওয়াল সম্বন্ধে আপনাদের ফতোয়া কি? ব্রিটিশ জাতির অধিকারে থাকাকালে যদি কোনো মুসলমান সুলতান ভারত আক্রমণ করেন, তাহলে কি মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে পড়ে ইংরেজদের 'আমান' ত্যাগ করা ও আক্রমণকারীকে সাহায্য করা?

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের প্রতি অবিচারঃ

ভারতের মুসলমানরা তাদের কানুন অনুযায়ীই আমাদের শাসনে শান্তিতে থাকতে বাধ্য; কিন্তু তাদের এ বাধ্যবাধকতা ততোক্ষণ থাকবে যতোক্ষণ আমরা চুক্তির আমাদের অংশটা পালন করবো এবং তাদের অধিকার ও ধর্মীয় মর্যাদাসমূহ মেনে চলবো। আমরা যদি একবার তাদের বেসামরিক ও ধর্মীয় মর্যাদা (আমান্) লংঘন করি এবং তার ফলে তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালন ব্যাহত হয়, তাহলে তাদের কর্তব্যও শেষ হয়ে যায়। আমরা নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারি, কিন্তু অনুগত হওয়ার দাবী করতে পারিনে। অবশ্য ভারতে ইংরেজের একটা গৌরব হচ্ছে, তারা সাবেক সকল বিজেতার অনুসৃত সামরিক নীতি বদলিয়েছে; এখন বেসামরিক সরকার কার্যকরী হয়েছে ও জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করছে। মুসলমানদের উপর কোনো মারাত্মক অন্যায় করলে এরকম সরকার অচল হয়ে পড়বে। অনেক ছোটখাটো অভিযোগও রাজনৈতিক মারাত্মক ভুলের দরুন গুরুত্ব পেয়ে থাকে—এক্ষেত্রে সেরূপ মারাত্মক ভুলের জন্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের সংগে রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং তাদেরকে রাজদ্রোহে ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত করাতে পারে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ভারত সরকার বহুক্ষেত্রে এরকম মারাত্মক ভুলের জন্য দায়ী। কিন্তু আমাদের ভুল-ভ্রান্তির বিষয়ে আলোচনা করবার আগে এ-কথা বিশেষ পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, আমার আলোচনাগুলি সেই সব মুসলমানের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যাঁরা কেবল শান্তিতে ইংরেজ শাসন মেনে নিয়েছেন। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে—আমাদের সীমান্তে একটি স্থায়ী বিদ্রোহী বসতী আছে এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নিরন্তর ষড়যন্ত্র চলছে। ইংরেজ সরকার সশস্ত্র বিশ্বাসঘাতকদের সংগে কোনো সন্ধি করতে পারেন না।

যারা অস্ত্রের সাহায্য নেয়, তারা অবশ্য অস্ত্রের মুখে ধ্বংস হবে। হের তুফ্‌সড্রকের বর্ণিত আল্পস্ পাহাড়ের কুটিরবাসীর উপমা এখানে উল্লেখযোগ্য—শক্তির মাঝেও যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এ কথাটির প্রয়োগ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অর্থনৈতিক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, যে মুহূর্তে ইংরেজ এদেশে ন্যায়ের সপক্ষে যুদ্ধ করতে অক্ষম হবে, তখনই জাহাজ ধরবার জন্য কোন নিকটস্থ বন্দরে পলায়ন করাই তার পক্ষে সুসংগত হবে।

আমাদের শাসনাধীন এলাকার বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি অপক্ষপাত বিচার করতে হবে—কিন্তু সে ন্যায়বিচারে দয়া-মায়া থাকবে এবং যে-সব সরল বিশ্বাসী মানুষ তুচ্ছ কারণে বিদ্রোহী হতে বাধ্য হয়নি, সে-সব কারণ হেতু শাস্তির কঠোরতা কতোখানি লঘু হওয়া উচিত সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অন্যায় প্রতিরোধের জন্য আইন-পরিষদ শাসন-বিভাগকে গ্রেফতার করবার ক্ষমতা দিয়েছে। দুর্বৃত্তদলের নেতাগণকে এখন কয়েদ করা হয়েছে, তারা আর সাধারণ সমক্ষে নিজেদের মত জাহির করে বাহাদুরী নেওয়ার সুযোগ পায় না। এমন কি, যারা আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পেয়েছিল, তারাও সরকার কর্তৃক অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পা লাভ করেছে এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমান সমাজে ফিরে এসে বর্তমানে ওহাবী আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। পাইকারী হারে ফৌজদারীতে সোপর্দ করে এই ষড়যন্ত্র নির্মূল করার চেষ্টা করা হলে অন্ধবিশ্বাসীদের কর্মব্যগ্রতায় ঘি ঢেলে দেওয়া হবে এবং তার ফলে সত্যিকার ধর্মভীরু মুসলমানগণের সহানুভূতিও তাদের দলেরই সপক্ষে দেখা যাবে। এতোটুকু প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না নিয়ে অসন্তুষ্ট সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা উচিত এবং একাজ নিরংকুশ ক্ষমতার সংগে অথচ খুব ভদ্রভাবে করা দরকার।

কিন্তু অসন্তোষ দমনে দৃঢ়হস্ত হলেও আমাদের উচিত, অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো ন্যায়সংগত কারণ থাকতে না দেওয়া। বাহিরের কোনো রকম চাপ আসার আগেই এরূপ তদন্ত করলে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রবল ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ে সুবিধা দান করলে উদারতা অথবা অনুগ্রহ

দেখানো হয় না; কিন্তু আমরা যদি সত্যিসত্যিই কোনো ব্যাপারে এতোদিন মুসলমানদের প্রতি অবিচার করেই থাকি, তাহলে তাদের উপর ন্যায়বিচার করবার জন্য এ-সব বিবেচনা করতে আরও বিলম্ব করলে আমাদের অহংকারই প্রকাশ পাবে এবং তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে। ব্রিটিশ সরকার ভারতে এখনও এরকম শক্তিশালী যে, তার সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশের চিন্তার কথা উঠতেই পারে না। অবশ্য সরকার সমস্ত রাজদ্রোহীকে জেলে আটক রাখতে পারে, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের দলকে সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেই আরও মহৎভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা সম্ভব। অবশ্য এটা সম্ভব হতে পারে কেবল মুসলমানদের মনে ব্রিটিশ শাসন-আমলের অবিচার সম্বন্ধে যে-সব ধারণা জন্মেছে, সে সবের অপসারণ দ্বারাই।

কারণ, আমাদের আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলে না যে, ভারতীয় মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে রকম গুরুতর তালিকা খাড়া করেছে, অতীতে আর কোনো আমলে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে তা করা হয়নি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের ধর্মানুসারীদের জীবনের সবরকম সম্মানজনক রুযি-রোযগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, আমরা এরকম এক শিক্ষাপ্রণালী আমদানী করেছি, যার দ্বারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায় বেকার হয়ে গেছে এবং তারা অপমান ও দারিদ্র্যের মুখে পতিত হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের আইন-উপদেষ্টা বা কাযীর পদ তুলে দিয়ে তাদের হাযার হাযার পরিবারকে দৈন্য দশায় ফেলে দিয়েছি, অথচ এ-সব কাযী তাদের শাদী পড়াতো এবং স্মরণাতীত কাল ধরে ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী পারিবারিক বিধি-বিধানের তারাই ছিলো একমাত্র অধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। তারা আমাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তোলে যে, আমরা তাদেরকে ধর্মপালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে তাদের আত্মাকে বিপন্ন করে তুলেছি। সবার উপরে তাদের ফরিয়াদ হলো এই যে, আমরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ইচ্ছাকৃত চাতুরীর সঙ্গে চুরি করেছি এবং শিক্ষার জন্য সৃষ্ঠ তাদের তহবিলগুলি সামগ্রিকভাবে আত্মসাৎ করেছি। এইসব বিশেষ অভিযোগ তারা প্রমাণযোগ্য মনে করে। এ-সব ছাড়াও

তাদের আরো নানাবিধ ভাবাবেগজাত অভিযোগ রয়েছে—সেগুলি হয়তো স্থূল-দৃষ্টি ইংরেজদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে, কিন্তু সেগুলি আইরীশদের মতোই ভারতীয় গণ-মনে শাসকদের বিরুদ্ধে তিক্ততাকে জিইয়ে রাখে। তারা প্রকাশ্যে বলে যে, আমরা মুসলমান সাম্রাজ্যের সামান্য চাকর-নফর হিসেবে বাঙালা দেশে প্রবেশ করি, কিন্তু আমাদের বিজয়-অভিযানের সময় তাদের প্রতি এতোটুকু করুণা দেখাইনি, ভুঁইফোড়দের মতো অমার্জনীয় রূঢ়তার সংগে আমাদের সাবেক মুনিবদেরকে পদদলিত করেছি। এক কথায়, ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীনতার জন্য, মহানুভবতার অভাবের জন্য দায়ী করে, অত্যন্ত নীচ পন্থায় তাদের মূলধন আত্মসাৎ করার জন্য এবং একশো বছরেরও উপর তাদের প্রতি নানা গুরুতর সাধারণ অবিচারের জন্য দোষারোপ করে।

এ সব অভিযোগ কতোদূর সত্য এবং কতোখানিই বা কালগতিকে ঘটতে বাধ্য, এখানে আমি সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার পাঠককে অনুরোধ করি, সাধারণ মুসলমান-সমাজের প্রতি আমাদের ব্যবহার সম্বন্ধে এই সমালোচনার সময় তিনি যেন তাঁর মনকে সেই সব মুসলমানের প্রতি ক্রোধমুক্ত রাখেন, যাদের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিরাগ প্রকাশ স্বাভাবিক নিয়ম এবং যতোদিন ইংরেজ ভারতকে কুক্ষিগত রাখতে সক্ষম থাকবে, ততোদিন তারা নিশ্চয়ই গৃহশত্রু ও সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীদেরকে সমানভাবে শায়েস্তা রাখবার কৌশলও জানবে। এখন আমি একবার মুসলমানদের হয়ে মামলা হাতে নেওয়ার পর আর সে-সব ভ্রান্ত ওহাবীর নামোল্লেখ করবো না। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের বিষয়ে চুপ থাকতে চাই বলে এখানে আমি দু'জন বিখ্যাত ইংরেজের জবানবন্দী উল্লেখ করতে চাই, কারণ তাঁরা বর্তমান যুগে মুসলমানদের অসন্তোষ ও সক্রিয় মুসলমান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার সবচেয়ে যোগ্য পাত্র। ভারতের অপ্রসন্ন অসন্তোষ ও সক্রিয় শত্রুতার মধ্যে সীমারেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বাঙলা দেশে শান্তি প্রিয় মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমরা অমনোযোগী হওয়ার দরুনই তাঁরা সেই সব মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে

পড়েছেন, অন্য ক্ষেত্রে যাদেরকে তাঁরা জলন্ত অংগার ও বিদ্রোহী মনে করে আতংকে সরে দাঁড়াতেন।

ওহাবীদের বিরুদ্ধে মামলা চালাবার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী[১] কিছুদিন পূর্বে লিখেছিলেন: 'আমার বিবেচনায় মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের উপর ওহাবী মতবাদের প্রভাব প্রবল হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, তাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা প্রদর্শন।' তারপর তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালীতে উচ্চশ্রেণীর লোকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তাদের জীবনোপায়ের কোনো ব্যবস্থা না থাকার দরুন তার দ্বারা কত মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "আম্বালার মামলার ঠিক এরকম একটা ব্যাপার নজরে পড়েছে। আমার বিশেষ পরিচিত ওসমান আলী নামক এক ব্যক্তির জবানবন্দীতেই শুনুন "তিন বছর আগে আমি যশোর জিলায় যাই। সেখানে জজকোর্টের নাযিরের সংগে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লুম, 'আমি বড়ো বিপদে পড়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি লেখাপড়া জানা লোক, তোমার তো বিপদে পড়ার কথা নয়। যাহোক, তুমি যদি আমার কথা শোনো, তাহলে তোমার ভালোই হবে।' আমি বল্লুম, 'আপনি কি বলতে চান?' তিনি জওয়াব দিলেন, 'তোমার দীনী-কিতাবখানা হাতে নাও এবং নিকটবর্তী এলাকায় যেয়ে লোকদেরকে দীনী-এলেম শেখাও। যখন উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাবে, তখন তাকে জিহাদে যেতে লোভ দেখাও।' তাঁর উপদেশ মতো আমি নিকটবর্তী জিলাগুলিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি, বহু লোক আমায় টাকা-পয়সা দিয়েছে এই লোকটিকে আমি যতোদূর জানি, আমার বিশ্বাস, সে কতকটা ধর্মের খাতিরে আর কতকটা অর্থের জন্য প্রচার কাজ করেছে। সারা দেশটা এই শ্রেণীর লোকেরাই চষে বেড়াচ্ছে। তারা চাষীদেরকে উত্তেজিত করেছে এবং আম্বালা অভিযান আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, তারা অবহেলার পাত্র নয়—ভীরু বাঙালীও ক্ষেত্র বিশেষ দুর্দান্ত আফগানের মতো লড়তে জানে।

---

১ মিঃ জেমস্ ও, কেনেলী, সি, এস।

তাঁর চেয়েও উচ্চপদস্থ[২] আরেকজন কর্মচারী লিখেছেন: 'এতে কি কিছু আশ্চর্য হওয়ার কথা আছে যে, মুসলমানরা সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বহু দূরে সরে দাঁড়াবে, যার মধ্যে তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনও সহানুভূতি নেই—সত্যি কথা বলতে গেলে, তাদের অতি দরকারী বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোনো কথাই নেই; অন্যাদিকে সে প্রণালীর দ্বারা অনিবার্যভাবে এবং সহজেই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে, আর তাও তাদের সামাজিক প্রথার পরিপন্থীভাবে।'

'নিজের প্রণালীতে শিক্ষিত মুসলমান দেখছে যে, সে শাসনবিভাগের সব ক্ষমতা ও সকল রকম মাহিনা-মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলির সবই পূর্বে তারই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। সে দেখছে যে, জীবনধারণের একমাত্র সুযোগ-সুবিধা হিন্দুর হাতেই ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আজ উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের মন অসন্তোষে ভরে গেছে। তাদের এ মনোবৃত্তির কারণ, তাদের ধর্মের উপর কোনো সক্রিয় যুলুমবাজির জন্য নয়; তাদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শনই এজন্য দায়ী। তাদের ধর্মান্ধতাকে—যার প্রচুর অনুমোদন কুরআনে পাওয়া যাবে—আগুনের মতো উদ্দীপ্ত করা হয়েছে; ফলে এরকম আশংকা করা যেতে পারে যে, একদিকে একদল অজ্ঞ গোঁড়া বিদ্রোহী খাড়া হবে এবং অন্যদিকে কয়েকজন সংকীর্ণচেতা শিক্ষিত মুসলমান দাঁড়িয়ে নিজেদের ধূমায়িত অসন্তোষ ও গোঁড়ামির দ্বারা চালিত হবে, মিলিতভাবে অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বজায় রাখবে।'

বাস্তবিক, সর্বোচ্চ থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারী কর্মচারী একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন যে, আমরা মহারানীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। আর বর্তমান বড়লাটের চেয়ে অন্য কেউ মুসলমানদের প্রতি অবিচারের বিষয় বেশী অনুধাবন করেননি।[৩] ভারতবাসীদের একটা মোটা অংশ—সম্ভবত

---

২ মিঃ ই. সি. বেইলী, সি. এস. আই, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী। তাঁর পাণ্ডিত্য ও সহানভূতির জন্য মুসলমানদের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

৩ লর্ড মেয়ো (১৮৬৯—১৮৭২)—(অ)

সংখ্যায় তিন কোটি হবে—আজ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ধ্বংসের দিকে চলেছে। তাদের অভিযোগ এই যে, কাল তারা যে দেশের বিজেতা ও শাসক ছিল, আজ তারা সে দেশেই কোনো জীবনোপায় খুজে পায় না। তাদের অবনতির কারণ সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিতে গেলে তাদের অভিযোগগুলির সত্যতা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাদের অবনতি হচ্ছে আমাদেরই রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও অবহেলার বিষময় ফল। এদেশ আমাদের হাতে আসবার আগে মুসলমানরা যে ধর্ম অনুসরণ করতো, যা খেতো ও যেভাবে জীবন-যাপন করতো, আজও তাই করছে। আজও তারা সময়ে সময়ে তাদের পুরাতন গভীর জাতীয়তাবোধ এবং যুদ্ধ বিষয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করে থাকে ঠিকই; কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই তারা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা জাতি মাত্র।

তাদের এ অধঃপতনের জন্য আমরাই ষোল আনা দায়ী নই। একথা সত্য যে হিন্দুদের অধিকার স্বীকার করতে হলে মুসলমানরা আর পূর্বের মতো সরকারী চাকরিগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগ করবার হকদার নয়। তাদের সম্পদের সাবেক উৎস শুকিয়ে গেছে, সুতরাং এখন তারা নয়া সরকারের অধীনে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করতে বাধ্য। এই সরকার বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্য স্বীকার করেন না। ভারতের উদ্ধত ও বেপরোয়া বিজেতা হিসেবে মুসলমানরা শাসনকার্যের নিম্নতন পদগুলি হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করতো, কিন্তু সকল উর্ধ্বতন পদগুলি নিজেদের হাতে রাখতো। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, বাদশাহ্ আকবরের আদর্শ সংস্কার সাধনের পরেও রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলির এরকম ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো: সর্বোচ্চ বারোটি পদে, পাঁচ হাযারী মনসবদারের একজন হিন্দু ছিলেন না। পাঁচ হাযারী থেকে অধস্তন পাঁচশো সওয়ারীর ২৫২ জন মনসবদারের মধ্যে মাত্র ৩১ জন হিন্দু ছিলেন।[৪] পরবর্তী রাজত্বকালে এই মনসবদারীর ৬০৯ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১১০ জন হিন্দু

---

৪ এ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ব্লকম্যান সাহেব রচিত 'The Hindo Rajas under Mughal Government, Calcutta, 1871—দেখুন।

ছিলেন এবং পাঁচশোর অধস্তন দুশো সওয়ারীর ১৬৩ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২৬ জন ছিলেন হিন্দু।[৫]

বর্তমান ইংরেজ সরকারের চাকরিতে এমন একচেটিয়া অধিকার আশা করা মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু এরূপ তো তাদের আবেদনও নয়, অভিযোগও নয়। তারা এ-কথা বলে না যে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। তাদের অভিযোগ এই যে, তাদেরকে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের সকল রকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তারা একথা বলে না যে, অতঃপর জীবনযুদ্ধে তারা হিন্দুদের সংগে সমান পাল্লায় দাঁড়াবে না। তাদের দুঃখ এই যে, অন্ততঃ বাঙলা দেশে তাদের ভাগ্যে কোনো সুযোগই মেলে না। সোজা কথায়, মুসলমানরা হয়েছে বিরাট ও গৌরবময় অতীতের অধিকারী, কিন্তু হালফিল একেবারে জীবনোপায়শূন্য। এরকম একটা জাতি যদি সংখ্যায় তিন কোটিতে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের নিয়ে কি করা যাবে, এ-সমস্যা শুধু তাদের পক্ষে নয়, তাদের শাসকদের পক্ষেই বেশী দরকারী হয়ে ওঠে।

পূর্ব বাঙলার চাষী-বাশিন্দাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। এই অঞ্চলের জলাভূমি ও নদীবহুল জিলাগুলির আদিম বাশিন্দাদেরকে কখনো ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ দিকে আর্যগণ এরকম উপযুক্ত সংখ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করেনি, যার দ্বারা সাগর-উপকূলের এবং ব-দ্বীপের বাশিন্দাগণকে, পুরাকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের গণ্ডীভুক্ত করা যেতে পারতো।[৬] এজন্য তারা হিন্দু উচ্চ বর্ণের গণ্ডীর বাইরেই থেকে যায়। এই চণ্ডালেরা দূরবর্তী সাগরের খাড়িতে মাছ ধরে খেতো। এবং বন্যা উপদ্রুত ক্ষেত্র থেকে অতি কষ্টে ধান জন্মিয়ে ঘরে তুলতো তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না, অথবা তারা ধর্মের কোনো বিধি-নিষেধের ধার ধারতো না![৭] তারা এতোদূর অচ্ছুৎ যে,

৫ শাহজাহানের সময়। এ-কথা স্মরণীয় যে, এ-সব সামরিক খেতাব বেসামরিক কর্মচারীদের ছিল।

৬ আমি এই ব-দ্বীপের শেষ ব্রাহ্মণ বসতি ঢাকা ও বিক্রমপুরর কথা বলছি।

৭ ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন এলাকা থেকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মেছে।

উচ্চবর্ণের কোনো ব্রাহ্মণ সে অঞ্চলে গিয়ে তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাস করতে পারে না, ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সে উত্তর ভারতের বাসিন্দা তার আপন বংশের সকল রক্তগত সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৮] মুসলমানদের এ-সব বর্ণবৈষম্যের বালাই ছিল না। তারা কখনো বিজয়ীর বেশে বসতি স্থাপন করতো, আবার কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ব-দ্বীপে আগমন করতো। এমন কি অতি পুরাতন জিলা যশোরেও তারা এই শেষোক্ত মনোবৃত্তি নিয়ে এসেছিল।[৯] পৌরাণিক বীরপুরুষেরা যেমন মধ্যভারতে দাবন-দৈত্য বধ করতেন, রাক্ষস জাতিকে দমন করতেন এবং বিশাল বনভূমি উৎখাত করতেন, সেই-রকম যে মানুষ সমুদ্র-প্রপীড়িত অঞ্চলে চাষাবাদের কাজের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল—সেও সমান দঃসাহসিক কার্য সমাধা করেছিল।

মুসলমানরা দক্ষিণ অঞ্চলে এরকম বহু পতিত ভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করেছিল এবং এজন্য তারা পূর্ব বাঙলার নাম রেখে গেছে প্রথম পানি ও মাটির পৃথককারী হিসেবে। আজও শিকারীরা তাদের কতো বাঁধ ডিঙিয়ে, পাকা সড়ক বেয়ে, কত মসজিদ, মাযার, দীঘি পার হয়ে জংগলের নিভৃততম অঞ্চলে প্রবেশ করে—কারণ মুসলমানরা যেখানেই গেছে, সেখানেই ধর্মপ্রচার করেছে কতকটা তলোয়ারের জোরে, কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষেরই হৃদয়ের কোমলতম দুটো তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত করে। হিন্দুরা এই ব-দ্বীপের উভচর বাশিন্দাদেরকে কখনো তাদের সমাজে স্থান দেয়নি। মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নীচ জাত-নির্বিশেষে ইসলামের পূর্ণ অধিকার সবাইকে সমানভাবে দান করেছিল। তাদের উৎসাহী ধর্মপ্রচারকেরা এই শিক্ষা দিয়েছিল—'তোমরা সকলেই তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে নতজানু হও, তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান, সব সৃষ্টজীব ধরার ধূলার মতোই—এক আল্লাহ্ ছাড়া আর প্রভু নেই এবং মুহম্মদ তাঁর রসূল।' বিজেতার কাজ শেষ হলে তার রণ-হুংকার ধর্মের বিধান পালনের আহ্বানে পরিবর্তিত হতো।

৮ তার কারণ এই যে, বহু বছর তারা এ-সব অস্পৃশ্য চণ্ডালের সংগে বাস করেছে ও তাদের পৌরোহিত্য করেছে।

৯ যশোহর জিলা সম্বন্ধে মিস্টার জেমস্ ওয়েস্টল্যাণ্ডের রিপোর্ট—এ পর্যন্ত ব-দ্বীপ সংক্রান্ত একটি জিলার উৎকৃষ্ট বিবরণী, কলিকাতা, ১৮৭১।

আজও এই ব-দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এমন দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে যে, এখানকার মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় সাহিত্য ও ভাষা পর্যন্ত গড়ে ফেলেছে।[১০] তাদের পুঁথি বা মুসলমানী বাংলা উত্তর ভারতের উর্দূ থেকে ততোটা পৃথক, যতোটা উর্দূ ভাষা হিরাতের ফারসী ভাষা থেকে পৃথক। এ অঞ্চলের দেহাতী বাশিন্দাদের মধ্যে বহু আশরাফ ও বিশিষ্ট ভদ্র এবং অগণিত ভূসম্পত্তির মালিকও আছেন। এ-কথা সত্য যে, আজও এককালে অশেষ ক্ষমতাবান সর্বগ্রাসী মুসলমান উচ্চ সম্প্রদায়ের ছিটে-ফোঁটা সারা বাংলা জুড়ে রয়েছেন। তাঁরাই তাঁদের বিগত মহিমময় দিনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আজও মুর্শিদাবাদে একটা মুসলমান রাষ্ট্রের অনুকারী দরবারের অভিনয় চলে এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোনও না কোনও শাসকের দূরবর্তী বংশধর তার ছাদবিহীন বালাখানায় ও জলদামশোভিত সায়রে অপ্রসন্ন গর্বিত দৃষ্টি মেলে দিন কাটায়। এ-সব পরিবারের অনেকগুলিই আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। তাদের ভেঙে-পড়া বালাখানাগুলি আজ শুধু বয়স্ক ছেলেমেয়েতে, পৌত্রপৌত্রীতে, ভাইপো-ভাইঝিতে ভরতি—এই অনুবসনক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে দলের কারও আজ জীবনে কিছু করবার মতো সুযোগ-সুবিধা নেই। তারা আজ জোড়াতালি দেওয়া বারান্দায় অথবা ছাদফুটো দহলিজে বসে বসে উদ্দেশ্য-বিহীন জীবন যাপন করে, আর দিনে দিনে দারুণ হতাশায় দেনার গভীর গহ্বরে ডুবে যায়। তারপর একদিন প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ঝগড়া বাধায়, আর কতকগুলি বন্ধকী খতমূলে তাহাদের ভূসম্পত্তিগুলি আটক করে—ফলে, বহু দিনের বহু প্রাচীন মুসলমান পরিবারটি উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

যদি কেহ উদাহরণ দাবী করে, তাহলে আমি নাগরের রাজাদের কথা উল্লেখ করবো।[১১] ইংরেজরা যখন প্রথম তাদের সংস্পর্শে আসে তখন—দুশো বছরের অবিমৃষ্যকারিতা ও অমিতব্যয়িতার পরেও—তাদের বার্ষিক

---

১০ পুঁথিসাহিত্যের ভাষা।

১১ বীরভূম জিলায় অবস্থিত। হান্টার সাহেব স্বলিখিত Annals of Rural Bengal, 1864 পুস্তকে নাগ রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন—(অ)।

রাজস্ব আদায় ছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।[১২] অসংখ্য থামঘেরা রাজপ্রাসাদের বারান্দার মধ্য দিয়ে আজ তাদের রাজা উঁকি মেরে চেয়ে দেখেন, তাঁদের রাজ্যটি ভেঙে দুটো ইংরেজী জিলা করা হয়েছে। তাঁদের মসজিদ ও অসংখ্য ছোট ছোট গ্রীষ্মকালীন প্রমোদভবনগুলি একটা কৃত্রিম হ্রদের চারপাশে ঝকমক করতো এবং হ্রদের বুকে প্রতিবিম্ব ফেলতো, সে হ্রদে একটা শৈবালেরও নিশানা ছিল না। একটা সোনালী সাম্পান অন্দরের সোপানশ্রেণী থেকে বের হয়ে গর্বভরে পানি কেটে কেটে হ্রদের মাঝখানে একটা ফুল বাগিচায় ঢাকা দ্বীপে আসা-যাওয়া করতো; সূর্য যখন অস্ত যেতো, সৈনিকেরা দুর্গে পাহারা দেওয়া থেকে রেহাই পেতো, শিশুদের কলধ্বনি ও তরুণীদের বীণার ঝংকার রাজকুমারীদের বাগিচার দেওয়ালের ওপাশ থেকে মুহুর্মুহু শোনা যেতো। আজ সে দুর্গের বিরাট দরওয়াজা ছাড়া আর কিছু নেই। ছাদবিহীন মসজিদের দেওয়ালগুলি থেকে চুনবালির নকশা-কাজ অনেক আগে খসে পড়ে গেছে, নহরভরা বড়ো বড়ো বাগিচাগুলি আজ হয় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়েছে, না হয় ধান ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের মাছভরা দীঘিগুলি আজ বিশ্রী দুর্গন্ধময় গর্ত হয়ে গেছে। সেই গ্রীষ্মকালীন প্রমোদভবনগুলি আজ ইট-সুরকীর স্তূপে পরিণত। এখানে সেখানে এক-আধখানা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁদের খিলানকরা মূরীয় ঢঙে বানানো জানালাগুলি যেন বিষাদভরে চেয়ে আছে।

কিন্তু পুরাতন শাহী হ্রদটার দৃশ্যই সবচেয়ে শোকাবহ। রাজপ্রাসাদটা তার তীরে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আর তার সাবেককালের থামঘেরা মনোরম দৃশ্য নেই। এটা যেন একটা কয়েদখানা। তার রোদ-বৃষ্টি খাওয়া দেওয়ালগুলির চেহারা নীচের সবুজ রঙের গাঁজলা মতো পানির বিকৃত চেহারার সংগে চমৎকার মিলে গেছে।[১৩] বারান্দাগুলি ভেঙে ভেঙে পড়েছে। হতভাগিনী মহিলারাও—যাঁরা আজও গালভরা 'রানী' উপাধি ধারণ করেন—আর বৈকালে ঘেরাটোপ দেওয়া সাম্পানে চড়ে

১২ প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা—(অ)

১৩ ১৮৬৪ সালে আমি বালাখানার ও সায়রগুলির যেমন চেহারা দেখেছি, তারই বর্ণনা দিয়েছি। এখন শোনা যায়, সায়রগুলির সংস্কার হয়েছে, কিন্তু বালাখানাগুলি আরও ভেঙ্গে পড়েছে।

বিহারে বের হয় না। তাঁদের বিলাসবহুল অন্দরমহলে আর ছাদ নেই। রাজবাড়ীর হতভাগ্য বাশিন্দাদেরকে এখন তাদেরই ভাঙা আস্তাবলের সামনে কুঁড়ে ঘরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নাগর রাজবাড়ীর পুরাতন জাঁকজমকের মধ্যে একটি নহর মাত্র আজও অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। সেটি আজও সাবেক কালের মতো রাজবাড়ীর চারধারে শেওলা বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। তার সকরুণ দৃশ্য সহসা দর্শককে অননুকরণীয় শোভা-সম্পদময়ী রোম নগরীর বর্তমান ধ্বংসাবশেষ স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

শুধু টাইবার নদী দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে,
আজ কিছু নেই! দুনিয়ার অসংগতিকে অভিশাপ দেই।
যেটি স্থির ও মানায়, সেটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!
যা ক্ষণভংগুর, সেটাই টিকে যায় স্থায়ী হয়।[১৪]

এই ভেঙেপড়া রাজবাড়ীর অতি প্রাচীন রাজবংশের বর্তমান প্রতিনিধি তাঁর জড়জীবন বড়ো দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি আরকমাখানো মিষ্টি খেতে খেতে বৃথাই তাঁর জলীয় আগাছাপূর্ণ হ্রদের দিকে নিরাশ দৃষ্টি মেলে বার বার তাকিয়ে থাকেন। যদি কোন রাজনীতিক বিলাতের পার্লামেন্টের হাউস অব্ কমন্সে কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে চান, তাহলে তাঁর পক্ষে বাঙালার এরকম কোন মুসলমান পরিবারের সত্য কাহিনীর বর্ণনাই যথেষ্ট হবে। তিনি প্রথমে বর্ণনা করবেনঃ একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত শাসক তাঁর বিস্তীর্ণ এলাকায় অগণিত ফৌজ নিয়ে রাজত্ব করছেন। তাঁর কতো চাকর-নফর, পাইক-বরকন্দাজ; তাঁর দরবারে প্রাচ্যসুলভ কতো শান-শওকত; শান্তিময় মৃত্যুর পূর্বে তিনি কতো মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তারপরের বর্ণনা হবেঃ সেই শাসকের বর্তমান উত্তরাধিকারী একটা আধা জড়জীব, একদল ইংরেজ শিকারী তারই এলাকার জংগলে ঢুকেছে শুনলে সে ভয়ে কোটরে লুকোবে। শেষে তারই চাকর-নফরেরা বিদেশী আগন্তুককে সম্মান দেখাবার জন্য তাকে টেনে বের করলে সে আহাম্মুকের মতো আবোল-তাবোল বকবে এবং তারই বালাখানায় মাত্র কয়েক শত টাকার জন্য সম্প্রতি একজন সওদাগর খুন করার দরুন একঘেয়ে প্যান্-পেনে কৈফিয়ত দিতে শুরু করবে।

১৪ Spenser's 'Ruins of Rome' by Bellay.

আমি এখানে মুসলমান চাষী ও মুসলমান বড়-ঘরানাদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলাম যাতে ইংরেজরা যেন চোখ খুলে দেখতে পায়, কোন্ শ্রেণীর লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আমি এখানে আরও বলে রাখি যে, আমার মন্তব্যগুলি কেবল বাঙলা দেশ সম্বন্ধেই[১৫] প্রযোজ্য; কারণ আমি এদেশটাই ভালোমত জানি এবং আমার যতোদূর জানা আছে, তাতে ধারণা হয় যে, এদেশের মুসলমানরাই বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার সব মন্তব্য যে ভারতের সকল শ্রেণীর মুসলমানদের বিষয়ে আরোপিত হতে পারে, এ-কথা আমি বলতে চাইনে এবং আমার পাঠককেও বিশ্বাস করতে বলিনে।

যদি কোন মানুষ কখনো জীবনোপায়ের জন্য তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করে থাকে, তাহলে সে হচ্ছে বর্তমান কালের বাঙলার খান্দানী মুসলমান। আজ তাদের সাবেককালের ধন-দওলতের উৎস শুকিয়ে গেছে। আর তারা আশ-পাশের হিন্দু বড়লোকের কোঠাবাড়ী লুঠ করতে পারে না, রাহী সওদাগরের নিকট থেকে মাশুল আদায় করতে পারে না। শাহী দরবারে কোনো বন্ধুর মারফতে খাজনা থেকে রেহাই লাভ করতে পারে না, জন্ম, বিবাহ, ফসল তোলা প্রভৃতি পল্লীজীবনের নানারকম উৎসব উপলক্ষে আর তারা স্থানীয় কর আদায় করতে পারে না। নিজেরাই আবগারী কর এবং রমযান মাসে নিষিদ্ধ পানীয় দ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে চোখ বুঁজে থেকে কিছু উপরি আদায় করতেও আজ তারা পারে না। বাঙলা দেশে এক নম্বর আয় ছিল বাদশাহী খাজনা ও শুল্কগুলির আদায় তদারক করা। এটি ছিল খান্দানী মুসলমানদের একচেটিয়া আধিকার। কোতোয়ালী বা পুলিস বিভাগ ছিল আর একটি বড়ো আয়ের উৎস এবং এ বিভাগের নিযুক্তিও ছিল মুসলমানদেরই একচেটিয়া। আইন-আদালতগুলি ছিল তিন নম্বরের প্রধান আয়ের ক্ষেত্র এবং মুসলমানরাই এ-সব একচেটিয়া ভোগ করতো। সবার উপরে ছিল সৈন্য বিভাগের আয়। এ বিভাগের অফিসারেরা শুধু

---

১৫ বাঙলার মুসলমানরাই ১৭৫৭ সাল থেকে পতন যুগে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়েছে প্রভু ইংরেজ ও তাদের অনগ্রহপুষ্ট হিন্দুদের হাতে---(অ)।

সে-সব ভদ্রলোক ছিলেন না, যাঁরা সৈনিক নিয়োগের বিনিময়ে যৎসামান্য ব্যাংকের সুদ দস্তুরী হিসেবে লাভ করতেন। এটা ছিল মিলিত বিজেতাদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যার অছিলায় বিজেতাগণ নিজ নিজ এলাকার চাষীদের নাম সিপাহীর তালিকায় লিখে দিয়ে সরকার থেকে রীতিমতো তাদের নামে মাহিনা আদায় করতেন। একশো সত্তর বছর আগে একজন বাঙালী মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, আর আজ তার পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোজা কথায়, খান্দানী মুসলমানেরা ছিলেন বিজেতা এবং সেই হিসেবে তাঁরা দাবী করতেন রাষ্ট্রের সকল বিভাগে একচেটিয়া অধিকার। কখনো কখনো একজন হিন্দু ধনপতি কিংবা তার চেয়েও ক্বচিৎ একজন হিন্দু সেনাপতির দেখা মিলতো, কিন্তু তাদের এরকম বিশেষ উদাহরণ থেকেই তাদের দুর্লভতা প্রমাণ হয়।[১৬] একজন খান্দানী মুসলমানের সিন্দুকে অনবরত টাকা-পয়সা আমদানি হতো তিনটি অফুরন্ত উৎস থেকে—সেনাদলে নিয়োগ, খাযনা আদায় এবং বিচার অথবা শাসন বিভাগে চাকরি। এগুলি নিশ্চয়ই তাদের প্রাধান্যের উপযুক্ত আয়, তাছাড়া দরবারে চাকরি এবং আরও শতাধিক নামহীন আয়ের উৎস ছিল। শেষেরগুলি সম্বন্ধে আমি উপরে কিছু ইংগিত দিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও বর্ণনা দেব। কিন্তু বর্তমানে প্রধানতঃ যে তিনটি আয় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করছি, সেগুলি ছিল তাদের সদুপায়ের একচেটিয়া সাধারণ উৎস। এখন দেখা যাক, বর্তমান বৃটিশ শাসনে বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলির কি ভোগাধিকার আছে।

---

১৬ যখনই এরকম হিন্দু কর্মচারীর সাক্ষাৎ মিলতো, তখনই মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যেতো। রাজস্ববিদ টোডরমলও সেনাপতি মানসিংহের ক্ষেত্রে পর শাহী দরবারে রীতিমতো প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। মানসিংহের ক্ষেত্রে তাঁর অধীনে রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মুসলমান সেনানায়করা অস্বীকার করেছিলেন। মুসলমান বাদশাহ্‌দের মধ্যে অতি কম গোঁড়া বাদশাহের আমলে যে-সব হিন্দু বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত হন, তাঁদের হিসেব পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ সেনাদল নিয়োগ এখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।[১৭] কোনো উচ্চবংশজাত মুসলমান এখন আমাদের সেনাদলে প্রবেশাধিকার পায় না। যদিও বা আমাদের সেনাদলে তার চাকরি মেলে, তাহলেও তার পূর্বেকার মতো উপার্জনের সম্ভাবনা আর নেই। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার বিশ্বাস, এখন হোক বা দু'দিন পরেই হোক, ভারতীয় উচ্চবংশজাত সন্তানগণ বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়েও আমাদের আমলে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে নিয়োজিত হবেই।[১৮] অবশ্য প্রত্যেক রেজিমেন্ট বা সেনাদলের সার্বভৌম অধিনায়ক বরাবরই একজন ইংরেজ থাকবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার আগে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তর ভারতের সমরোচিত বাসিন্দারা নিজেদের বংশগত সরদারের অধীনে এমন একদল অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম, যা হবে দুনিয়ার অদ্বিতীয়। ওই রকম নিয়োগ হবে পরম আকাঙ্খিত। আজকার মহারানীর অধীনে ওই রকম চাকরিতে কোন বিরাট ভাগ্য গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, মুসলমানরা তা বিশেষভাবেই জানে। তবু তারা ফৌজের চাকরিকে সম্মানজনক ও ভালো উপার্জনের পথ হিসেবে মনে করে এবং আজ তাদের এহেন পৈতৃক পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনে মনে তারা একটা তিক্ত ক্ষোভ ও ব্যথা অনুভব করে।

মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল, রাজস্ব আদায় করা। তাদের এই একচেটিয়া অধিকার ইসলামী ব্যবহারবিধি ও রাষ্ট্রনীতি দ্বারা দৃঢ়মূল ছিল। বিজয়ের চাপরাশ ছিল খাযনা আদায়। বিজেতারা

১৭ খুব কম সংখ্যক মুসলমানই গবর্নর-জেনারেলের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার আছেন এবং আমার জানামতে মহারানীর কমিশনপ্রাপ্ত একজনও নেই। এখন ভারতবাসী একজন সামান্য সিপাই হিসেবেই ফৌজে ঢুকতে পারে এবং অতি কম ক্ষেত্রে দু'একজন উপরের কমিশন পেলেও তা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। একজন মাত্র মুসলমান এ পর্যন্ত অনারারী ক্যাপ্টেন পদবীতে উন্নীত হয়েছেন, তাঁর নাম ক্যাপ্টেন হিদায়াত আলী—তাঁকে গত মিউটিনির সময় কর্ণেল র‍্যাটে (Rattary) এই পদবী দেন। অথচ তিনি সবদিক দিয়ে মহারানীর কমিশন পাওয়ার উপযুক্ত, এটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

১৮ যাঁরা এই মতাবলম্বী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ অফিসার ক্যাপ্টেন অস্‌বর্ণ (বাঙালী অশ্বারোহী বাহিনীর) কলকাতার 'অবজারভার' পত্রিকায় এবিষয়ে লিখেছেন।

শুধু খাযনা পেতেন না, আদায়ের আনুষংগিক মুনাফাটাও তাঁদের হাতে যেতো। এ-কথা বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন দেখি না যে, ভারতীয় অধিবাসীদের সংগে বিজেতাদের সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের উপরেই নির্ধারিত হতো, মুসলমানী আইন-কানুন দ্বারা নয়। গর্বিত বিজেতারা আদায়কাজের খুঁটিনাটিতে নযর দেওয়াকে মনে করতেন ঘৃণিত ব্যাপার এবং এজন্য চাষীদের সংগে সোজাসুজী লেনদেনের কারবারটা হিন্দু নায়েব গোমস্তার হাতে ছেড়ে দিতেন। এটা এমনি সাধারণ রেওয়াজ ছিল যে বাদশাহ্ আকবর একজন হিন্দু রাজস্ব-সচিব নিয়োগ করার সপক্ষে কৈফিয়ত হিসেবে এই রেওয়াজের উপরই নির্ভর করেছিলেন। টোডরমল তাঁর বাদশাহীর রাজস্ব-সচিব পদে বহাল হলে মুসলমান আমীরগণ প্রতিবাদ জানাতে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের জমিদারী ও জায়গীরদারীর তদারক কারা করে থাকে?' তাঁরা জওয়াব দিলেন, 'আমাদের হিন্দু গোমস্তারা।' তখন বাদশাহ্ বল্লেন, 'ভালো কথা, তাহলে আমাকেও আমার তালুক-মুলুক তদারক করবার জন্য একজন হিন্দুকে নিয়োগ করতে দিন।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা রাজস্ব বিভাগের বড়ো বড়ো পদ দখল করলেও চাষীদের সংগে সরাসরি কারবার করতে হিন্দু পেয়াদা, নায়েব ও গোমস্তা নিয়োগ করতো। কার্যতঃ হিন্দুরাই রাজস্ব বিভাগের নিম্নতন পদগুলি অধিকার করতো এবং তাদের মুসলমান উপরওয়ালাদের হাতে আদায়ের টাকাপয়সা ওয়াসীল করার আগেই নিজেদের মুনাফাটা কেটে রাখতো। এই মুসলমান উপরওয়ালারাই খোদ বাদশাহের কাছে জবাবদিহি করতেন এবং তাঁরাই ছিলেন মুসলমান রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রধানতম যোগসূত্র। তাঁরা জমির খাযনা আদায় করতেন, দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নিয়ে নয়, ক্ষুরধার তলোয়ারধারী সিপাহীদের সাহায্য নিয়ে। বকেয়া খাযনা ওয়াসীল করবার জন্য প্রতি অঞ্চলে একদল পিটুনী ফৌজ মোতায়েন রাখা হতো, তারা শেষ পয়সাটা পর্যন্ত আদায় না হওয়া তক লোকের জীবন বিষময় করে তুলতো। চাষীরা এবং হিন্দু গোমস্তা-পেয়াদারা নির্দিষ্ট জমার যতো কম সম্ভব আদায় দিতে চেষ্টা করতো, আর মুসলমান মনিব উপরওয়ালরা

তাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট জমারও বেশী ওয়াসীল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।[১৯]

ইংরেজরা দিল্লীর বাদ্‌শাহের নিকট থেকে বাঙলার দেওয়ানী সনদ লাভ করে কেবল রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী হিসেবে। অবশ্য আমরা নিয়োগটা লাভ করেছিলাম, মোটা রকম সেলামী দিয়ে নয়, তলোয়ারের জোরে। কিন্তু তাহলেও আইনতঃ আমাদের মর্যাদা বাদশাহের দেওয়ান অর্থাৎ প্রধান রাজস্ব-সচিব ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[২০] এই অজুহাতে মুসলমানরা দাবী করে যে, আমরা যে দেওয়ানী বিভাগ চালাবার ভার পেয়েছিলাম, সেটা মুসলমানী কায়দা-কানুন মাফিক চালাতে বাধ্য ছিলাম।[২১] আমার মনে হয়, সন্ধির সময় উভয় পক্ষই নিঃসন্দেহে এই রকম বুঝেছিলেন। ইংরেজরা কয়েক বছর মুসলমান কর্মচারীদেরকে নিজ নিজ চাকরীতে রেখে দিল এবং যখন তারা সংস্কার সাধন করতে চাইলো, তখন তারা অতি সন্তর্পণে, প্রায় ভয়ে ভয়ে, একাজে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু সাবেক ব্যবস্থার উপরে মারাত্মক আঘাত এলো একরকম পরোক্ষভাবে, যার সম্বন্ধে কি ইংরেজরা কি মুসলমানরা, কেউই পূর্বে চিন্তা করতেও পারেনি। সেটা হলো লর্ড কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর কর্তৃক কতকগুলি নীতির পরিবর্তন, যার শেষ পরিণতি হয়েছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনে। এই ব্যবস্থার দ্বারা আমরা গোমস্তা ও সরকারের মধ্যবর্তী মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্থান অধিকার করলাম। এই মুসলমান উপরওয়ালাদের ঘোড়সওয়ার সিপাহীরাই ছিল খাযনা ওয়াসীল করার প্রধান হাতিয়ার। এরপর আমরা মুসলমান খাযনা-তহশীলদার ও তাদের সিপাহী-বরকন্দায সরিয়ে ফেলে প্রত্যেক জিলায় একজন কালেক্টার নিয়োগ করলাম এবং তাঁর

---

১৯ এই চিরন্তন সংঘাতের মজার উদাহরণ পাওয়া যাবে মিস্টার ওয়েস্টল্যাণ্ডের যশোর সম্বন্ধে রিপোর্ট থেকে এবং প্রত্যেক জেলার মহাফেযখানার নথিপত্র।

২০ ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ সালের ফরমান দেখুন---Mr. Aitchison's Treaties or on the Quarto Collection put forth by the East India Company in 1812, Nos. XVI to XX.

২১ ওহাবী মামলার কর্মচারী বলেন, 'আমরা একরম অঙ্গীকার করেছিলাম যে, শাসন-প্রণালীতে প্রচলিত মুসলমানী কায়দা-কানুন অব্যাহত রাখবো।'

কোর্টের সাধারণ পিয়াদার মতো কতকগুলি নিরস্ত্র পাইক-বরকন্দাজ রেখে দিলাম। তার ফলে মুসলমান ভদ্রশ্রেণীরা সাবেক খাযনার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হলো এবং জমির উপস্বত্বের কতকটা অস্থায়ী মালিকানা নিয়ে সাধারণ জমিদার হয়ে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই পরিবর্তন সূচিত হলো না, বরং চূড়ান্ত করা হলো। তার ফলে বড়ো বড়ো মুসলমান পরিবারগুলি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হলো। কারণ, এই বন্দোবস্তের আসল লক্ষ্য ছিল, যে-সব নিম্নস্তরের হিন্দু কর্মচারী চাষীদের সংগে সরাসরি কারবার করতো, তাদেরকেই জমির মালিক বা জমিদার স্বীকার করে নেওয়া। ১৭৮৮-১৭৯০ সালের হাতে লেখা সেটেলমেন্ট রিপোর্টগুলি আমি যত্নসহকারে পড়েছি। ১৭৯৩ সালের আইনে মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বিষয়ে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, এ-কথা আমি পরিষ্কার লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের সে আমলের রাজস্ববিষয়ক কর্মচারীরা পুরাতন ব্যবস্থার মাত্র তিনটি যোগসূত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন—প্রথম সরকার, দ্বিতীয় স্থানীয় গোমস্তা বা তহশীলদার, যারা চাষীদের নিকট থেকে সরাসরি খাযনা ওয়াশীল করতো এবং তৃতীয় খোদ্‌কস্‌ত্‌ অর্থাৎ যারা জমি চাষ করতো। আমাদের নয়া বন্দোবস্তে এই তিনটিই ছিল সাবেক ব্যবস্থার বিশেষ দরকারী জিনিস এবং ক্রমে ক্রমে মুসলমান দেওয়ানী বিভাগের অন্যান্য ব্যবস্থা হয় ছেঁটে ফেলা হলো, না হয় পরিত্যক্ত হলো। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বহু মুসলমান পরিবারের পক্ষে তালুকদারদেরকে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা মারাত্মক হয়েছিল। কারণ, এ-সব পরিবার যদিও নিজ এলাকার কিয়দংশ মৌরসী মোকররারী স্বত্বে বন্দোবস্ত দিতো, তাহলেও সকল ক্ষেত্রে অধস্তন জমিদারদের উপরে বেশ কর্তৃত্ব খাটাতো এবং দরকার হলে আবওয়াব হিসেবে এটাসেটা করে টাকাকড়ি আদায় করতো। যে ইংরেজ কর্মচারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ে বিশেষ পরিশ্রম করেছেন, তিনি লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত যে-সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোটখাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার ব'নে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো এবং তাদের

ঘরে সেই সব ধনদওলত জমা হতে লাগলো, যেগুলি পূর্বে মুসলমানদের আমলদারীতে তাহাদেরই ঘরে জমায়েত হতো।[২২]

অতএব এটাই হচ্ছে প্রথম নম্বর সাধারণ অবিচার, যার জন্যে খান্দানী মুসলমানরা ইংরেজদেরকে দায়ী করে। তারা প্রকাশ্যে বলে যে, আমরা বাঙলার দেওয়ানী একজন মুসলমান বাদশাহের নিকট থেকে এই শর্তে লাভ করি যে, আমরা মুসলমানী দরবারী দস্তুর মতো মেনে চলবো ; কিন্তু যখনই আমরা নিজেদেরকে বেশ শক্তিশালী বুঝলাম, তখনই সে-সব শর্ত ভংগ করলাম। এখানে আমাদের উত্তর এই যে, আমরা যখন বাঙলায় মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণের সুযোগ পেলাম, তখন দেখা গেল যে, সেটা এতো একদেশদর্শী, এতো দুর্নীতিতে ভরা এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এরকম ঘৃণার্হ যে, আমরা যদি সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতাম, তাহলে সভ্যজগতে আমাদের লজ্জা রাখবার ঠাঁই হতো না।[২৩] আমরা প্রত্যেক জিলার রিপোর্ট থেকে প্রমাণ করতে পারি যে, রাজস্ব আদায়ই ছিল মুসলমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। শাসনকার্যের প্রায় সবটাই ন্যস্ত ছিল মুসলমান খাযনা তহশিলদারদের হাতে। এজন্য তারা যতদিন সদরে খাযনা চালান দিতো, ততদিন যা খুশী করতে পারতো। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা হতো, কারণ জমিদারের খাযনা ওয়াসীল হওয়া চাই এবং তাদেরকেই শোষণ করা হতো, কারণ জমিদারের আমলাবর্গের

---

২২ মিস্টার জেমস্ ও কিনীলে।

২৩ হান্টারের এ উক্তি বিদ্বেষজাত ও ভ্রমাত্মক। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন: প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মুরশিদ কুলি ও আলীবর্দী খাঁ দেশের শান্তি ও শৃংখলা নিরংকুশ রেখেছেন, ধনসম্পদ ও বাণিজ্যর উন্নতি বিধান করেছেন, সর্বোপরি তাঁরা শাসন-ব্যবস্থার নয়া রূপ দিয়েছেন—যার কাঠামো এদেশের শাসনদণ্ড ব্রিটিশের করায়ত্ত হওয়ার পরও বহু বছর বজায় ছিল। ইংরেজরা যে ভূমিরাজস্ব নীতি গ্রহণ করে, তারও মৌলিক কাঠামো মুরশিদ কুলির সৃষ্টি এবং সেটাই আরও সংশোধিত তথা কঠোর ছাঁচে ঢালাই হয়ে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে এদেশে চালু হয়েছিল। আমাদের ব্রিটিশ শাসকরা তাঁর কাঠামোতে কিছু কিছু ধারা সংযোজন করেছেন মাত্র, কিন্তু তার মৌল ভিত্তি একই ছিল (History of Bengal Vol.II,P 396.) ডক্টর টয়েনবীও এই উত্তরাধিকারের লাভজনকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন (World and the West, P 35) (অ)

ধনসম্পদ চাই। অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ-ফরিয়াদে কোন কাজ হতো না। এ-সবে কান দেওয়া হবে কিনা, এ বিষয়ে জমিদার কিংবা তার আমলার মরযির উপর নির্ভর করতে হতো। ফরিয়াদীর বিচার পাওয়ার মোটেই উপায় ছিল না। কারণ অত্যাচারী তো জমিদারের আমলাদেরই একজন এবং শোষণকারী ধরা পড়লে তার বিচারকদের মধ্যেই নিজের সহায়ক খুঁজে পাওয়া সে মোটেই কষ্টসাধ্য মনে করতো না।'[২৪]

সত্যকথা এই যে, মুসলমানদের আমলদারীতে সরকার ছিল কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ধনী করবার যন্ত্র, সাধারণকে রক্ষা করবার কিছু নয়। আমার মনে হয়, এ-কথা কখনও শাসকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনি অথবা তাঁদের বিবেককে আঘাত করেনি যে, একটা বিরাট জনশক্তি চাষী হিসেবে রোদফাটা গরমে, অথবা বর্ষায়, শীতে খালি পায়ে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করছে আর শুধু কয়েকটি পরিবার প্রত্যেক জিলায় বিলাসিতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে জীবন যাপন করছে।[২৫] আমরা যখন পুরাতন শাসন-পদ্ধতি, যা অনুসরণ করবার চুক্তি করেছিলাম, পরিত্যাগ করি, তখনই জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। আমাদের দ্বারা খান্দানী মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বড়ো অত্যাচার হচ্ছে তাদের মালিকানা স্বত্ব নির্ধারিত করে দেওয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যন্ত তাদের মালিকানা স্বত্ব মোকররারী ছিল না, অথবা নির্ধারিত ছিল না। রাজশক্তির সর্বজনবিদিত মোটা রকম দাবী-দাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করে আমরা তাদের

---

২৪ মিস্টার ওয়েস্টল্যাণ্ডের District of Jessore, P. 67. আমি বহু কষ্টের সংগে আমার Annals of Rural Bengal-এর বরাত দেওয়া থেকে বিরত থাকছি। তবু এ-কথা বলি যে, যতোদিন বাঙলা দেশের নথিপত্র ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের নযরে না আসছে, ততোদিন ভারত সরকার ব্রিটিশ জাতির উপর একটা বড়ো ঐতিহাসিক অবিচার করছেন। কিন্তু যেহেতু যে সরকার এমন একটা বৃহৎ শক্তির সংগে মোকাবিলা করছে, যার তুলনায় রোমও একদিন ভেঙে পড়েছিল এবং যে সরকার ভারতের হাতোদ্যম বর্ণসমূহ ও নির্যাতিত জাতি থেকে একটা সম্পদশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, সে সরকার যদি নিজের গৌরব-গাথা লিখে না-ই রাখে, তাহলেও ক্ষমার যোগ্য।

২৫ দুশো বছর ভারত শাসনের পর ইংরেজরা এ দেশবাসীকে যে অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে, সেটা কি এর চেয়ে কোনো অংশে উন্নত?—(অ)

মধ্যস্বত্বগুলি মোকররারী করে দিয়েছি; কিন্তু এ কাজের দ্বারা এই স্বত্বগুলির আয় বাড়ানোও বন্ধ হয়ে গেছে। যে জাতটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লুঠতরাজ করতেই অভ্যস্ত ছিল, তারা একজন গবর্ণর-জেনারেলের এক কলমের খোঁচায় আমদানী করা নয়া ব্যবস্থা মুতাবিক শান্তির সংগে নিজ নিজ তালুক চালাবার কৌশল শিক্ষা করতে পারেনি। দেহাতে মুসলমানদের যুলুম-জবরদস্তি বন্ধ হলো, আবার ত্রিশ বছর পরে বায়্যাফতী আইন তাদের ভাগ্য একেবারে ওলটপালট করে দিল। বায়্যাফতী আইন সম্বন্ধে আমি পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো, কিন্তু এখানে শুধু এ-কথাটাই বলে রাখি যে, এই আইনের জোরে মালিকানা স্বত্বের দলীল দস্তাবেজগুলির বড়ো কঠোর ব্যাখ্যা করে কেবল রাষ্ট্রেরই মুনাফা বাড়ানো হয়েছিল; অথচ মুসলমানরা নিজেদের আমলদারীতে এ-সবের কোনো ধার ধারতো না। গত পঁচাত্তর বছরের বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলি হয় উৎখাত হয়ে গেছে, না হয় আমাদের শাসন আমলের নয়া-সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তারা গর্বিত, উদ্ধত, আকর্মণ্য হতে পারে, কিন্তু তারাই তো শেষ আমীর, বিজেতাদের বংশধর।

যাহোক, মুসলমানদের ধন-দওলতের দুটো বড়ো উৎস—সেনা বিভাগ ও দেওয়ানী বিভাগের উপরকার কার্যনির্বাহ সম্বন্ধে আমাদের যা করা উচিত ছিল, তাই করেছি। কিন্তু আমাদের কাজের ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তার দরুন বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা মুসলমান ভদ্র শ্রেণীর জন্য সেনাবিভাগ বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমরা বুঝেছি যে, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ছেঁটে ফেলা দরকার। আমরা তাদের শাসন বিভাগের সবচেয়ে বেশী লাভজনক কাজের একচেটিয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি, কারণ তাদের এ ক্ষতি জনসাধারণের ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর শাসনকার্যের জন্যই দরকার হয়েছিল। কিন্তু এ-সব যুক্তি যতোই ন্যায়সংগত হোক না কেন, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে পিষ্ট একটা পুরাতন অভিজাত সমাজকে কিছুতেই তা প্রবোধ দিতে পারে না। সেনাদল থেকে বর্জননীতি মুসলমানরা একটি সরকারী অবিচার মনে করে। তাদের সাবেক দেওয়ানী ব্যবস্থার পরিবর্তনকে তারা নিছক ওয়াদা খেলাফ বলে অভিহিত করে।

বাঙালী মুসলমানদের ধনদওলতের তৃতীয় উৎস ছিল বিচার-বিভাগ, শাসন-বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকরীতে একচেটিয়া অধিকার। এখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেশী গুরুত্ব দেওয়া অপ্রাসংগিক হবে ; কিন্তু এটা বাস্তব সত্যি যে, এ পর্যন্ত যে-সব ভারতবাসী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, অথবা হাইকোর্টের বেঞ্চে বিচারপতির পদলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। কিন্তু এ-দেশটা আমাদের হকুমাতে আসার কিছুদিন পর পর্যন্তও মুসলমানরা সবরকম কাজকর্ম নিজেদের হাতেই রেখেছিল। আমরা দেখেছি যে, মুসলমান কালেক্টররা খাযনা তহসিল করতেন, মুসলমান ফৌজদার ও কোতোয়ালরা পুলিস বিভাগে কর্তৃত্ব করতেন। মুর্শিদাবাদে নাযিমের রাজপ্রাসাদের সদরে এবং সারা প্রদেশময় একদল মুসলমান উচ্চ কর্মচারী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য করতেন। মুসলমান জেলারগণ ইচ্ছামতো সারা বাঙলা দেশে ঘুষ আদায় করতেন, না হয় জেলে অপরাধীকে অনাহারে রাখতেন। কাজী অথবা মুসলমান আইনজ্ঞরা দেওয়ানী আদালতে বিচার করতেন। এমন কি আমরা যখন সর্বপ্রথমে শিক্ষিত আহ্‌লে বিলাতী দিয়ে এ-দেশের বিচার কাজ চালাবার চেষ্টা পেলাম, তখনও মুসলমান আইনজ্ঞরা আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের সংগে বসবার রীতিমতো অধিকারী পেতেন। ইসলামী বিধি-ব্যবস্থাই এদেশের আইন-কানুন ছিল এবং সরকারী ছোটখাট অফিসগুলি মুসলমানদেরই সম্পত্তি ছিল। তারাই সরকারী ভাষা বলতে পারতো এবং প্রচলিত ফারসী অক্ষরে লেখা সরকারী নথিপত্র একমাত্র তারাই পড়তে পারতো।[২৬] কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা মুসলমানদের এই একচেটিয়া অধিকারে বিচার-বিভাগের চেয়ে শাসন-বিভাগেই ভীষণভাবে আঘাত হানলো, কিন্তু কোম্পানীর আমলদারীর প্রথম পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত মুসলমানরাই সরকারী কাজকর্মে সিংহের ভাগ পেতো। তার পরে অর্ধশতাব্দী ধরে যামানার পরিবর্তন হয় এবং প্রথমে ধীরে ধীরে হলেও শেষের দিকে দ্রুতগতিতে সরকারী কাজ মুসলমানদের নিজ ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় চালাবার নীতি অনুসৃত হয়। তারপর থেকেই হিন্দুরা দলে দলে ভর্তি হতে লাগলো

২৬ শিকস্‌তাহ অর্থাৎ ভাঙা। স্বরবর্ণবর্জিত একরকম সংক্ষিপ্ত উর্দু লেখা।

এবং অবশেষে তারাই অফিস-আদালত একেবারে পূর্ণ করে ফেললো। এমন কি, জিলার কালেক্টরীতে যেখানে পূর্বের মতো এখনও জানাশোনার মধ্যেই চাকরী দেওয়া হয়, সেখানেও মুসলমান আম্‌লা রইলো শ্বেতশ্মশ্রু অতি বৃদ্ধ, তাদের পর আর মুসলমান নেই। দশ বছর আগেও নাযীরের পদে কেবল মুসলমানই দেখা যেত, কিন্তু আজকাল জেলখানার দু'একটা সাধারণের অপ্রিয় চাকরী ছাড়া ভারতের সাবেক ভাগ্যবিধাতাদের অদৃষ্টে আর কিছুই জোটে না। বর্তমানে সমস্ত সরকারী অফিসের কেরাণীগিরিতে, আদালতের দায়িত্বসম্পন্ন পদে অথবা পুলিসের উচ্চবিভাগেও কেবল সরকারী স্কুলে শিক্ষিত উদ্যমী হিন্দু যুবকরাই চাকরী পায়।[২৭]

এ-সব সাধারণের নযরে-না-লাগা নন-গেজেটেড্ চাকরীয়ার ভীড় থেকে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিষয়েই আলোচনা করা যাক। এখানে ব্যক্তি-বিশেষের মতামতের চেয়ে সরকারী বিবরণীগুলিই অকাট্য প্রমাণ।

বছর দুয়েক আমি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখে[২৮] দেখিয়েছিলাম যে, বাঙলা দেশে বিচার ও রাজস্ব-বিভাগ থেকে মুসলমানদেরকে কিভাবে একেবারে ছেঁটে ফেলা হয়েছে; অথচ এ-সব বিভাগের চাকরীগুলি কত আশা-আকাঙ্খার। তাছাড়া সেগুলির বাঁটোয়ারাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। সেই প্রবন্ধগুলি সংগে সংগে ফারসীতে অনুবাদ করা হয় এবং এ্যংলো-ইণ্ডিয়ান ও এদেশীয় সংবাদপত্রে সেগুলি পুনরায় ছাপা হয় ও আলোচনাও হয়। বাঙলার সরকার কলকাতাবাসী মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করতে একটা কমিশনও বসালেন, কিন্তু এ-সবের আসল পরিণতি এই হয়েছে যে, সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে চলেছে।

আমার উপরের উক্তি সরকারী বিবরণী থেকেই প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর চাকরীর মধ্যে যেগুলি এক পুরুষ আগেকার, সেগুলি সম্বন্ধে মুসলমানদের কিছু অভিযোগ নেই। ১৮৬৯ সালের

---

২৭ এ-সব মন্তব্য সারা বাঙলা দেশ সম্বন্ধে খাটে, আরও বিশেষ খাটে পাটনা ও বাঙালোর বিভাগ ছাড়া প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে।

২৮ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'পাইয়োনীয়র' পত্রিকায়। আমি এ অধ্যায়ে সে-সব থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি।

এপ্রিল মাসের হিসেবে প্রকাশ, তখন একজন মুসলমান-প্রতি দু'জন হিন্দু ছিল। কিন্তু এখন একজন মুসলমান-প্রতি তিন জন হিন্দু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর (Second grade) চাকরিগুলিতে পূর্বে দু'জন মুসলমান প্রতি নয়জন হিন্দু ছিল, এখন একজন মুসলমান-প্রতি হিন্দুর সংখ্যা দশজনে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর (third grade) চাকরিতে পূর্বে চারজন মুসলমান ও সাতাশ জন হিন্দু এবং ইংরেজ ছিল, এখন সেখানে তিনজন মুসলমান এবং চব্বিশ জন হিন্দু ও ইংরেজ দাঁড়িয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর চাকরিতে ১৮৬৯ সালে ত্রিশজনের মধ্যে চারজন মুসলমান ছিল, এখন উনচল্লিশ জনের মধ্যে চারজনই আছে। শিক্ষানবীশদের মধ্যে আগে আটাশজনের মধ্যে দু'জন মুসলমান ছিল, এখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও মুসলমান নেই।

যাহোক, নামকরা বিভাগগুলির চেয়ে বাজে দফ্‌তরের চাকরিতে, যার বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাঙলার রাজনৈতিক দলগুলি ততো সজাগ নয়, মুসলমানদের অদৃষ্ট আরও স্পষ্টভাবে নযরে পড়ে। ১৮৬৯ সালে উক্ত দফতরগুলিতে এইসব চাকুরিয়া ছিলেন: তিন শ্রেণীর সহকারী সরকারী ইঞ্জিনিয়ার, এঁদের চৌদ্দজন হিন্দুর মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলেন না; ছয় জন শিক্ষাবীশ; এদের চার জন হিন্দু ও দুই জন ইংরেজ ছিল, কিন্তু একটিও মুসলমান ছিল না। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে পঁয়ষটি জন সাব-ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারভাইজার; এদের মধ্যে তেষট্টি জন হিন্দু ও মাত্র দু'জন মুসলমান ছিল। এ্যাকাউণ্ট অফিসে পঞ্চাশ জন হিন্দু ছিল, কিন্তু একজনও মুসলমান ছিল না এবং আপার সার্বডিনেট বিভাগে বাইশ জন হিন্দু ছিল, একজনও মুসলমান ছিল না।

তবুও এভাবে বাস্তব অবস্থার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, সিভিল লিস্ট (Civil List) এর পাতায় এ-সবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। আমি নীচে গেজেটেড্ চাকরির যেগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজদের প্রবেশাধিকার আছে, পরপৃষ্ঠায় তার একটা তালিকা দিলাম:

১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাঙলা দেশে সরকারী চাকরির বাঁটোয়ারা—

	ইংরেজ	হিন্দু	মুসলমান	মোট
কভেন্যান্টেড্ সিভিল সার্ভিস (ইংলণ্ডে মহারানীর নিযুক্ত)	২৬০	০	০	২৬০
নন্‌রেগুলেটেড্ জেলাসমূহে বিচার বিভাগের কর্মচারী[২৯]	৪৭	০	০	৪৭
একস্ট্রা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
ইনকাম্-ট্যাক্স এসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট	৩৩	২৫	২	৬০
ছোট আদালতের জজ ও সাব-জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুনসেফ্	১	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগের সর্বশ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
পি, ডব্লিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ	১৫৪	১৯	০	১৭৩
ঐ নিম্নবিভাগ	৭২	১২৫	৪	২০১
ঐ এ্যাকাউণ্ট বিভাগ	২২	৫৪	০	৭৬
চিকিৎসা বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, জেলা দাতব্য হাসপাতাল প্রভৃতি				
জেলার ডাক্তার ইত্যাদি	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
শিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
কাস্টমস্, মেরিন সার্ভে আবগারী প্রভৃতি বিভাগ[৩০]	৪১২	১০	০	৪২২
সর্বমোট	১৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

একশো বছর আগে মুসলমানরা সরকারী বড়ো বড়ো চাকরী একচেটিয়া ভোগ করতো। মুসলমানরা নিজেদের দস্তরখান থেকে দু'এক টুকরো রুটি যা ছুঁড়ে দিতো, হিন্দুরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাই গ্রহণ করতো;

২৯ এটি ও পরবর্তী চাকরিগুলি প্রাদেশিক সরকারের।

৩০ যাজক বিভাগের চাকরি ব্যতীত; কোন কোন আবগারী চাকরি ননগেজেটেড্।

ইংরেজদের সাক্ষাৎ মিলতো দু'চারটা কুঠি বা কেরানীর পদে। পূর্ব পৃষ্ঠায় যে তালিকা দেওয়া হলো, তাতে দেখা যাবে যে, মুসলমানরা হিন্দুর অনুপাতে সাত ভাগের এককভাগেরও কম, হিন্দুরা ইংরেজদের অনুপাতে অর্ধেকেরও বেশী, কিন্তু মুসলমানরা ইংরেজদের অনুপাতে চৌদ্দ ভাগের একভাগেরও কম। একশো বছর আগে যে জাতির সরকারে ছিল একচেটিয়া অধিকার, আজ শাসনবিভাগের সকল স্তরেই তাদের আনুপাতিক সংখ্যা তেইশ ভাগের একভাগেরও কম হয়ে গেছে। এ তো গেল গেজেটেড চাকরী সম্বন্ধে, যেগুলির বাঁটোয়ারা সতর্কভাবে লক্ষ্য করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহর কলকাতার অন্যান্য নযরে-না-লাগা অফিসে মুসলমান বিতাড়নের কাজ আরও ভালভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে একটা বড়ো ডিপার্টমেন্টে এমন একজন মুসলমান কর্মচারী খুঁজে পাওয়া যায়নি, যার দ্বারা মুসলমানী ভাষা[৩১] পড়ানো যেতে পারে। সত্য কথা বলতে গেলে, এখন একজন মুসলমান কলকাতার কোনো অফিসে দরওয়ান, হরকরা কিংবা দফতরীর চেয়ে উঁচু পদের চাকরী পাওয়ার আশাই করতে পারে না।

এ-সবের কারণ কি? হিন্দুরাই কি মুসলমানদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং পাল্লায় হারিয়ে দেওয়ার জন্য কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেরই কি অভাব ছিল, কিংবা মুসলমানদের জন্য আরও বহু জীবনোপায় খোলা থাকার দরুন তারা সরকারী চাকরী-জীবন পছন্দ করে না এবং এজন্য হিন্দুদেরকে খোলা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুদের উচচ বুদ্ধিমত্তা আছে স্বীকার করি। কিন্তু তাদের সার্বভৌম ও অপরিসীম শ্রেষ্ঠতাই তাদেরকে সরকারী চাকরীতে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে, বর্তমানে তেমন কিছু নযরে পড়ে না এবং এরকম যুক্তি ও তাদের অতীত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসল সত্য এই যে, যখন এ দেশটা আমাদের অধিকারে আসে, তখন মুসলমানরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা শুধু দরাজ্‌দিল ও সবল বাহু নিয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল না, তারা সরকারী গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত হাতে-কলমের বিদ্যায়ও ওস্তাদ ছিল। তবু আজ মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরী ও বেসরকারী কাজকর্ম থেকে সমানভাবে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৩১ ফরাসী—(অ)।

ভদ্রঘরের মুসলমানদের জন্য জাতিগত পেশা হিসেবে এখন খোলা আছে একমাত্র আইন ব্যবসায়। চিকিৎসা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। আইন ব্যবসাও সরকারী চাকরীর মতো আরও কড়াকড়িভাবে মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বাঙলা দেশের হাইকোর্টে দু'জন হিন্দু জজ আছেন, কিন্তু একজনও মুসলমান নেই।[৩২] বাস্তবিক যে জাতি একদিন সমগ্র বিচারবিভাগ একচেটিয়াভাবে অধিকার করতো, আজ তাদের মধ্য থেকে একজন হাইকোর্ট জজ নিয়োগ করার কল্পনাও হিন্দু ও ইংরেজদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। ১৮৬৯ সালে আমি যখন ভারতীয় আইন ব্যবসায়ের পরিসংখ্যান গ্রহণ করি, তখন এরকম অবস্থা ছিল: মহারানীর ছয়জন আইন কর্মচারীর মধ্যে চারজনই ইংরেজ ও দু'জন হিন্দু ছিলেন, কিন্তু একজন মুসলমানও ছিলেন না। হাইকোর্টের কুড়ি জন উল্লেখযোগ্য কর্মচারীর মধ্যে সাতজন হিন্দু ছিলেন, কিন্তু একজনও মুসলমান ছিলেন না। ব্যারিস্টারদের মধ্যে তিনজন হন্দু, একজনও মুসলমান নেই।

কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক খবর হচ্ছে, হাইকোর্টের উকিলদের তায়দাদ সম্বন্ধে। আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের জানা খবর এই যে, ব্যবসায়ের এই দিকটা ষোলআনাই ছিল মুসলমানদের হাতে। উকিলদের বর্তমান তালিকাখানি ১৮৩৪ সালের তৈরী তাঁদের মধ্যে ১৮৬৯ সালে একজন ইংরেজ, একজন হিন্দু ও দু'জন মুসলমান বেঁচে ছিলেন। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের তায়দাদ হিন্দু ও ইংরেজদের তায়দাদের সমান ছিল; আনুপাতিক হার ছিল ছয়জন মুসলমান এবং সাতজন হিন্দু ও ইংরেজ। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত যে-সব উকিল ভর্তি হন, ১৮৬৯ সালে তাদের মধ্যে শুধু মুসলমানরাই বেঁচে ছিলেন। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের দখল বজায় রেখেছিলেন এবং তখনও তাঁদের তায়দাদ হিন্দু ও ইংরেজদের তায়দাদের সমান ছিল। ১৮৫১ সালের পর থেকেই পরিবর্তন শুরু হলো, নয়া দলের আবির্ভাব হতে লাগলো। যোগ্যতার হরেক রকম নয়া মাপকাঠির চাহিদা হলো। তার ফলে দেখা গেল যে, ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল

৩১ এগুলি প্রথমশ্রেণীর চাকরি। জজদের মাহিনা সালিয়ানা প্রায় ৭২,০০০ টাকা।

পর্যন্ত যে দুশো চল্লিশ জন দেশী উকিলকে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দুশো উনচল্লিশ জন হিন্দু এবং মাত্র একজন মুসলমান।

এ ব্যবসার অন্য দিকটা এবারে দেখা যাক। হাইকোর্টের আদিম বিভাগে এটর্নী, প্রক্টর ও সলিসিটরদের মধ্যে ১৮৬৯ সালে সাতজন হিন্দু ছিলেন, কিন্তু একজনও মুসলমান ছিলেন না। উচ্চতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা-নবিশদের মধ্যে ছাব্বিশ জন হিন্দু, কিন্তু একজনও মুসলমান ছিলেন না। এই ব্যবসার যেদিকে তাকাই না কেন, একই পরিণতি নযরে পড়বে। ১৮৬৯ সালে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের অফিসে সতেরজন উল্লেখযোগ্য চাকুরীয়া ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন ইংরেজ ও এগারোজন হিন্দু, কিন্তু একজনও মুসলমান নেই। ক্লার্ক-অব-ক্রাউনের অফিসে ট্যাক্স 'অফিসারের অধীনে চারজন ইংরেজ ও পাঁচজন হিন্দু, কিন্তু একজনও মুসলমান নেই। আদালতের অলিগলিতে, এ্যাকাউন্ট অফিসে, শেরিফের অফিসে, করোনারের অফিসে এবং অনুবাদকের অফিসে কুড়িজন চাকুরীয়ার নাম দেখা যায়; তাঁদের মধ্যে আটজন ইংরেজ, এগারজন হিন্দু এবং মাত্র একজন বাঙলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একজন সামান্য 'মওলা' বা আইন কর্মচারী, তাঁর মাহিনা হফ্তায় ছয় শিলিং মাত্র।[৩৩]

বাকী থাকে চিকিৎসা ব্যবসার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে দেশীয় ডাক্তারেরা যে চিকিৎসা করেন, তা অভিজাত মুসলমানদের নিকট সম্মানের কাজ নয়। একজন অভিজাত মুসলমানের দু'জন চিকিৎসক থাকেন। তাঁদের একজনের উপাধি 'তবীব্', ইংরেজ লেখকরা যাঁর নাম দিয়েছেন 'হাকিম'। তিনি মক্কেলদের ঘরে খানাপিনা করেন ও খাতিরের সংগে শরীক হন। অন্যজনের উপাধি 'জাররা', যাঁর বাঙলা প্রতিশব্দ হচ্ছে নাপিত। তিনি কামানো থেকে অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত সবরকম কাটা-ফোঁড়ার কাজ করেন। ওষুধ ও অস্ত্র-চিকিৎসার মধ্যে মুসলমানরা এরকম বাঁধাবাঁধি বাচ-বিচার করেন যে, একজন নামকরা তবীব একটা ঘা বেঁধে দিতেও রাযী হবেন না। কিন্তু আমাদের সার্জনদের এ-সব বালাই নেই। চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকিছুই তাঁদের এলাকায় পড়ে। এজন্য আজ খাঁটি মুসলমান চিকিৎসকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে

৩৩ প্রায় চার টাকা---(অ)।

গেছে। পশ্চিম ভারতের বড়ো বড়ো শহরে তাঁদের দু'একজনের দেখা মেলে, কিন্তু বাঙলা দেশে তাঁদের অস্তিত্ব নেই। আজকাল চিকিৎসার কাজ অশিক্ষিত মুসলমান হাজ্‌ম্‌ (নাপিত) এবং হিন্দু ডাক্তারদের হাতে পড়েছে।[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে যদিও উত্তর ভারতে পুরাতনপন্থী মুসলমান চিকিৎসকের দেখা মেলে, তাহলেও দেখা যায়, তিনি উদাসীন পণ্ডিত মাত্র, হাতে-কলমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নন। তিনি আরবী ও ফারসী হাতে-লেখা কেতাব থেকে তাঁর শিক্ষা আহরণ করেন এবং আমাদের ইংরেজী চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে ঘৃণিত হাজ্‌মের ব্যবসার শামিল মনে করে ভুল করেন। তার ফল দাঁড়িয়েছে যে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারী প্রশংসনীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাঙলা দেশের কোন ভদ্রঘরের মুসলমান এদিকে আদৌ পা বাড়ান না। নিম্নস্তরের দরিদ্র ঘরের অর্ধশিক্ষিত মুসলমান ছেলেরা শুধু ভীড় করে আসে পল্টন-দলের ওষুধ তৈরী করার মতো যৎসামান্য বিদ্যা বিনাখরচে শিখতে। তারা বাস্তবিকপক্ষে পুরাতন যামানার হাজ্‌মদেরই মতো। ভদ্রঘরের মুসলমানরা তাদেরকে ঘৃণা করে। যে কয়জন মুসলমান চিকিৎসক আছেন তাঁরা তাঁদের স্বীকারই করেন না; তাঁরাও তাঁদের বিদ্যার বহর-অনুপাতে এতোখানি উদ্ধত যে, পল্টনী শাসনের চাপেই তাঁরা সংযত থাকতে বাধ্য হন। বহু হিন্দু ডাক্তারের সংগে পরিচয় করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের ব্যবহারে ও শিক্ষার দওলতে তাঁরা তাঁদের মহৎ ব্যবসায়ে আমাদের সম্মানের পাত্র; কিন্তু আমি একটিও এমন মুসলমান ডাক্তার দেখিনি। বাস্তবিক, মুসলমানরা চিকিৎসা ব্যবসার কোনও স্তরেই প্রবেশ করবার আশা রাখে না। ১৮৬৯ সালের সরকারী বিবরণী এই রকম ছিল: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন এম-ডি উপাধিধারীর মধ্যে তিন জন হিন্দু ও একজন ইংরেজ ছিলেন, কিন্তু একজনও মুসলমান নেই; এগারো জন এম-বি-র মধ্যে দশজন হিন্দু ও একজন ইংরেজ ছিলেন, একশো চারজন এল-এম-এস উপাধিধারীর মধ্যে আটানব্বই জন হিন্দু, পাঁচজন ইংরেজ ও একজন মাত্র মুসলমান ছিলেন। কিছুদিন আগে সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট দেশীয় ডাক্তারদের

৩৪ হিন্দু চিকিৎসক দুরকমের: কবিরাজ, তারা হাতুড়ে ও গাছ-গাছড়ার বটিকা দিয়ে চিকিৎসা করে; আমাদের কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার।

মধ্যে দু'জনকে 'বাহাদুর' খেতাব দান করেন। রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার দিক দিয়ে একথা যুক্তিযুক্ত যে, এই খেতাব দুটোর একটি হিন্দুদের ভাগে ও একটি মুসলমানদের ভাগে পড়া উচিত। সকলেই জানেন, মুসলমানরা এই খেতাব কতো সম্মানজনক মনে করে। এ-সব সত্ত্বেও আমি শুনেছি যে, যে মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চ গুণাবলীর জন্য খেতাব লাভ করেছিলেন, তাঁকে তাঁর খেতাব মুসলমান ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদা দিতে পারেনি। সত্য কথা এই যে, মুসলমানরা আমাদের স্কুলে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যা ভদ্রলোকের উপযুক্ত ব্যবসা হিসেবে গণ্য করে না এবং তাদের সামাজিক সংস্কার তাদেরকে এমন একটা জীবনোপায় থেকে ঠিক তেমনিভাবে দূরে রেখে দিয়েছে, যেমনভাবে উচ্চশিক্ষিত হিন্দু যুবকরা সরকারী চাকরি থেকে তাদেরকে একেবারে বঞ্চিত করে ফেলেছে।

বাঙালী মুসলমানদের খবরের কাগজের প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের চেয়ে বেশী করুণ কোনো কিছু আমার চোখে পড়েনি। কলকাতায় ফারসী ভাষায় লেখা খবরের কাগজে কিছুদিন আগে এরকম লেখা হয়; 'ছোটো বড়ো সবরকম চাকুরী ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে বিশেষ করে হিন্দুদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সব জাতির প্রজাকে সরকার সমান নজরে দেখতে বাধ্য, কিন্তু যামানা আজকাল এমন হয়েছে যে, সরকারী চাকরী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য গেজেটে মুসলমানদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়। কিছুদিন আগে সুন্দরবন অঞ্চলের কমিশনারের অফিসে কয়েকটি চাকরী খালি বলে কমিশনার সাহেব সরকারী গেজেটে সে সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, চাকুরিগুলি কেবল হিন্দুদেরকে দেওয়া হবে। মুসলমানরা আজকাল এতোদুর নীচে নেমে গেছে যে, তারা সরকারী চাকরীর জন্য উপযুক্ত হলেও সরকারী ইশ্‌তেহারে তাদেরকে বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়। কেউ তাদের অসহায় অবস্থা চেয়ে দেখে না এবং সরকারী উপরওয়ালারা তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাযী নন।'[৩৫]

---

৩৫ দূরবীন, জুলাই ১৮৬৯। ফারসী কাগজটির সংবাদের সত্যতা যাচাই করবার মতো আমার নিকট বর্তমান তেমন সরকারী কাগজপত্র নেই। কিন্তু সংবাদটি তখন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অথচ কোনো প্রতিবাদ উঠেনি।

কিছুদিন আগে উড়িষ্যার মুসলমানরা কমিশনার সাহেবের[৩৬] নিকট যে দরখাস্ত পেশ করে, তার কতকগুলি লাইন তুলে দিচ্ছি, তার ভাষার আড়ম্বর হয়তো অনেকের হাসির খোরাক জোগাবে; কিন্তু এদেশের সাবেক মনিবেরা শুক্‌নো রুটির জন্য ভাঙাগড়া ইংরেজীতে যে আর্‌যি পেশ করেছেন, তার করুণ দৃশ্যটা আমার মতো সকলকেই স্তব্ধ করে দেবে: 'দয়াশীলা মহারানীর একান্ত অনুগত প্রজা হিসাবে আমরা আশা করি যে, সকল চাকুরীতে আমাদের সমান দাবী আছে। সত্য কথা এই যে, উড়িষ্যার মুসলমানদেরকে ক্রমাগত নীচে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, তাদের উঠবার আশা নেই। ভদ্রঘরে জন্ম নিয়ে বেকার হয়ে মুরুব্বিহীন অবস্থায় আমরা আজ পানি থেকে ডাঙায় তোলা মাছের দশায় পড়েছি। মুসলমানদের এই ভয়াবহ দুর্গতির বিষয় আজ আপনার হুযুরে পেশ করছি; কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজাই ন্যায়বিচার পাবে। পুরাতন আমলদারীতে আমরা যে-সব চাকুরী পেতাম, আজ সে-সব না পাওয়াতে আমরা এরূপ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছি ও চিরস্থায়ী হতাশায় ডুবে যাচ্ছি যে, আমরা আজ সত্যিকারভাবে একমনে প্রকাশ করছি যে, আমরা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাযী আছি, হিমালয়ের তুষার ঢাকা সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে প্রস্তুত আছি, এমন কি সাইবেরিয়ার নির্জনতম অঞ্চলেও ছুটতে রাযী আছি, যদি এই প্রতিশ্রুতি পাই যে, এরকম ছুটাছুটি করার ফলে হফ্‌তায় অন্ততঃ দশ শিলিং মাহিনার কোন সরকারী চাকুরী আমাদের বরাতে জুটতে পারে।'

মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকরী ও এ-সব নির্ভরেযাগ্য জীবনোপায়গুলি তো বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো? বাঙলার মুসলমানরা বুদ্ধিমত্তায়তো কম নয় এবং দারিদ্র্যের ভীতি তাদেরকে অবস্থার উন্নতির জন্য কোন একটা কাজ করতে সর্বদাই উত্তেজিত করে। সরকার বাঙলা দেশ স্কুল দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন, বাংলার বহু জিলাই মুসলমানে ভর্তি; কিন্তু সরকারী স্কুলগুলি এমন একদল মুসলমান গড়ে তুলতে পারলো না, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩৬ মিঃ আর, ডবলিউ মলনী সি, এস-এর নিকট কপির জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

সাফল্যের সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারে, অথবা যে কোন চাকুরী বা ব্যবসায়ে মাথা গলাতে পারে; অথচ সেই স্কুলগুলিই বছরে বছরে অসংখ্য সুশিক্ষিত, উদ্যমী ও বুদ্ধিদীপ্ত হিন্দু যুবক তৈরী করছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে এবং পরবর্তী জীবনে ধন ও যশ লাভের সব ক্ষেত্রই একচেটিয়াভাবে অধিকার করছে।

এজন্য দায়ী কে? সত্য কথা এই যে জনশিক্ষাপ্রণালী হিন্দুদিগকে বহু শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগিয়েছে, তাদের নির্জীব জনগণকে একটা জাতির মহৎ গুণে প্রাণান্ত করে তুলেছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী মুসলমানদের রীতিনীতির বিরোধী, প্রয়োজনের পরিপন্থী ও ধর্মের চোখে হেয়। আমাদের শাসনে হিন্দুরা তাদের অদৃষ্ট ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করেছে, যেমন তারা মেনে নিয়েছিল মুসলমানদের আমলদারীতে। আজকাল পদোন্নতি হয় ইংরেজী ভাষায় দখলের উপর, অতএব হিন্দুরা ইংরেজী শেখে। আগেকার যামানায় উন্নতির আশা ছিল ফারসীতে দখল থাকলে, ফলে আগে হিন্দুরা ফারসী পড়তো। ১৫০০ সালের পূর্বেই তারা ফারসীতে কিতাব লেখা শুরু করেছিল; সে আমলের হিন্দু কবির কবিতা আজও অনেকে জানে এবং কাফির হলেও মুসলমান ছেলেদের উস্তাদ হিসেবে ফারসী-জানা হিন্দু সকলের সমাদর লাভ করতো, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধ্যাপনাও করতো। আকবরের আমলে হিন্দুরা একজন গুণী বাদশাহ্ পেয়েছিল, তখন তাদের একজন নামযাদা কবিও ছিলেন, কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও যতোদিন হিন্দুরা ফারসী শেখা লাভজনক দেখেনি, ততোদিন তাদের জনসাধারণ ফারসী পড়েনি। ষোল শতকের বাদশাহীর রাজস্ব-সচিব হিন্দু ছিলেন; তিনি হুকুম জারী করেন, অতঃপর সরকারী দফতরে হিসেব ফারসীতে লেখা হবে। অতএব অধস্তন রাজকর্মচারী হিন্দুরা প্রত্যেকেই ফারসী শিখে ফেললেন। এই রকম আমরা যখন সরকারী দফতরে ইংরেজী ভাষা আমদানি করলাম, তখন কর্ম-জীবনে উন্নতি লাভের আশায় সুবোধ ছেলের মতো হিন্দুরা ইংরেজী শিখতে লাগলো। মুসলমানী আমলের সরকারী দফতরে প্রচলিত পুরাতন ভাষা ও আমাদের আমলের নয়া ভাষা হিন্দুদের নিকট সমান বিদেশী ভাষা মাত্র। তারা দুটো ভাষার বিষয়েই উদাসীন, শুধু উন্নতির গরয তাদেরকে এ দু'টো শিখতে বাধ্য করেছে। বাস্তবিক

কথা এই যে, আমাদের সরকারী স্কুলগুলি হিন্দুদেরকে মাত্র আধা খরচায় উন্নতির তাগা-তাবিজ দিচ্ছে; অতএব, তারা আগেকার রেওয়ায ত্যাগ করে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেছে।

কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। এ দেশটা আমাদের হুকুমাতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা তাদেরকে ভালোভাবে জানেন, তাঁর কথায়ঃ 'ভারতীয় মুসলমানদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালী ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা প্রণালীর চেয়ে নিম্নস্তরের হলেও কোনও ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞানবিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরাতন ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব প্রণালীর চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থাতেই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল এবং তার মধ্য দিয়েই হিন্দুরা স্বদেশের শাসন ব্যাপারে ছোটখাট অংশ পাওয়ার হকদারও হয়েছিল।' ৩৭ আমাদের আমলদারীর প্রথম পঁচাত্তর বছর ধরে এই ব্যবস্থাকেই আমরা আমাদের শাসন-কাজ চালাবার উপযোগী কর্মচারী গড়ে তোলবার জন্য কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা নয়া ব্যবস্থায় শিক্ষা বিস্তার শুরু করে দিয়েছি এবং আমাদের প্রবর্তিত অবস্থায় যেমনি এক নয়া দল শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, অমনি আমরা মুসলমানদের পুরাতন ব্যবস্থা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তার ফলে মুসলমান যুবকদের সামনে সরকারী জীবনোপায়ের সব দরওয়াজাই বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলমানরা যদি বুদ্ধিমান হতো, তাহলে তারা যামানার ওলট-পালট বুঝতে পারতো এবং তার দরুন বরাতে যা ঘটছে, তা-ই স্বভাবিকভাবে মেনে নিতো। কিন্তু একটা পুরাতন বিজেতা জাতি এতো সহজে তাদের গৌরবময় যুগের পরিবর্তন মেনে নিতেও পারে না। বাঙালী মুসলমানরা এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী হলো না, যার দওলতে তারা যাদেরকে এতোকাল শাসন করে এসেছে, পুতুল-পূজারী ও গোলামের

৩৭ মিঃ ই, সি, বেইলী, সি. এস. আই.

জাত হিসেবে ঘৃণা করে এসেছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবার এতোটুকুও সুবিধা পেতে পারে না। ইসলাম ধর্মও এই নয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের বিরাগ সমর্থন করলো এবং বহুদিন এই সমস্যার সমাধান হলো না যে, মুসলমান ছেলে তার আত্মার বিনাশ না ঘটিয়েও আমাদের সরকারী স্কুলে লেখাপড়া শিখতে পারে কি-না। যদি আমরা নয়া শিক্ষাব্যবস্থা আহ্‌লে-বিলাতী দিয়েই চালিয়ে যেতাম কিংবা সরকারী দফতরে আমাদের ভাষা জোর করেই চালিয়ে দিতাম, তাহলে হয়তো মুসলমানদের ধর্মীয় বাধা একটা বিশেষ দিকে এড়ানো যেতো। কারণ মুসলমানরা স্বীকার করে যে, ঈসায়ী ধর্ম তাদের পয়গম্বর-প্রচারিত ধর্মের চেয়ে সত্যি হিসাবে যতোই ছোট হোক, বনি-আদমকে যতোগুলি ধর্ম পয়গম্বরমারফত শেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে। কিন্তু হিন্দুধর্ম একটা জঘন্য কুসংস্কার, কেবল শয়তান-পূজো ও পুতুল-পূজোর রীতি;'লা-শরীকআল্লাহ্' জ্ঞানের এক কণা আলোও তার মধ্যে নেই[৩৮]। বাংলা দেশের সরকারী স্কুলগুলিতে হিন্দুদের ভাষায়[৩৯] পড়ানো হয় এবং মাষ্টারগুলিও হিন্দু। মুসলমানরা একযোগে পুতুলপূজারীদের নিকট থেকে তাদের ভাষায় শেখানো শিক্ষাকে বর্জন করলো অত্যন্ত ঘৃণার সংগে।

ধীরে ধীরে তাদের এই অবজ্ঞা পরিবর্তিত যুগের প্রয়োজনের নিকট নতি স্বীকার করলো। যে ধর্ম গোড়ার দিকে আমাদের স্কুলগুলির প্রতি তাদেরকে বিরাগভাজন করেছিল, তার বাধাও স্তিমিত হয়ে এল। সে আমলের মশহুর আলীমদের বিশেষত হিন্দুস্তানের সূর্যসম প্রখ্যাত আলীম সাহেবের[৪০] ফতোয়া ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে আদায় করা হলো। এই বিখ্যাত আ'লীম সাহেব ইতিপূর্বেই ইংরেজদের অধীনে চাকরী লওয়ার সপক্ষে মতপোষণ করেছিলেন। তাঁর ফতোয়ায় কোনো কোনো সরকারী চাকুরী গ্রহণযোগ্য; কোনোটি ভালোও নয়, মন্দও নয়, আবার

৩৮ এ-কথা বলার দরকার রাখে না যে, আমি এই মত পোষণ করিনে, যদিও কোনো কোনো খ্রীস্টান এ মতে বিশ্বাসী। মুসলমানরা যে-সব জাতির উপর প্রভুত্ব করেছে, তাদের ধর্মের উপর আঘাত করে তারা এভাবেই নিজেদের গোঁড়ামির মূল্য দিয়েছে।

৩৯ হিন্দুর ভাষা অর্থে এখানে 'সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ভাষা'—(অ)।

৪০ শামসুল হিন্দ্ শাহ্ আবদুল আযীয—(অ)।

কোনোটি গ্রহণ করা পাপ। অতএব ইংরেজরা যদি মুসলমানদেরকে প্রশংসনীয় চাকুরীতে, যেমন কাজী হিসেবে, সড়ক ও সরাইখানার তদারক কাজে, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী অথবা চোর-ডাকাতের নির্মূল করার কাজে বহাল করে, তাহলে ভালো। কারণ, 'এইরূপেই হযরত ইউসুফ মিসরের ফির'আউনের অধীনে খাজাঞ্চী ও কোতোয়ালীর সরদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এমনিভাবেই মাননীয়া মুসি ফির'আউনের অধীনে হযরত মুসাকে দুধ খাওয়াতে রাযী হয়েছিলেন।' কিন্তু যে-সব চাকুরীতে ঢুকলে মানুষকে অধর্মের পথে টানে, সে সব চাকুরী গ্রহণ করলে মুসলমান গোনাহ্গার হবে।

তাঁর মুরীদরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, মন্তেক বা তর্কশাস্ত্র এবং ইংরেজী শেখা জায়েয কি-না, তখন তিনি উত্তর দিলেন: 'মন্তেক বা তর্কশাস্ত্র শেখা নাজাত বা মুক্তিলাভের জন্য দরকার নয়; কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষার মতো বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে তর্কশাস্ত্রে শিক্ষালাভ সহায়ক মাত্র। কেউ যদি ধর্মে সন্দেহ উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে তর্কশাস্ত্র শেখে, তাহলে সে পাপী। আর যদি শিক্ষার উদ্দেশ্যেই শেখে, তাহলে তার পাপ হয় না। কিতাব পড়ার জন্য, চিঠিপত্র লেখার জন্য এবং শব্দের অর্থ-রহস্য শেখার জন্য ইংরেজী শেখা জায়েয; কারণ, খোদ পয়গম্বর সাহেবের আদেশেই জায়েদ ইবনে সাবিতও য়হূদী ও খীষ্টানদের শব্দমালা শিখেছিলেন, ফলে পয়গম্বর সাহেবের নিকট য়হূদীদের ও খৃীষ্টানদের যে-সব চিঠিপত্র আসতো, সে-সবের তিনি সহজেই উত্তর দিতে পারতেন; কিন্তু কেউ যদি ইংরেজী শেখে শুধু আনন্দ লাভের জন্যই, কিংবা ইংরেজদের সহ্বত-সাহচর্য লাভের লোভে, তাহলে সে শরার খেলাফ করে ও তার পাপ হয়। এর সংগে লোহার ব্যবহারটা তুলনীয়: যদি লোহা দিয়ে চোর তাড়াবার বা পাকড়াও করবার হাতিয়ার তৈরি হয় তাহলে পুণ্যের কাজ; কিন্তু তা দিয়ে যদি চোরকে সাহায্য করার কিংবা তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেটা হলো পাপের কাজ।'

মুসলমানদের মধ্যে যারা বেশী গোঁড়া, তারা অবশ্য আমাদের সরকারী স্কুলে শিক্ষা নেওয়াটা একেবারে মেনে নেয়নি। তাদের মধ্যে যারা পার্থিবমনা, তারা এই শিক্ষার দিকে এগিয়ে এসেছে; তেমনই

যারা ধর্মান্ধ, তারা আরও পিছিয়ে গেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তারা হিন্দুদের থেকে পোশাকে, সম্ভাষণে এবং অন্যান্য বাহ্যিক ব্যবহারে এতো বেশী পৃথক হয়ে গেছে, যা তাদের হুকুমাতের দিনেও তারা কখনও দরকার মনে করেনি। ১৮৬০-১৮৬২ সালেও আমাদের স্কুল সমূহে দশটি হিন্দুর জায়গায় একজন মুসলমান ছিল এবং যদিও তার পরে আনুপাতিক সংখ্যাটা কিছু বেড়েছে, সেটা আমাদের সরকারী স্কুল সমূহে নয়; সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন; ইংরেজী স্কুল সমূহে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়েনি এবং ওহাবীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত সেই কর্মচারীটি, যিনি পূর্ব বাঙলার সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিফহাল, বলেন যে, মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে তাদের ছাত্র-সংখ্যা মোটেই আশাপ্রদ নয়[৪১]।

সত্য কথা এই যে আমাদের জনশিক্ষাপ্রণালী মুসলমানদের তিনটি সরল সহজ প্রবৃত্তিকে একেবারে উপেক্ষা করেছে। প্রথমত, এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় বাঙলা ভাষার মাধ্যমে, যে ভাষা শিক্ষিত মুসলমান অবজ্ঞা করে এবং হিন্দু শিক্ষক দিয়ে, যাদেরকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ই ঘৃণা করে। বাঙালী হিন্দু শিক্ষক তার মাতৃভাষায় কথা বলে, আর বলে নিকৃষ্ট উর্দুতে, যা তার নিকট আমাদের মতোই শিখে নেওয়া ভাষা। তাছাড়া, তার শান্ত ভীরু স্বভাবের দরুন সে মুসলমান ছেলেদেরকে শাসনে রাখার একেবারে অনুপযুক্ত। এক মুসলমান জোতদার অল্পদিন আগে একজন সরকারী কর্মচারীকে বলেছিল, 'দুনিয়ার কিছুতেই ভুলে যেয়ে আমার ছেলেকে বাঙালী শিক্ষকের[৪২] নিকট পাঠাতে পারবো না।' দ্বিতীয়ত, আমাদের পাড়াগাঁয়ের স্কুলগুলিতে মুসলমান ছেলেকে এমন সব ভাষা শেখানো হয় না, যার ফলে সে জীবনে ভদ্র অবস্থায় উন্নীত হতে

৪১ প্রতি বছর পরীক্ষার তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, মুহম্মদীয় নাম অতি বিরল দৃষ্টিগোচর হইবে; ভারতবর্ষের কোনও মংগলকর কার্যে দেখ, অত্যল্প সংখ্যক মুসলমানকে অগ্রসর পাওয়া যাইবে---১৮৬৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভাইস চ্যান্সেলর সীডনকার কর্তৃক বক্তৃতা,: ১২ই মার্চ, ১৮৬৮ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত---(অ)।

৪২ বাঙ্গালী' শব্দে হিন্দুজাতীয়। আমাদের বাপ-চাচাদেরকেও 'হিন্দু' না বলে 'বাঙ্গালী বলতে শুনেছি---(অ)।

পারে এবং তার ধর্মীয় কর্তব্যও স্মরণ করতে পারে। প্রত্যেক ভদ্র মুসলমানের ফারসীতে কিছু জ্ঞান থাকা উচিত, অথচ আমাদের জিলা হাই স্কুলসমূহেও ফারসী ভাষা একেবারে অজ্ঞাত। চাষাই হোক বা সুলতানই হোক, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে একটা পবিত্র ভাষায় নামায পড়া, তা ফারসীই হোক[৪৩] কিংবা আরবীই হোক ; অথচ আমাদের স্কুলগুলিতে এ-সব মোটেই অনুমোদিত নয়। কিছুদিন পূর্বেও ফতোয়া জারী হয়েছিল, এ-সব বিধেয় ভাষায় না হলে কোনও মুসলমানের প্রার্থনা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয় না। তৃতীয়ত, আমাদের জনশিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার কোনই ব্যবস্থা নেই। একথাটা মোটেই বিবেচনা করা হয় না যে, স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী শ্রেণী তাদের ছেলেদেরকে এ শিক্ষা দানের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে আসছে, অথচ মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোনও পুরোহিত সমাজ নেই। মুসলমান পরিবারের প্রত্যেককেই ধর্মীয় বিধি-বিধান শিখতে হয় এবং নিজের পরিবারের পৌরোহিত্যও করতে হয়। মসজিদে অবশ্য ইমামতিতে নামাজ পড়া হয় ; কিন্তু ইসলামের গৌরবই হলো এই যে, আল্লাহ্‌র যমীনে ও আসমানের নীচে যে কোনখানে নামায পড়া চলে। কেবল পার্থিব শিক্ষাপ্রণালী খুব কম জাতির নিকট গৃহীত হয়েছে। বহু গভীর চিন্তানায়কের মতে, আয়ারল্যাণ্ডে এই প্রণালী অকৃতকার্য হয়েছে এবং বাঙলার ধর্মান্ধ অশিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে এটা নিশ্চয় একেবারে অনুপযুক্ত।

বিষয়টিকে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন, এমন একজন ভারতীয় রাজনীতিকের উক্তিমতে বলতে হয়—'এটা কি কিছু আশ্চর্যের বিষয় যে, যে শিক্ষাপ্রণালী মুসলমানদের সংস্কারের কোনো মর্যাদা দেয় না, যা স্বভাবতই অপরিহার্যরূপে তাদের স্বার্থের হানিকর এবং তাদের সামাজিক ট্র্যাডিশনের পরিপন্থী, তা থেকে তারা বহু দূরে থাকবে।'

তবুও বহু ইংরেজ কর্মচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরন্তর ঘৃণামিশ্রিত রোষ নিয়ে এদেশে চাকুরী করে গেছেন ; কারণ আমরা যে শিক্ষা

৪৩ ফারসী ভাষা (আরবীর মতোই) বাঙালী মুসলমানদের নিকট প্রায় পবিত্র ভাষা, কারণ ফারসীর মারতফতেই ইসলামের বিধান ও বচন তাফর নিকট এসেছে।

প্রত্যেক মানুষের দরওয়াজায় পৌঁছে দিয়েছি, মুসলমানরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অন্য সম্প্রদায় এই সুযোগ-সুবিধাটা যে রকম আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেছে, তার সংগে তুলনা করেই এই অস্বীকৃতিটা আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। সুবিধাবাদী হিন্দুর কোনও সংকোচের বালাই ছিল না। আর এজন্য আমরা বুঝতেই চেষ্টা করিনি, কেন মুসলমানদের এ নিয়ে এতো মাথাব্যথা হবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা এই যে ধর্মীয় সহজাত প্রবৃত্তির যে আদিম পার্থক্য, সেটাকেই আমরা উপেক্ষা করেছি, অথচ এই পার্থক্যটাই সর্বকালের ও সকল জাতির বহুত্ববাদী ও একেশ্বরবাদীদের মধ্যে প্রাচীর তুলে রেখেছে। বহুত্ববাদের সুবিধা এই যে, আরাধ্য দেবতার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রতি বিশ্বাসের দাবীও ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। গীবন্ গ্রীকদের সম্বন্ধে সুন্দর করে যা বলেছেন, তার মূল কথাটি আরও জোরের সংগে হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসী মনকে গ্রাস করার মত একটি অবিভাজ্য ও নিয়মিত জীবন-ব্যবস্থার বদলে গ্রীক পুরাণ হাজারো রকম শিথিল, অনির্দিষ্ট ও সুবিধাজনক অংশে বিভক্ত ছিল, আর এ জন্য দেবতার ভক্তরা ইচ্ছামতো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারতো[৪৪]। মুসলমানদের এ স্বাধীনতা নেই। তাদের ধর্ম চায় শর্তহীন, সজীব এমন কি অসহনশীল ও অকুন্ঠ আকিদা বা বিশ্বাস। অতএব ধর্মীয় নীতিহীন কোনও জনশিক্ষাপ্রণালীই ইসলামের একান্ত অনুগামীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

খ্রীষ্টান সরকার হিসেবে আমাদের ভূমিকা একেবারে ত্যাগ না করেও কিভাবে মুসলমানদের প্রতি এ বিষয়ে সুবিচার করা যেতে পারে, পরে আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো; কিন্তু এখানে এ কথা বলা উচিত যে, মুসলমানদের একটা ন্যায়সংগত অভিযোগ এই হচ্ছে যে, সরকারী শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে টাকাটা সকল শ্রেণীর নিকট থেকে সমানভাবে সংগৃহীত হয়, তার সমস্তটাই বাঙলা দেশে এমন এক শিক্ষাপ্রণালীতে ব্যয়িত হয়, যা একমাত্র হিন্দুদের পক্ষেই উপযুক্ত[৪৫]।

৪৪ Roman Empire, Vol. II, P. 360, Quarto Ed. of 1786.

৪৫ এ-কথা অবিসংবাদীরূপে সত্য যে, পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভার ভারতে আমদানী হলে হিন্দুরাই ষোলআনা ভাবে তা আত্মসাৎ

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে এটাই তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ নয়। আমরা যেমন একদিকে তাদের পক্ষে অনুপযুক্ত একটা জনশিক্ষাপ্রণালী আমদানী করেছি, তেমনি অন্য দিকে তাদেরই মূলধন আত্মসাৎ করেছি, যা দিয়ে তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী চালিত হতো। বাঙলা দেশের প্রত্যেক খান্দানী মুসলমান পরিবার একটি নিজস্ব শিক্ষায়তন পোষণ করতেন। সেখানে তাঁদের নিজেদের এবং প্রতিবেশী দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করতো। বাংলার মুসলমান পরিবারসমূহ যেমন ক্ষয় পেতে লাগলো, এ-সব শিক্ষায়তনও তেমনই সংখ্যায় কমে যেতে লাগলো এবং তাদের যোগ্যতার মানও পড়ে যেতে লাগলো। আমরা, অবশ্য আমাদের শাসনকালীন শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এগুলির বিরুদ্ধে ইংরেজী আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ করিনি। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় রাজাদের অভ্যাসই ছিল, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ও দেবতাদের সেবার জন্য ভূসম্পত্তি দান করা। এ বিষয়ে শাসন-শক্তির নিরংকুশ ও অবিসংবাদী ক্ষমতা ছিল। মুগলদের শাসন-আমলের উদাসীনতায় এবং তাঁদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ডামাডোলের সময় প্রাদেশিক সুবাহ্‌দারগণ ও তাদের অধীন কর্মচারীরা শাসন-ক্ষমতা প্রায় দখল করে ফেলেছিলেন। যতোদিন খাযনার নিয়মিত চালান আসতো, ততোদিন সুদূর নিম্নবংগের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের বিষয়ে দিল্লীর দরবার মোটেই মাথা ঘামাতো না। অলস ও বিলাস-ব্যসনপ্রিয় ঢাকার কিংবা মুর্শিদাবাদের সুবাহ্‌দারগণও জিলার শাসন-বিষয়ক খুঁটিনাটি বিষয়ে সমান উদাসীন থাকতেন। যতোদিন নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব চালান দেওয়া হতো, ততোদিন বড়ো বড়ো

করেছিল একমাত্র দাবীদার হিসেবে। আর এ জন্য হিন্দু সমাজের ইংরেজ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এই কৃতজ্ঞতা সমকালীন হিন্দু সংবাদ-পত্রসমূহে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত হতো। ১৮৬৮ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় (অনুষ্ঠান পত্রে) লিখিত হয়ঃ আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরেজ বাহাদুররা আমাদের দেশ পরম অত্যাচারী যবন-অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন তাঁহাদের রীতি, নীতি, স্বার্থ-শূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের চেষ্টা করি —(অ)

খাযনা-তহশীলদাররা নিজের জমিজমা নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারতেন। তাঁর নিজের ধর্মের বিধি মুতাবিক তিনি মন্দিরে কিংবা মসজিদে নিষ্কর জোতস্বত্ব দান করতেন এবং অত্যাচার ও উৎপীড়নে ব্যয়িত দীর্ঘ জীবনের শেষে মৃত্যুশয্যায় মুক্তহস্তে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে জমিজমা দান করে যেতেন[৪৬]।

আমরা বাঙলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে পর সমকালীন সুযোগ্য রাজস্ব কর্মচারী[৪৭] হিসাব কষে দেখলেন যে, সমগ্র দেশের সিকিভাগই রাষ্ট্র থেকে দানের খাতে চলে গেছে। ১৭৭২ সালেই ওয়ারেন হেস্টিংস এই সাংঘাতিক ফাঁকিটা ধরে ফেলেন; কিন্তু সে-সব জোত বায়্যাফত করার বিরুদ্ধে জনমত তখন এতোই প্রবল ছিল যে, কোনও সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস পুনরায় সরল ও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, যে-সব নিষ্কর জোত-স্বত্বের পক্ষে শাসন শক্তির মঞ্জুরী নেই সেগুলিকে বাযয়াফত্ করার সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু তখনকার শক্তিশালী সরকারও এই নীতি কার্যকরী করতে সাহসী হয়নি। বিষয়টা আরও শতাব্দীকাল ফেলে রাখা হলো। ১৮১৯ সালে এই দাবীটা আরও একবার ঘোষিত হলো, কিন্তু তখনও কার্যকরী করতে সংকোচ বোধ করা হলো। শেষে ১৮২৮ সালে শাসন-বিভাগ ও ব্যবস্থা পরিষদ একযোগে একটা জোরালো পন্থা অবলম্বন করতে অগ্রসর হলো। এজন্য বিশেষ আদালত বসানো হলো, আর তারপর পুরো আঠারো বছর ধরে সারা প্রদেশটা সংবাদদাতা, মিথ্যুক সাক্ষী এবং নির্দয় ও কঠোর বায়্যাফ্তী কর্মচারীতে ভরে গেলো।

বায়্যাফ্তী মামলা সমূহে এককোটি টাকারও বেশী মূলধন খরচ করে সরকারের স্থায়ী অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ালো মোটামুটি চল্লিশ লক্ষ টাকার উপর; অর্থাৎ প্রায় আট কোটি টাকার উপর সালিয়ানা শতকরা পাঁচ টাকা মুনাফা লাভ হলো[৪৮]। আর এর মোটা অংশ এসেছিল

৪৬ 'ধর্মীয় লোকহিতায় চ' অথবা 'ফি-সবিলিল্লাহ্'—(অ)।

৪৭ মি, জেমস গ্রান্ট্।

৪৮ ১৮৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের 'Friend of India' পত্রিকার হিসেব নির্ভুল বলেই পরবর্তী রাজস্বকর্মচারীরা গ্রহণ করেছেন। যেমন,

সেইসব লাখেরাজ জমিজমা থেকে যেগুলির মালিক ছিল মুসলমানরা অথবা তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। তার ফলে যে আতঙ্ক ও ঘৃণা উঠেছিল, সে-সব আজও জমা হয়ে আছে পাড়াগাঁয়ের দলীলদস্তাবেজে। শত শত মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এবং তাদের শিক্ষাপ্রণালী, যা এতোদিন লাখেরাজ ওয়াক্‌ফের জমিজমার উপর নির্ভরশীল ছিল, মারাত্মক আঘাত পেল। মুসলমান আলিম-সমাজ প্রায় আঠারো বছরের হয়রানির পর[৪৯] একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। যে-কোন নিরপেক্ষ গবেষক এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে, বায্‌য়াফতী আইনগুলির দ্বারা আমাদের বারে বারে বিশেষভাবে রক্ষিত অধিকার সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এ-সব মামলা ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ভারতীয় জনগণের বিশ্বাসের বিপরীত। বহুকালের ভোগজনিত অধিকার পরিষ্কার আইনের বিরুদ্ধে কোনো স্বত্ব সৃষ্টি করতে পারে না সত্য, কিন্তু পঁচাত্তর বছরের অবিচ্ছিন্ন ভোগ-দখলের অধিকার সরকারের অনুগ্রহের উপরেও সবল দাবী জানাতে পারে। কিন্তু আমাদের বায্‌য়াফতী কর্মচারীরা দয়ামায়ার ধার ধারতো না। তারা অবিচলিতভাবে আইনই প্রয়োগ করেছে। সে সময়ের আতঙ্ক আজও জেগে আছে, আর আমাদের ভাগ্যে রেখে গেছে সুতীব্র ঘৃণার উত্তরাধিকার। তারপর থেকেই শিক্ষকতার পেশা , যা দেশীয় শাসকদের আমলে বেশ সম্মানার্হ ও মোটা আয়ের জীবনোপায় ছিল, বাঙলা দেশে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ্‌গুলিই মার খেয়েছে সবচেয়ে বেশী; কারণ, অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বত্বের দলীল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে ভারতের পূর্বতন বিজেতাগণ এরকম উদ্ধত উপেক্ষা দেখাতো, যা হিসেবী ও সুচতুর হিন্দুর নিকট অজ্ঞাত। লাখেরাজ জোতস্বত্ব সম্বন্ধে আমরা এমন ধরনের উপযুক্ত প্রমাণ দাবী করেছিলাম, যা তখনকার স্থাবর সম্পত্তির অনির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে নিজ নিজ সম্পত্তির প্রমাণের জন্য উপস্থিত করতে তারা

J.H. Young C. S. in the Revenue Handbook, p. 69, Calcutta, 1861.

৪৯ বায্‌য়াফতী মামলাগুলি গোড়ার দিকে অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং কয়েক বছর পরেই ক্ষীণ হয়ে আসে; শেষে ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে সরকারী হুকুমবলে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একেবারেই অসমর্থ ছিল। পচাত্তর বছর ধরে আমরা একটা প্রচণ্ড ফাঁকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেও মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিলাম, কিন্তু তার সমূহ শাস্তিটা এবারে একপুরুষের ঘাড়েই পড়ে গেল। যে-সব স্বত্বের দলীল ও সনদ এ-সব দাবীর প্রমাণ ছিল, ইতিমধ্যে সেগুলিকে দেশের আবহাওয়ায় ও উইপোকায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমাদের নিকট থেকে যা কিছু চুরি করে নেওয়া হয়েছিল[৫০], সে সমস্তই আমরা বায়্যাফতী মামলা সমূহে ফিরে পাইনি; কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বায়্যাফ্তীকরণের সময় থেকেই মুসলমান শিক্ষাপ্রণালীর অবসানও সূচিত হলো। ওহাবী মামলাগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এগুলিকে নির্দেশ করেছেন বাঙালী মুসলমানদের অবনতির দ্বিতীয় কারণ হিসেবে।

বায়্যাফ্তী মামলাগুলিকে ন্যায়সংগতভাবে হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষাবিষয়ক মূলধনগুলি আমরা আত্মসাৎ করেছি বলে তারা যে অভিযোগ তোলে, তার বিরুদ্ধে কোনো সমর্থন খাড়া করতে পারিনে। কারণ, এই সত্যটা স্বীকার না করার কোনো মানে হয় না যে, মুসলমানরা বিশ্বাস করে, আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে আমাদের উপর ভারার্পিত সম্পত্তিগুলিকে সাধুতার সংগে কাজে লাগাতাম, তাহলে এই সময়ে বাঙলা দেশে মুসলমানরা সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কার্যকরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকারী থাকতো। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জিলার এক মহাপ্রাণ ধনী মুসলমান[৫১] মৃত্যু আলিংগন করেন, তাঁর বিরাট সম্পত্তি ধর্মকার্যে দান অর্থাৎ ওয়াক্ফ্ করে দিয়ে। শীঘ্রই তাঁর দুই মোতয়াল্লীর মধ্যে বিবাদ শুরু হলো। ১৮১০ সালে এই বিবাদ জমে উঠে ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগে এবং জিলার কালেক্টার আদালতের বিচারসাপেক্ষে সব সম্পত্তিই ক্রোক করে ফেললো। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মামলা চললো। তারপর সরকার উভয়

---

৫০ হান্টারের এই উক্তির জওয়াবে বাঙ্গালী মুসলমান বল্‌তে পারে:
আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।—(অ)

৫১ হাযী মুহম্মদ মুহসীন—(অ)

মোতওয়াল্লীকে সরিয়ে দিয়ে সম্পত্তির তদারক স্বহস্তে গ্রহণ করলো এবং সরকার নিজেই একজন মোতওয়াল্লী হলো ও দ্বিতীয় মোতওয়াল্লী মনোনীত করলো। পর বছর সমস্ত ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি কায়েমী স্বত্বে ইজারা দিল ইজারাদারদের নিকট থেকে উপযুক্ত টাকা আদায় করে। এ-সব আদায়ী টাকা ও মামলা চলাকালীন বকেয়া আদায়ের মোট পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ১৫,৮৫,৫০০ টাকা[৫২], তাছাড়া সালিয়ানা আদায় থেকেও প্রায় ১,৮০,০০০ টাকা জমা হয়েছিল।

আমি পূর্বেই বলেছি, এই ওয়াক্‌ফ্ করা হয়েছিল ধর্মীয় কাজের জন্য। ওসীয়তনামায় এ-সব কাজের বিশদ বর্ণনা রয়েছে, যেমন কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসব পালন করা, হুগলীর সুবৃহৎ মসজিদ বা ইমামবাড়ী মেরামত করা, একটি কবরগাহের রক্ষণাবেক্ষণ করা, কতকগুলি মাসোহারা দেওয়া এবং বহুবিধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পালন করা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ওসীয়তের কাজের তালিকায় পড়ে, কিন্তু সেটা হতে হবে মুসলমানদের ইচ্ছানুযায়ী এবং ঠিক যেমন খোদ ওয়াক্‌ফ্ অনুমোদন করতেন। গরীব ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে চিরকালই ধর্মীয় কাজ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে; কিন্তু অমুসলমান কলেজের জন্য মূলধনের ব্যবহারটা ওয়াকীফ্ নিশ্চয়ই অধর্মের কাজ হিসেবে জ্ঞান করতেন এবং সেরকম কোনো কাজকে মোতওয়াল্লীদের অন্যায় আত্মসাৎ হিসেবেও গণ্য করা হতো। বাস্তবিক মুসলিম ওয়াক্‌ফে ধর্মীয় দিকটা এমনই অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত যে, সরকারের উচিত ছিল, আইনের দিক দিয়ে আরও তদন্ত করে দেখা যে, শীয়া মুসলমানের ওয়াক্‌ফ্‌কৃত সম্পত্তি সুন্নী মুসলমানদেরও শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা।

মুসলমানরা যখন শুনলো যে ইংরেজ সরকার এই বিরাট মূলধন একটা ইংরেজী কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করতে চলেছে, তখন তারা কিরূপ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। অথচ কাজটি সরকার করেছে। সমস্ত সম্পত্তিটা শুধুমাত্র ইসলাম-অনুমোদিত ধর্ম-কাজের জন্য উদ্দিষ্ট হয়ে থাকলেও সরকার এমন একটি

৫২ হুগলী কলেজের বাড়ীখানি অবশ্য এই টাকায় কেনা হয়েছিল। কলেজ খোলা হয় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে—(অ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে সে-সব লাগাচ্ছে, যা ইসলামের শিক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী এবং যেখান থেকে মুসলমানরা একেবারে বাদ পড়ে গেছে। বর্তমানে কলেজটির অধ্যক্ষ হচ্ছেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, যিনি একবর্ণও ফারসী কিংবা আরবী জানেন না; অথচ তিনি প্রত্যেক মুসলমানের ঘৃণিত বিষয় সমূহে শিক্ষাদান করে একটি মুসলমান ওয়াক্‌ফ থেকে বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা গ্রহণ করছেন, এটা অবশ্য তাঁর দোষ নয়। এ দোষ সেই সরকারের, যে তাঁকে সেখানে নিয়োগ করেছে এবং গত পয়ত্রিশ বছর ধরে এভাবে একটা বিরাট শিক্ষাবিষয়ক মূলধন থেকে অন্যায় আত্মসাৎ করে আসছে। ইংরেজী কলেজটার সংগে একটি ছোট মাদ্রাসা জুড়ে দিয়ে বৃথাই সরকার একটা বিরাট বিশ্বাস-ভংগের উপর পর্দা তুলে দিতে চেষ্টা করছে। এভাবে জমানো মূলধন থেকে কলেজ খুলে টাকা আত্মসাৎ করা ছাড়াও সরকার বছরে বছরে সাড়ে সাত হাযার টাকা খরচ করছে কলেজটা চালাতে; অর্থাৎ সালিয়ানা প্রায় উনআশি হাজার টাকা আয় থেকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা মাদ্রাসার জন্য খরচ করা হচ্ছে, আর মাত্র এটাই এই বিরাট ওয়াক্‌ফের আসল উদ্দেশ্য সাধনের সাক্ষ্য হয়ে আছে।

এই আত্মসাতের অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা বেদনাদায়ক, কারণ এর কোনও জওয়াব নেই। মুসলমানরা প্রকাশ্যেই বলে যে, প্রথম মোতওয়াল্লীর বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা একটা বিধর্মী কর্তৃপক্ষকে তাদের বৃহত্তম ওয়াক্‌ফের ভারার্পণ করেছে এবং তারপর মুসলমানদের কোনও উপকারে না-লাগা একটা কলেজ খুলে এবং এভাবে একজন ধার্মিক মুসলমান ওয়াকীফের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের আসল উদ্দেশ্যটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই প্রাথমিক অবিচারটা আরও জোরদার করে তুলেছে। এরকম শোনা যায় যে, কয়েক বছর আগে ইংরেজী কলেজের তিনশো ছাত্রের মধ্যে শতকরা একজনও মুসলমান ছিল না। আর যদিও তারপর থেকে এই লজ্জাকর আনুপাতিক হারের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবু এখনও মুসলমানদের অন্তর থেকে এই অবিচারের বেদনা মুছে যায়নি। যে ইংরেজ কর্মচারী বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে দেখেছেন, তিনি লিখেছেন: 'এই ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার ঘৃণার

কথা বাদ দিয়ে যে পরিমাণ নিন্দা কুড়িয়েছে, তার সমূহ পরিমাপ করা শক্ত। ভাষাটা হয়তো অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু আমি প্রমাণ দিতে পারি, ভারতে প্রায় আটাশ বছর অবস্থানকালে আমি বারবার এই প্রসংগের উল্লেখ করেছি (আমি ভারতে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রথম হুগলীতে যাই) এবং আমি নিশ্চয় করে বলছি, এই ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কোনো দেশীয় বা ইউরোপীয় লোকের নিকট এতো নিন্দাবাদ শুনিনি। সত্য হোক মিথ্যা হোক, মুসলমানরা সত্যসত্যই বিশ্বাস করে যে, এই ব্যাপারে সরকার তাদের সংগে অন্যায় ও হীন আচরণ করেছে, আর এটা তাদের মনে একটি বেদনাকর কায়েমী ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।'

কিন্তু এটা দিয়েই মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের অবিচারের তালিকা শেষ হয়ে যায় না। তারা আমাদের বিরুদ্ধে শুধু এই অভিযোগই তোলে না যে, আমরা তাদেরকে শুধু এ জীবনেই সাফল্যের সবরকম পথ থেকে বঞ্চিত করেছি, তারা আরও বলে যে, আমরা তাদের পরজীবনের মুক্তির পথ বিপন্ন করে তুলতেও চেষ্টা করেছি। সব মহৎ ধর্মই শুধু ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য কয়েকটা দিন আলাদা করে দেয়। যদি কোনও বিদেশী বিজেতা সহসা হুকুম জারী করে বসেন, অতঃপর রবিবার আর বিশ্রামের দিন থাকবে না, তাহলে এই স্বেচ্ছাচারী হুকুমে ইংরেজ মনে কি পরিমাণ দুঃখ ও রোষের সঞ্চার হবে, তা সহজেই অনুমেয়। মুসলমানরাও তাদের পবিত্র উৎসবগুলি সমান হৃদয়াবেগের সংগে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। ভারতের অন্য বহু অঞ্চলেই আমরা এই মনোভাবকে মেনে নিয়েছি; কিন্তু নিম্ন-বংগের মুসলমানরা কিছুকাল থেকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে এভাবে চলে গেছে যে, তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনগুলিও ধীরে ধীরে উপেক্ষা করা হয়েছে, তারপর অবজ্ঞা করা হয়েছে ও শেষে একেবারে অস্বীকার করা হয়েছে। গত বছর হাইকোর্টের মুসলমান উকিলরা এ বিষয়ে দু'খানি আরজি পেশ করে। সেগুলিতে এটাই দেখানো হয়েছে যে, যেখানে পাল-পার্বণে খ্রীস্টানদেরকে বাষট্টি দিন ও হিন্দুদেরকে বায়ান্ন দিন ছুটি দেওয়া হয় সেখানে মুসলমানদের দেওয়া হয় মাত্র এগারো দিন। দরখাস্ত-কারীদের এটাই মাত্র প্রার্থনা ছিল, পূর্বে মুসলমানী পালা-পার্বণের

জন্য মঞ্জুরীকৃত ছুটি ছিল একুশ দিন, তাদের সে ছুটির সংখ্যা কমিয়ে মাত্র এগারো দিন করা হয়েছে, ভবিষ্যতে যেন আরও কমিয়ে ফেলা না হয়। এই আরজি দু'টি করার কারণ হচ্ছে, একটি হুকুম বের হয়েছিল যে, অতঃপর দেশীয় পার্বণ উপলক্ষে অন্যান্য সরকারী অফিসের মতো হাইকোর্টের ছুটি থাকবে। 'অন্যান্য সরকারী অফিস'-এ মুসলমানী পর্বে কোনও ছুটি মঞ্জুর ছিল না। প্রত্যেক বিভাগের বড়ো সাহেব তাঁর অধীন মুসলমান কর্মচারীকেই তার ছয়টি বড়ো পর্বে অফিসে না আসার অনুমতি দিতেন এবং এভাবে তার বছরে বারো দিন ছুটি পাওনা হতো; কিন্তু অফিস রীতিমতো খোলা থাকতো ও কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চলতো।

মুসলমান উকিলেরা উল্লেখ করেন যে, এরকম অনুমতিসূত্রে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থাটা আইন-আদালতে কোনোরূপে খাটতে পারে না। কারণ এ সম্বন্ধে আদালতকে কেবল নিজের কর্মচারী ও উকিলদের সম্বন্ধেই বিবেচনা করলে চলবে না, যে জনসাধারণের হিতার্থে আইন-আদালতের অস্তিত্ব, তাদেরও কথা বিবেচনা করতে হবে। তাঁরা আরও বলেন যে, যদিও মুসলমান উকিলদের সংখ্যা একেবারে কমে গেছে তবুও রেলে যাতায়াতের সুবিধার দরুন মামলার তদবীরকারী মুসলমান মক্কেলদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে খুবই বেড়ে গেছে। অতএব মুসলমান উকিলদেরকে মুসলমানী পর্বে কোর্টে হাযির না হওয়ার অনুমতি দিলেও, তাঁরা এ কথাটা ভুলতে পারেন না যে, সে-সব দিনে ধার্য মামলার শুনানীতে কাজে নিযুক্ত হিন্দু ও ইংরেজ উকিলরা হাযির থাকবেন এবং তার দরুন মুসলমান মক্কেলদেরকেও হাজির থাকতে হবে। সংক্ষেপে, হুকুমটা তাদের ধর্মীয় পর্বগুলি একেবারে রদ করে দিয়েছে, অথচ এই রদ করাটা হাইকোর্টের গত বাহাত্তর বছর ধরে চলতি নিয়মের পরিপন্থী এবং তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের বিধানের প্রতিবন্ধক। 'যদি হিন্দু ও খ্রীস্টানদেরকে তাদের ধর্মানুমোদিত পর্বে ছুটি দেওয়া হয়, তাহলে হুজুরদের নিকট আবেদনকারীদের প্রার্থনা যে, মুসলমানদেরকেও তাদের ধর্মীয় কর্তব্য ও অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য প্রাপ্য ছুটি হতে যেন

বঞ্চিত করা না হয়।'[৫৩] এই কঠোরতা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যে, মাত্র দু'টি পর্ব ব্যতীত (ঈদুল ফিতরের তিন দিন ও ঈদুজ্জোহার একদিন) বাকী সব মুসলমান পর্বগুলি শোকের ও উপাসনার সময় এবং তখন মুসলমানরা সব রকম পার্থিব কাজকর্ম ত্যাগ করে মাত্র আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন থাকতে বাধ্য হয়।

যে সম্প্রদায়টি পূর্বে সারা ভারতে আইন বিষয়ের কাজগুলি এক-চেটিয়া হিসেবে ভোগ করতো, আজ তারা এমনই নীচু স্তরে পড়ে গেছে। সান্ত্বনার কথা এই যে, অন্ততঃ এই অবিচারটুকু শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। সর্বোচ্চ সরকার শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন এবং মুসলমানী পর্বগুলির জন্য কয়েকদিন মাত্র ছুটি নির্দিষ্ট করে দেন। এ ছুটিগুলি অবশ্য মুসলমানরা যতোদিন চেয়েছিল, ততোদিন না হয়ে সরকারী কাজকর্মের সুবিধামতো যতোদিন সম্ভব ততদিনই নির্দিষ্ট হয়েছিল। তবুও মুসলমানী বড়ো বড়ো ধর্মীয় পর্বগুলি পালন করবার পক্ষে তা উপযুক্ত হয়েছিল।

আরও একটি অভিযোগের কথা বলবার আছে। মুসলমানরা অভিযোগ করে যে, আমাদের নয়া নীতি প্রবর্তনের দরুন তাদেরকে শুধু আইন-জীবীর পেশা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়নি, একটা আইন পাশ করে আমরা তাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিধানগুলি পালনের একটি দরকারী কর্মচারী পদও তুলে দিয়েছি। মুসলমান আইন অনুসারে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও যাজকীয় বিচারক হিসেবে কাজী অনেক কাজই করে থাকেন। আমরা যখন প্রথমে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করি, তখন বিচার কাজের জন্য আমরা প্রধানত তাদের উপরেই নির্ভর করতাম। আমাদের প্রথম আইনেও তাঁদের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে ও তাঁদের পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় আইন-গ্রন্থে তাঁদের কর্তব্যাদি নির্দেশ করে আজও পঁচিশটি আইনের লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে।[৫৪] বাস্তবিক, মুসলমান পারিবারিক ও ধর্মীয় বিধানে কাজী

৫৩ অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও তার সহযোগী বিচারপতিদের নিকট হাইকোর্টের মুসলমান উকিলদের আবেদনপত্র, তৃতীয় প্যারা।

৫৪ বেংগল কোডে ষোলটি, মাদ্রাজ কোডে চারটি, বোম্বাই কোডে দু'টি ভারতীয় আইনে তিনটি, মোট পঁচিশটি আইন।

এমনই অপরিহার্য যে, আলীম-সমাজ ফতোয়াই দিয়েছিলেন যে, যতোদিন কাজীর পদ চালু থাকবে, ততদিন ভারত দারুল-ইসলাম থাকবে এবং যে মুহূর্তে কাজীর পদ উঠিয়ে দেওয়া হবে তখনই দারুল-হরব হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের সাধারণ মনোভাব সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় ঘটেছে মাত্র কিছুদিন আগে। আর তাও হয়েছে তাদের দীর্ঘ অসন্তোষের চাপে। ১৮৬৩ সালে একজন প্রাদেশিক গবর্নর সরকারীভাবে কাযী নিয়োগের নীতি চালু রাখার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। তিনি হয়তো চিন্তা করেছিলেন, এই পদে নিয়োগের ফলে তাঁদের যাজকীয় বৃত্তিকে সরকারীভাবে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং সেজন্যই ভেবেছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতেই এই নিয়োগের ভারটা নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অতএব বোম্বাই থেকে তুমুল প্রতিবাদ উঠা সত্ত্বেও বহু আলোচনার পর এ সম্পর্কিত সমস্ত সাবেক আইন রদ করে দেওয়া হয় এবং সরকারও কাজীর নিয়োগ কার্যত বন্ধ করে দেয়।[৫৫]

গত সাত বছর ধরে আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট ও ক্রমবর্ধমান মযহাবকে একজন অতি দরকারী কর্মচারী থেকে বঞ্চিত করেছি, অথচ তাঁদের কাজই ছিল বিয়ে-শাদী পড়ানো এবং বহু দরকারী পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা। এর খারাপ দিকটা প্রথমে ততোটা প্রকট হয়নি, কারণ পুরোনো কাজীরা তখনও বর্তমান ছিলেন। তাঁদের অবসর গ্রহণের বা মৃত্যুর পর এ আইনের দরুন আর নতুন নিয়োগ হতো না, কারণ পদটাই তখন তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টা প্রথমে বর্তমান ভাইস্‌রয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কোনো বাস্তব নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য মেলেনি। ঐ বছরেই মাদ্রাজ হাইকোর্ট বিষয়টির উপর প্রথম রায় দেন। জাস্টিস্ কলেট সাহেবের রায়ে[৫৬] সন্দেহ মাত্র রইলো না যে, কাজীর নিয়োগ একমাত্র

---

৫৫ ১৮৬৪ সালের ১১ আইন দ্বারা। পরে অবশ্য ১৮৬৮ সালের ৮ আইন দ্বারা ১১ নম্বর আইন রদ করা হয়; কিন্তু তার দ্বারা বাঙলার সাবেক রেগুলেশানগুলির পুনঃপ্রবর্তন হয়নি, অথচ সেগুলির দ্বারাই আগে কর্মী নিয়োগ করা হতো।

৫৬ ১৮৬৯ সালের ৪৫৩ নম্বর আদিম মোকদ্দমা: মুহম্মদ আবু বকর বনাম মীর গোলাম হোসেন ও অন্যান্য।

শাসন-শক্তির দ্বারাই হতে পারে, আর এভাবে নিয়োগ না হলে মুসলমানরা নিজেরা কাউকে নিয়োগ করতে অক্ষম। অথচ ১৮৬৪ সালের আইনের বলে তাদের সম্প্রদায়কে তাদের আইনানুযায়ী একজন অতি দরকারী কর্মচারী থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর কাজ হচ্ছে প্রধানত হস্তান্তরের দলীল তস্‌দিক করা, বিয়ে-শাদী পড়ানো এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করানো। এখন ব্যাপার হলো এই যে, নিম্নবংগের যে দুর্নীতি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ফ্যাসাদে পড়তে হয়, সেটা হলো মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত মামলার আধিক্য। যে কোন কারণেই হোক না কেন, এখানে বিবাহের বন্ধন খুবই শিথিল হয়ে পড়েছে। ব্যাভিচার ও মেয়ে ফুসলানোর অপরাধ দণ্ডবিধি আইনের আওতায় পড়ে, আর এ-সব অপরাধে ব-দ্বীপের প্রত্যেকটি জিলা ভরে গেছে; কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রে বিবাহ আইনতঃ প্রমাণ করাই দুঃসাধ্য। পূর্ব বাঙলার দুটি বিভাগের জিলাগুলিতে ১৮৬২ সালে অর্থাৎ সরকারীভাবে কাজী নিয়োগের আইন রদ করার পূর্বে, এসব মামলার সংখ্যা ছিল ৫৬১টি, কিন্তু ১৮৬৬ সালে, অর্থাৎ উক্ত আইন রদ করার দুই বছর পরে, এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৮৪টি, তারপর থেকে ফৌজদারী তালিকায় এর সংখ্যা কমে গেছে; কিন্তু তা মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবার ফলে নয়, এই শ্রেণীর মামলাগুলিকে দেওয়ানী আদালতে পাঠিয়ে দেওয়ার নিয়ম হয়ে যাওয়ার দরুন[৫৭]।

আমি এ সব সংখ্যা গ্রহণ করেছি ওহাবী মামলাগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মূল্যবান তথ্য থেকে। আর একজন তাঁর থেকেও অভিজ্ঞ ও দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী কাযীদেরকে সরকারীভাবে নিয়োগ করার প্রথাটা

---

৫৭ বিবাহ সম্পর্কিত মামলার সংখ্যা খুবই বেড়ে যাওয়ার আর একটা কারণ হলো লোকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের সুযোগ নিতে আরও শিখে ফেলেছিল; কিন্তু আমরা যেমন বিবাহের বন্ধন লঙ্ঘন করাকে শাস্তিমূলক অপরাধ গণ্য করেছি, সেইরকম আরও বেশী দরকার ছিল বিবাহের আইন আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া। আর মুসলমান বিবাহের কর্মচারী (অর্থাৎ কাযীদের) পদ তুলে দেওয়ারও আমরা সবচেয়ে খারাপ সময় বেছে নিয়েছিলাম।

বন্ধ করে দেওয়ার দরুন রাজনৈতিক ক্ষতির দিকটা এভাবে সংক্ষেপে বলেছেন: 'কাজীর পদ বন্ধ করে দেওয়াটা আমার মনে হয়, ওহাবী আন্দোলনের সপক্ষে নিঃসন্দেহে দু'রকমে কাজ করেছে। যে-সব গোঁড়া অর্ধশিক্ষিত লোক[৫৮] জীবনোপায়ের আর কোনো পথ খোলা না থাকার দরুন চলতি অবস্থার প্রতি একেবারে বিরক্ত হয়ে অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রচার করে বেড়াতো, এর ফলে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো; কিন্তু আর এক দিকে তার ফল আরও ভীষণ হয়ে উঠলো। যেখানে কোনো কাজী নেই, সেখানে মুসলমানদের জীবনযাত্রা ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসারে চলা অসম্ভব। কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানেই কেবল কাজীর দরকার, তা নয়, মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনে নিরন্তন এমন সব ছোট-খাট ধর্মীয় ও ব্যবহারিক সমস্যার উদ্ভব হয়, যেগুলির সমাধান একমাত্র কাজী দ্বারাই সম্ভব। অতএব এরকম কর্মচারীর অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহলে একজন রাজদ্রোহী সহজ সুযোগ পেয়ে বসে বিবেকবান মুসলমানকে এই যুক্তিতে উত্তেজিত করবে যে এ রকম সরকারের অধীনে বাস করাই উচিত নয়। পক্ষান্তরে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কাজীকে মেনে নেওয়া ও তাঁর সেবা গ্রহণ করাই প্রকৃতপক্ষে হয়ে পড়ে সরকারের বৈধতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া।'

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ পর্যন্ত যে সব অতি দরকারী প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে এটি তারই অন্যতম। আলজিরিয়ার মতো ফৌজী শাসনাধীন অঞ্চলে কাজীর নিয়োগে শাসন-শক্তির স্বীকৃতি দরকার কিনা বলা শক্ত। কিন্তু যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে, তা থেকে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, ব্রিটিশ ভারতের মতো শান্তিনির্ভর বেসামরিক সরকারের এ বিষয়ে অনুমোদন নিশ্চয়ই দরকারী। প্রশ্নটা অবশ্য জটিল, কিন্তু এদিকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় বহাল থেকে যাচ্ছে এবং তার দরুন কাজীর পদ সব রকম মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য মীমাংসা করতে হলে বিষয়টির সব দিক গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার এবং বিভক্ত ভারতের দশটি প্রাদেশিক সরকারের সংগে আলোচনা করাও

---

৫৮ এই শ্রেণী থেকেই কাযীদের নিয়োগ করা হতো এবং তারা এই পদটাকেই তাদের জীবনোপায় হিসেবে মনে করতে।

দরকার। তবে ভাইস্‌রয় যে রকম আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন এবং সরকারও মুসলমানদের উপর সুবিচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, তাতে আগেকার ভুলগুলি যতোই স্বীকার করা হোক না কেন, এরকম বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, শীঘ্রই এ বিষয়টিও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগের তালিকা থেকে দূর হয়ে যাবে।

বাঙলা দেশের মুসলমানদের প্রতি গত অর্ধশতাব্দী ধরে যে ঘৃণা ও অবহেলা দেখানো হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার গভীর ছাপ রয়ে গেছে। প্রাচ্যের পূর্বতন বিজেতাগণকে আমাদের প্রাচ্য সম্বন্ধীয় পুঁথি-পত্র ও লাইব্রেরীগুলি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যেমন হয়েছে, সব রকম কার্যকরী জীবনোপায় থেকে। সাবেক কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস্‌ হিন্দু ও মুসলমানদের উপর সমান ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করতেন এবং প্রাথমিক সিরিজের 'বাইব্লিওথিকা ইণ্ডিকা'র মধ্য দিয়ে আরবী ও ফারসীতে যে প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য দেখানো হয়েছিল, তা-ও ছিল এই রাজনৈতিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগির সাহিত্যিক প্রকাশ। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর ধরে হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় সাহিত্য এবং রাষ্ট্রীয় চাকরীগুলি থেকে সমানভাবে মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে। আর কোর্ট অব-ডিরেক্টরস্‌ 'বাইব্লিওথিকা ইণ্ডিকা'কে যে বাৎসরিক নয় হাজার টাকা দান করে, তা-ও সামগ্রিকভাবে বাঙলা দেশে সরকারী সাহায্য হিসেবে এক দিকেই ব্যয়িত হয়। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত ডক্টর রুয়েরর আমলে সেমিটিক পাণ্ডিত্যের খুবই কর্ম প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়েছে, যদিও স্প্রেন্‌জারের অল্পকাল স্থায়ী আমলে কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এ সময়ে দু'খানি প্রথম শ্রেণীর পুস্তক রচনার কাজ আরম্ভও হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

ডক্টর হোরেস্‌ হেম্যান্‌ উইলসনের মতো সংস্কৃত ভাষার উৎসাহী পণ্ডিত ভারতীয় সরকারী অর্থসাহায্য থেকে আরবী সাহিত্যের জন্য কিছু খরচ করা সহ্য করতে পারেননি। তাঁরই মন্ত্রণায় কোর্ট অব-ডিরেক্টরস্‌ এ রকম হুকুম জারী করেন যে, 'বাইব্লিওথিকা ইণ্ডিকা' কেবল ভারতীয় সাহিত্য ও বিষয় সম্বন্ধেই অনুরক্ত থাকবে, অন্যথায় তার বাৎসরিক নয় হাজার টাকা সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। হয়তো তাঁর মতো বলিষ্ঠচরিত্র ব্যক্তির এরকম সোচ্চার দাবীগুলি শোনা ভালই হয়েছে এবং তাঁর বিষয়টিকে

সাময়িকভাবে প্রাধান্য দেওয়াও উচিত হয়েছে। ডক্টর উইলসন আধুনিক সংস্কৃত জ্ঞানের মৌল ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ম্যাক্সমূলর তারই উপর বর্তমানে মনোহর আলংকারিক ছন্দে প্রাসাদ গড়ে তুলছেন এবং পাণ্ডিত্যের উপরতলাগুলিও কমনীয় ভাবে তুলে যাচ্ছেন। অপর দিকে গোল্ডস্ টাকার, উফ্‌রেকট, ফিজ্-এডওয়ার্ড হল্ ও মূইর নতুন নতুন পোস্তা বেঁধে মূল ভিত্তিটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলছেন এবং চকমিলান করে মনোরম প্রসাদটিকে স্থায়িত্বের রূপ দিচ্ছেন।

কিন্তু একদল সেমিটিক পণ্ডিতও নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করে চলেছেন। প্রকৃত ভারতীয় উদ্যোগ ব্যতীত অন্য সব রকম উদ্যোগের প্রতি কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরস্ তাঁদের সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। সেমিটিক পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারে লড়ালড়ি করার মতো শক্তিশালী ছিলেন না। এ জন্য তাঁরা আপাতত আরবী জ্ঞানের গবেষণা মুলতবী রেখে মুসলমান আমলের ফারসী সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করলেন। স্যার হেনরী ইলিয়ট অবিচলিত চিত্তে নিজের সাধনায় মগ্ন রইলেন। মিস্টার টমাস, মিস্টার হ্যামণ্ড, স্যার উইলিয়ম মূইর ও আরও কয়েকজন প্রতিভাবান সিভিলিয়ান্ একযোগে মিলে স্থানীয় সরকারের নিকট সাহায্য আদায় করলেন, যা সুদূরস্থিত কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস্ মোটেই দিলেন না। ১৮৫৫ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট ফারসী হাতে-লেখা কিতাব সংগ্রহের জন্য সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করলেন। একবারের খোজাখুজিতে সাতাত্তরখানি পুস্তক সংগৃহীত হলো। স্যার হেনরী ইলিয়টের রচনাগুলি মিস্টার টমাস, অধ্যাপক ডাউসন ও মিস্টার বীমস্ গড়িমসি করে হলেও প্রশংসনীয়ভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন। এটি আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এদিকে লখনৌ-এর ছাপাখানাগুলি থেকে ততো সাবধানতা ও বিবেচনার সংগে না হলেও নানা বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগলো। কর্নেল নাসুলীজ এই বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য তাঁর পাণ্ডিত্য ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। আর বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে নতুন গ্রন্থাগারিক ডাক্তার রসটের মধ্যে প্রাচ্যবিষয়ক পণ্ডিতগণ এমন এক অসামান্য পণ্ডিতের সন্ধান পেলেন, যাঁর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও উৎসাহ ছিল অত্যন্ত গভীর ও নির্ভরশীল। ভারতেও এর প্রভাব সমানভাবে দেখা গিয়েছিল এবং মিস্টার ব্লকম্যানের মতো

পণ্ডিতের মনীষা, নিষ্ঠা ও সাধনা প্রাচ্য জ্ঞানের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ফরিয়াদ ও আরজির বর্ণনা আমি শেষ করলাম। বিশ্বাসভংগের ও অবিচারের যে-সব অভিযোগ রয়েছে, সে-সবের প্রতিকারের ভার সরকারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত—গত দু'বছর ধরে সরকারও অসন্তোষের কারণসমূহ দূর করতেই খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছেন; কিন্তু সাধারণ ও কম নযরে-লাগা অভিযোগ সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করি। আমরা যদি এই অভিযোগটি একটু তলিয়ে দেখি, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, আমাদের সহানুভূতিশূন্য জনশিক্ষা-নীতিই এর মূল কারণ। যতোদিন তারা এই জনশিক্ষার সংগে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারছে ততোদিন বাঙলার মুসলমানরা জীবনে সফলকাম হতে পারবে না কিংবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার উপযুক্ত অংশীদারও হতে পারবে না। আর তারা এ কাজে কখনও কামিয়াবও হবে না, আমরা যদি আমাদের স্কুলসমূহে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করি। এর জন্য যা পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রয়োজন হবে, আমার মতে তা খুবই সহজ এবং সেগুলি ব্যয়বহুলও নয়; কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ কিছু বলবার আগে আমরা ইতিমধ্যেই যে বড়ো চেষ্টা করেছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ইংরেজরা ভারতে মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেনি সত্য, কিন্তু তা করার পথে তারা যে অসুবিধা ও সহানুভূতিহীনতার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলিও বিবেচনা করা উচিত।

ঠিক গত নব্বই বছর ধরে কলকাতায় একটি মুসলমান কলেজ (মাদ্রাসা-ই-আলীয়া) সরকারী খরচে চালু হয়ে আসছে। এ দেশীয় লোকদের ভালো করবার আরও বহু প্রচেষ্টার মতো এটির সৃষ্টি হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের হাতে। ১৭৮১ সালে গবর্নর জেনারেল লক্ষ্য করলেন, পরিস্থিতির দরুন মুসলমানদের ভাগ্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এজন্য তাদেরকে তিনি প্রস্তুত করবারও চেষ্টা পেলেন। খান্দানী মুসলমান পরিবারগুলি লয় পাবার সাথে সাথে তাদের ছেলেদেরকে সরকারী উচ্চ পদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যও লোপ পেতে লাগলো। এ জন্য পরিবর্তনের উপযুক্ত মুকাবিলা করতে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজধানীতে

একটি মুসলমান কলেজ[৫৯] স্থাপন করলেন এবং 'তার কায়েমী পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থদানও করলেন।' কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্যক্রমে এটি পরিচালনার ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন মুসলমানদেরই হাতে। আরবী ও ফারসীর শিক্ষা সরকারী চাকরিতে রুযী-রোজগারের পথ হিসেবে বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফারসী ও আরবীই হয়ে রইলো এর একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। একটা ভীষণ রকমের দুর্নীতিও মাদ্রাসাটিতে ঢুকে পড়ে এবং তার দরুন ১৮১৯ সালে একজন ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮২৬ সালে আরও চেষ্টা করা হয় শিক্ষায়তনটিকে পরিবর্তিত অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নিতে। একটা ইংরেজী ক্লাসও খোলা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন বছর পর আর একটা কায়েমী চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ফলও অশানুরূপ হয়নি। পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান কলেজটি সমান দশায় পতিত হয়। তার দিকে আর কোনই লক্ষ্য রাখা হয়নি; আর যখনই সরকার তার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করতো, তখনই তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসহিষ্ণু উক্তি প্রকাশ পেতো।

১৮৫১ সাল থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষ অবশ্য শিক্ষায়তনটির সংস্কার করতে সজাগ হলেন। কারণ তখন সেটা প্রকাশ্য কলংকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার ফলে যে-সব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়[৬০] সে সবের সারমর্ম হলো এই: মাদ্রাসাটিকে দু'টি বিভাগে ভাগ করা হয়; নিম্ন বিভাগটির ইংরেজী-ফারসী বিভাগ নামকরণ করে তাতে উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী একটা মধ্যম মান পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৬১] উচ্চ বিভাগে কেবল আরবী শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু শীঘ্রই এই পরিকল্পনারও দোষগুলি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষার্থীরা যখন কেবল আরবী-শিক্ষার বিভাগে উত্তীর্ণ হয়, তখন নিম্নবিভাগে নানা বিষয়ে যা কিছু

---

৫৯ বাঙ্‌লা দেশে মাদ্রাসা বলে।

৬০ জে. আর. কলভিন কর্তৃক। তিনি এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তি আর ফারসী ও আরবীতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দরুন তিনি আস্থারও উপযুক্ত। মিঃ টমসনের মৃত্যুর পর তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির ছোট লাট নিযুক্ত হন। মিউটিনির সময় তিনি আগ্রা কিল্লাহ্‌র মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

৬১ বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পর্যন্ত মানের।

শিক্ষালাভ করেছিল, সে-সব ভুলে যেতে থাকে। ১৮৫৮ সালে এই বিভাগের ফলাফল সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা হয়ঃ 'মাদ্রাসা থেকে কয়েকজন শিক্ষিত লোক বের হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারা নিজেদের সংকীর্ণ প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ভাল হলেও সরকারী বা সাধারণ জীবনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্থান করে নিতে একেবারে অনুপযুক্ত এবং তার দরুন তারা গোঁড়া, আত্মকেন্দ্রিক, হতাশ ও অসন্তুষ্ট শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে, অবশ্য যদি তারা রাজদ্রোহী না-ও হয়।[৬২]

আর একবার মাদ্রাসাটি সংস্কারের চেষ্টা করা হয় এবং তারপর বছর-দুয়েক বেশ ভালভাবেই চলতে থাকে।[৬৩] কিন্তু পুনরায় অবস্থা সাবেকের মতই খারাপ হয়ে উঠে। তখন ১৮৬৯ সালে বাঙলা সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। সেটি আজও মাদ্রাসার অকৃতকার্যতার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত। সত্য কথা এই যে, এই মাদ্রাসাটি ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা কার্যকরী জীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেনি। সমকালীন একজন মশহূর মুসলমান সংস্কারক[৬৪] বলেছেনঃ 'সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীই ছাত্রদেরকে মাত্র আধা-আধিভাবে গড়ে তুলতো। একমাত্র আরবী সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে তারা আগেকার সামান্য ইংরেজী শেখার সুবিধাও হারিয়ে ফেলতো, কারণ মাদ্রাসায় পড়ে আর ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে যা কিছু ছিটে-ফোঁটা ইংরেজী তারা শিখতো, তা-ও ভুলে যেতে বেশী সময় লাগতো না।'

এখন আমি সংক্ষেপে দেখাবো, এতো ভালো করার চেষ্টা সত্ত্বেও কেন অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমত, মাদ্রাসাটির তদারক-ব্যবস্থা অত্যন্ত কাঁচা ছিল। এমন কি খুব কম সময়ের জন্যও যে একজন ইংরেজ

---

৬২ ই. সি. বেইলী। আলোচ্য অধ্যায়ের বহু মতামতের জন্য আমি তাঁর সংগৃহীত তথ্যের উপর ঋণী।

৬৩ মাদ্রাসার অবৈতনিক অধ্যক্ষ কর্ণেল নাসুলীজের সুপারিশ অনুযায়ী। তাঁর পক্ষে এ-কথা বলা উচিত যে (বর্তমানে তাঁর নিজের পক্ষে বলবার জন্য তিনি ভারতে নেই), বারে বারে তিনি এই সংস্কারের উপযোগীতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জোর দেন। আর আমি যে-সব সুপারিশ করছি, সে-সব তিনি বহু বছর আগে উপস্থিত করেছিলেন।

৬৪ মওলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর (পরে তিনি 'নওয়াব' খেতাব পান---অ)।

অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরও নিয়োগ এবং কর্তৃত্ব ছিল নামমাত্র। তাঁর আরও গোটা দুয়েক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ছিল, আর তাঁর অন্যান্য বেতনের সংগে নামমাত্র অতিরিক্ত কিছু ভাতা সংযোগ করে দিয়ে সেই সংগে বাঙলা দেশের এই বিরাট মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদটা কতকটা অবৈতনিক হিসেবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে, বর্তমান অধ্যক্ষের প্রধান চাকরি হলো পরীক্ষক-বোর্ডের সেক্রেটারী। আবার এই প্রেসিডেন্সীর ফৌজী কর্মচারীদের চাকরিতে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যে পরীক্ষা দিতে হয়, সেটাও ছিল তাঁর হাতে। তাছাড়াও, সিভিলিয়ানরা দেশীয় ভাষায় যে যোগ্যতার পরীক্ষা দেয়, তা-ও তাঁরই হাতে ছিল। আবার তিনিই ছিলেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে সহকারী সেক্রেটারী ও অনুবাদক। এ-সব ছাড়াও সরকারের যে-সব কমিটি নিযুক্ত হতো, তাতেও অন্যান্য নানা বিষয়ের নিষ্পত্তির ভারও তাঁকে মাঝে মাঝে নিতে হতো। এ-সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁকে মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে হতো। অতএব, তাঁর বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে তিনি যতোই আগ্রহের সংগে এই কাজের ভার গ্রহণ করুন না কেন, এরকম ব্যবস্থায় যথাযথ পারদর্শিতা দেখানোর আশা করাই বৃথা।

মাদ্রাসার আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থা আরও খারাপ; একজন সুযোগ্য ও কর্মঠ পণ্ডিত লোক নিম্নভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর তদারককাজ যেখানে সবচেয়ে বেশী দরকার, সেই উচ্চ আরবী বিভাগে তাঁর কোন হাতই ছিল না। এই বিভাগের উপরেই শিক্ষায়তনটির যাবতীয় সাফল্য নির্ভর করতো অথচ এটি ছিল দেশীয় মওলবীদের পুরোপুরি হাতে। তাঁদের মধ্যে একজন নামে মাত্র অন্য সকলের উপরে স্থান পেতেন এবং তাঁকে বলা হতো প্রধান মওলবী; কিন্তু বড়ো-ছোট বিচারের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, তার দরুন নিম্নতম মওলবীরা তাঁর নিকট জওয়াবদিহি করতেন না এবং তাঁকেও জামাতের বা ক্লাসের বাহিরে দেখা যেতো না।[৬৫] কোনো মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা

৬৫ আমি জানিনে, একটা কমিশন এখনও তদন্ত করছে, এই হিসেবে এ-সব ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা; কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলছি, কমিশন নিয়োগের সময় মাদ্রাসার সাধারণ কাজ সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি সবই হুবহু সত্যি।

ছিল না, দৈনিক বা সাপ্তাহিক ক্লাস পরিদর্শনও করা হতো না। অতএব এটা পরিষ্কার যে, এরকম ব্যবস্থায় কোন সুফল আশা করা যায় না। অধ্যক্ষ সাহেব নিজে তদারক করবার সময় পেতেন না কারণ তাঁর আরও কাজ ছিল; আর প্রধান মওলবী কখনও চেষ্টা করেননি; ফলে তার কি বাস্তব পরিণতি দাঁড়িয়েছিল তা আমাদের নযরে এসেছে।

এই অবহেলার দরুন বাঙলার মুসলমান তরুনদের কি সর্বনাশ হয়েছিল, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, একপুরুষ আগে আমরা হুগলীর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেওয়ার পর কলকাতা মাদ্রাসাই ছিল একমাত্র শিক্ষায়তন যেখানে তাদের উচচ শিক্ষা পাওয়ার আশা ছিল। প্রায় শতাধিক তরুণ লম্পট্যের লীলাভূমি একটি প্রাচ্যদেশীয় রাজধানীতে ভীড় জমাতো, সাত বছর ধরে কুসংসর্গে বাস করতো; অথচ তাদের চরিত্রের উপর কোনও শাসন ছিল না। কিংবা সন্ন্যানার্হ কর্মকৃতের দৃষ্টান্তও তাদের আয়ত্তে ছিল না। শেষে কোন কাজের উপযুক্ত না হয়েই তাদেরকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হতো। তাদের মধ্যে শতকরা আশিজন আসতো পূর্ব বাঙলার ধর্মান্ধ জিলাগুলি থেকে ৬৬। কিন্তু বাঙলার সবচেয়ে রাজভক্ত এই জিলাগুলির তরুণরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজীতে কোন জ্ঞান না থাকার দরুন কোনও অর্থকরী পেশা যোগাড় করার অক্ষমতা নিয়েই মাদ্রাসা থেকে বিদায় নেয়। এদের অধিকাংশই গরীবের ছেলে, তার দরুন প্রায়ই কলকাতায় এসে ইংরেজ ভদ্রলোকদের খানসামাদের[৬৭] ঘরে 'জায়গীর' থেকে তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর করে দিন কাটায়। এই খানসামারা মুসলমান সম্প্রদায়ের টাকাপয়সাওয়ালা শ্রেণী এবং বিজিত জাতির দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য নিয়ে এই পরিচারকদল মুনিবদের অসাক্ষাতে তাদের কুৎসা গায়। ছাত্রেরা সবাই ষোল বছরের উপরে, কেউ বিশ বছরের এবং আমার অবগতিমতে কেউ ত্রিশ বছরেরও উপরে। যে-সব খানসামার বাড়ীতে তারা বাস করে, তারা পুণ্যের কাজ হিসেবে

৬৬ চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও শাহবাযপুর থেকেই বেশী ছেলে আসত।

৬৭ এই খানসামারা গরীব ছাত্রদের পোষণ করতো ধর্মীয় কাজ হিসেবে। এভাবে থাকতে খেতে দেওয়াকে 'জায়গীর' বলে। আসলে 'জায়গীর' প্রথাটা মুসলমান হুকুমতের সময় জংগী কর্মচারীদের মধ্যে ছিল।

তাদের ভরণ-পোষণ করে এবং অনেক সময় নিজেদের কন্যাদের সংগে তাদের বিয়ে-শাদীও দেয় মোটা রকম যৌতুক দিয়ে; এ ছাত্রেরা আসে ছোট-খাট কৃষক শ্রেণী থেকে। ইংরেজী বা বিজ্ঞানে তাদের মোটেই ঔৎসুক্য নেই, ফারসীতে একটু আধটু আছে। শুধু আরবী ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ও ইসলামী আইনের প্রতিই তারা অনুরক্ত। বাড়ীতে তারা নিজেদের স্বল্প জমি-জমা চাষ করে কিংবা নৌকা চালায়। আর ব-দ্বীপের জিলাগুলির কথা অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, যা কলকাতার মুসলমানদের মোটেই বোধগম্য নয়।

এই হলো নতুন ছাত্রের রূপ। কয়েক বছরের মধ্যেই সে অমার্জিত বুলি ভুলে যায়, দাড়ি ছাঁটাই করতে থাকে এবং মুসলমান আইনের তরুণ বক্তা হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে। সদাশয় সরকার এই একশো জন ছাত্রের আটাশ জনকে বৃত্তি দিয়ে থাকে; সুতরাং আজ হোক, কাল হোক, সামান্য চেষ্টাতেই যে কোন তরুণ একটি বৃত্তি পেয়ে যায়। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে যারা বেশী কাজের, কিন্তু পড়াশুনায় কম আগ্রহী, তারা কোন একটা ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করে দেয়। উপর ক্লাসের পড়ুয়ার নিজের স্বাভাবিক বড়াই আছে। সে কলকাতার রাস্তায় বইয়ের বোঝা বগলে নিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটে এবং গরীব জায়গীর-ভোজীর অবস্থা ভুলে গিয়ে যে খানসামার ঘরে তার থাকা-খাওয়া মেলে তার কাছেও মস্ত আলীমের সম্মান দাবী করে। আমাদের দূরদৃষ্টির স্বল্পতাহেতু কাযীর পদ তুলে দেওয়ার ফলে এখন এ-সব ফরমানহীন লোকের হাতে শরীয়তী আইন প্রয়োগের ভার পড়েছে। মাদ্রাসায় পড়ুয়ারা ছোট ছোট মুসলমান পরিবারে বিয়ের 'কালিমা' পড়ায়, ফরায়েয কষে দেয় এবং হিদায়া ও জামি-উর-রমুয নকল করে মোটামুটি ফতোয়া বেচে খায়।

কলকাতা মাদ্রাসার এই হতভাগ্য তরুণদের মতো সদুপদেশের প্রয়োজন আর কারো জন্য অনুভূত হয়নি; কিন্তু তা কতোখানি তারা লাভ করতো সে কথা আমি আগেই বলেছি। প্রত্যেক বছরেই তারা আমাদের শিক্ষায়তন থেকে তাদের সংকীর্ণ ধরনের শিক্ষা পেয়ে থাকে, চরিত্রে আরও পাপাশয়ী হয়ে ওঠে, কোনও কার্যকরী পেশায় একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে আর পরিশেষে আমাদের সরকারের প্রতি আরও

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা একজন ইংরেজের উপস্থিতিও ঘৃণার চোখে দেখে। খুবই কেলেংকারী প্রকাশ হয়ে পড়ায় মাদ্রাসায় একজন আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপকের নিয়োগ যখন অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে[৬৮], তখন তাঁকে রাতের অন্ধকারে গোপনে ঢুকিয়ে নিযুক্তি দেওয়া হয়। গত নব্বই বছরেরও অধিক বিধর্মীদের সংগে জিহাদ-সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি এখানে সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল এবং ১৮৬৮ কিংবা ১৮৬৯ সালে, আমার ঠিক স্মরণ নেই, বিদ্রোহের বিধান সম্বন্ধে পরীক্ষায় রীতিমতো প্রশ্নও দেওয়া হয়েছিল। মাদ্রাসাটির আওতার মধ্যেই ষড়যন্ত্রের আড্ডারূপী একটি মসজিদ[৬৯] সর্বদা সরগরম হয়ে থাকে এবং সকল ছাত্রই কলকাতার সমস্ত বিদ্রোহের আড্ডারূপী মসজিদগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। মাদ্রাসার বর্তমান হেডমাষ্টার হলেন একজন মশহূর আলীমের পুত্র। এই আলীম ব্যক্তি আঠারো শ সাতান্নর 'মিউটিনিতে' পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষে ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসী হয়ে এখন অপরাধ ক্ষালন করছেন। এই রাজদ্রোহীর বিরাট কুতবখানা সরকার বাযয়াফ্‌ত করেছেন এবং এখন সেটি কলকাতা মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত হয়েছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপক একজন মুসাফির আরবকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ তিনি 'ইসলাম জারি করতে' অর্থাৎ এমন সব মত প্রচার করতে এসেছিলেন, যার ফলে আমাদেরকে তিনটি সীমান্ত যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সারা সাম্রাজ্য বিদ্রোহের বেড়াজালে ছেয়ে গেছে।

সাত বছর ধরে এ ধরনের শিক্ষা দান করে আমরা এ-সব মুসলমান তরুণকে পূর্ববংগীয় ধর্মান্ধ জিলাগুলিতে ফেরত পাঠাই। এ ক্ষেত্রে আর একটা দুঃখের কাহিনীও বলতে হয়। গত দু'বছর ধরে যে তদন্ত কমিশন বসেছে, সে সময়কার কথা আমি বলছিনে; কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, কিছুদিন আগেও

---

৬৮ বর্তমানে মি. ব্লকম্যান। দুর্ভাগ্যক্রমে আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপকের আরবী বা উচ্চবিভাগের উপর কোন শাসন নেই।

৬৯ ফারাযী মসজিদ।

ছাত্রেরা মাদ্রাসার মধ্যেই বারবনিতা আমদানী করতো।[৭০] প্রায় ছাব্বিশ জন ছাত্র পৃথক কামরা নিয়ে বাস করে। সরকারের দেওয়া এ-সব আবাসকে তারা লাম্পট্যের আড্ডাখানা করে তুলেছিল। কার্লাইল যাদের উল্লেখের অযোগ্য নারী বলেছেন তাদেরকে পোষণ করা ছাড়াও ছাত্রেরা এমন সব অস্বাভাবিক বীভৎস পাপে লিপ্ত থাকতো, যা খ্রীস্টান ধর্ম ইউরোপ থেকে বিলোপ করে ফেলেছে, কিন্তু যার অস্তিত্ব ভারতের বড়ো বড়ো শহরে এখনও আছে। গত পাঁচ-ছয় বছরে এ রকম তিনটি ঘটনা ধরা পড়েছে, কিন্তু কতো যে ঘটেছে, কোনোকালেও তা জানা যাবে না।

এই ছাত্রদের মধ্যে যারা ইচ্ছা করতো যে, নিজেরাই উন্নতি করবে, তাদেরও উপযুক্ত কিংবা বাস্তব কিছু শিক্ষা করবার কোনও সুযোগ ছিল না। প্রথমতঃ দৈনিক শিক্ষাদানের সময় ছিল অত্যন্ত কম। দৈনিক পড়াবার সময় ছিল বেলা দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত। তার থেকে কুড়ি মিনিট সময় চলে যেত মাদ্রাসার চলতি-ভাষায় 'মুসার ছুড়ি' অর্থাৎ হুক্কা টানার জন্য, আর প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যেতো হাযিরা লেখার জন্য—এ কাজটি দৈনিক দু'বার করতে হতো কারণ অনেক ছাত্রই বেলা বারোটার পর উধাও হয়ে যেতো। বহু কর্মঠ ছাত্র মাদ্রাসার এই অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলি পূরণ করে নিতো বাইরের খারিজী মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে; কিন্তু এসব খারিজী পড়ার বিষয় ছিল প্রধানত হাদীস ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ রকমের শরীয়তী আইন—এসব পড়ে তরুণদের মাথা আত্মগরিমায় ভরে যেতো, আর তার ফলে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাদ্রাসার ভেতরে তিক্ত ধর্মীয় মতভেদের সৃষ্টি করতো। কিছুদিন আগে আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপক যখন সন্ধ্যার পর তদারকে টহল দিয়ে ফিরছিলেন, তখন তিনি ছাত্রদের কামরায় তুমুল হট্টগোল শুনতে পান। 'তুম্হারা ঈমান্ ঠিক নেহি' অর্থাৎ 'তোমার ঈমান ঠিক নেই' প্রভৃতি কথা বারান্দাগুলি থেকে শোনা যাচ্ছিল এবং চারদিকে তুমুল নিন্দাবাদ উঠছিল। তিনি তাড়াতাড়ি গোলমালের দিকে ছুটে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, একজন

৭০ ইংরেজ অধ্যক্ষ কর্ণেল নাস্থলীজ মাদ্রাসায় বাস করতেন এবং তাঁর পক্ষে বলা যায় যে, এ-সবের জন্য তাঁকে দায়ী করা চলে না। আর যখন এ-সব বারনারীর অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন এরকম কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যে, সে-সবের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ছাত্র এই বলে চেঁচাচ্ছে যে, সে আইনের কিতাবে দেখেছে যে, নামাযের সময় গোড়ালি দুটো একত্রে বদ্ধ রাখতে হবে, অন্যথায় তার নামায বেহেশ্‌তে বা দুনিয়ায় কোনখানেই কবুল হবে না। যারা গোড়ালি ফাঁক করে নামায পড়েছিল, তারা এই নয়া তরিকার আবিষ্কর্তাকে কাট্টা কাফের বলে নিন্দা করছিল, আর সেই ছাত্রটি ও তার ক্ষুদ্র সমর্থকের দল পুরোনো তরিকায় নামায পাঠকদেরকে দোযখের অনন্ত শাস্তিতে নিক্ষেপ করছিল।

ছাত্রেরা মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিকট থেকে দৈনিক বড়ো জোর তিন ঘণ্টা শিক্ষা পেতো—যাঁর এ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন যে, শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রায়ই আড়াই ঘণ্টার বেশী হতো না। বাড়ীতে পাঠ তৈরী করা একেবারে অজানা ব্যাপার ছিল এবং বাস্তবিক মুসলমানদের ধারণার বিপরীত ছিল। প্রত্যেক মওলবী একটি আরবী বাক্য আওড়াতেন, তারপর তার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে শেষ শব্দটির পর্যন্ত পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করতেন। পরিশ্রমী ছাত্র এ-সব ব্যাখ্যা মূল পাঠ্য-পুস্তকের লাইনগুলির মধ্যে লিখে নিতো এবং তারপর আয়াসমতো সমগ্র বাক্যটি ও তার ব্যাখ্যা মুখস্থ করে ফেলতো। বাড়ীতে তাকে অভিধান ব্যবহার করতে শেখানো, কিংবা নিজে নিজেই কোনো অংশের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা পাওয়া তার পক্ষে অজ্ঞাত ব্যাপার ছিল, হয়তো তার ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল এবং এটা নিশ্চিত যে, কলকাতা মাদ্রাসায় ইহা একেবারে অজ্ঞাত ছিল। সাত বছর ধরে ছাত্রেরা কতকগুলি কিতাব মূল ও ব্যাখ্যাসহ একেবারে মুখস্থ করে ফেলতো; কিন্তু তাদের সংকীর্ণ পাঠ্য-পুস্তকের বাইরের যদি কোনো একখানা সহজ গ্রন্থও তারা পড়তে যায়, তাহলে তারা বিদ্যের সব পুঁজিই হারিয়ে ফেলে। সহজেই অনুমেয় যে, এ ধরণের শিক্ষার ফলে তাদেরকে যা কিছু পড়ানো হয়নি, সে সম্বন্ধে তাদের অনুদার অবজ্ঞাই জাগ্রত হয়। আর তাদের শিক্ষার অসারতাই তাদেরকে আরও আত্মগর্বী করে তোলে। তারা এটাই খাঁটি সত্য মনে করে যে, আরবী ব্যাকরণ, আইন, অলংকার ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই শেখার নেই। তারা শেখে যে, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত রাজ্য হচ্ছে প্রথম আরবের, তারপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার; আর বৃহত্তম শহর

হিসেবে মক্কা, মদীনা ও কায়রোর পর হচ্ছে লণ্ডন। তাছাড়া ইংরেজরা হচ্ছে কাফির এবং পরলোকে অত্যন্ত উষ্ণ জায়গায় তাদের ঠাঁই হবে। এতোসব বিদ্যের জাহাজ হয়ে তাদের আর বেশী শেখার কী দরকার? যখন একজন সাবেক অধ্যক্ষ উর্দু ভাষার মাধ্যমে তাদের অপবিত্র-বিজ্ঞান শেখাতে শুরু করেছিলেন তখন তারা তাঁকে ইট-পাটকেল ও পচা আম ছুঁড়ে মেরে কি উচিত কাজ করেনি?

আমি এ-সব বেদনাদায়ক বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছি; কারণ আমি মনে করি যে, তার দরকার আছে। আর এখন সরকার যখন মুসলমানদেরকে শিক্ষিত করে তোলার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে, তখন সরকারের উচিত, তার মহৎ প্রচেষ্টা পূর্বে যে কারণে নিষ্ফল হয়েছে সেটি বর্জন করা। কলকাতা মাদ্রাসার ভার প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আর তাদের তত্ত্বাবধানে থাকাকালেই এর এতো কুৎসা ও কলংক রটেছে। প্রথমে আমাদের কোমল-স্বভাব এবং পরে মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষীয়মাণ ভাগ্যের প্রতি উদাসীন থাকার দরুন সরকার এই শিক্ষায়তনটির অযোগ্যতার বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ করেনি কিংবা তার সংস্কার সাধনের কোনো চেষ্টাও করেনি। একশো বছর ধরে দেশীয় হস্তে পরিচালনের ফলে প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের চাহিদা পূরণে সক্ষম না হয়ে তাদের কুসংস্কার যোগাবার আকর হয়ে উঠেছে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এই হয়েছিল যে, আমরা মাদ্রাসাটিকে মুসলমানদের উপরেই বড়ো বেশী করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ১৮১৯ সালে প্রথমে এ-সব পরিস্কারভাবে ধরা পড়ে, কিন্তু তখনকার সরকার এই রকম ভেবেছিলেন যে, একজন ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করে নামমাত্র শাসনে আনলেই যথেষ্ট হবে। গত বিশ বছর ধরেও একই হস্তক্ষেপের অনিচ্ছা লক্ষ্য করা গেছে এবং সংস্কার সাধনের সব রকম প্রচেষ্টা তার দরুন ব্যর্থ হয়েছে। শেষে যখন একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হলো, তাঁরও চাকরি হলো অবৈতনিক ও নামমাত্র। আর শেষ পর্যন্ত যখন একজন আবাসিক অধ্যাপক নিযুক্ত করা হলো, তখন যে বিভাগে তাঁর কর্তৃত্ব সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল, সেখানেই তা শেষ হয়েছিল।

কিছুদিন আগে একখানা সরকারী কাগজে এই অনুযোগ করা হয়েছিল যে, কেবল উত্তর ভারতের মুসলমানরাই আমাদের স্কুলসমূহে টাকা পয়সা ও ছাত্র দিয়েই যথেষ্ট সাহায্য করে। এর জওয়াব খুবই সোজা। বাঙলা দেশে কলকাতার নাখোদা সম্প্রদায়ের মতো অর্থশালী ও ধর্মনিষ্ঠ পরিবারগুলিও আমাদের স্কুলগুলির সংগে কোনো সংস্রব রাখে না, কারণ সে-সবে ফারসী ও আরবী পড়ানো হয় না এবং কাফির হিন্দু শিক্ষকদের প্রভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় বিশ্বাসও শিথিল হয়ে যেতে পারে। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই তাদের ছেলেদেরকে আমাদের স্কুলে পাঠায়; কিন্তু বাঙলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান এতোই সংখ্যাল্প যে, তার কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। আমাদের জনশিক্ষা প্রণালী মোটেই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের নিকট পোঁছাতে পারেনি, যদিও আমি জানি যে, রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ প্রভৃতি মিশনারী স্কলগুলিতে অজস্র ছেলে পড়তে আসে। পূর্ববাঙলার ধর্মান্ধ কৃষক শ্রেণীর মুসলমান জনগণ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার ও ইংরেজীয়ানার প্রভাবের বাইরেই বরাবর রয়ে গেছে।

তবু আমি বিশ্বাস করি যে, খুব কম সরকারী খরচে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব শ্রেণীর উপযুক্ত একটা কার্যকরী শিক্ষা-প্রণালী গঠন করা যেতে পারে। এই প্রণালীতে নিম্নশ্রেণী, মধ্যমশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদান বিধিগুলিকে উদারভাবে প্রণয়ন করলেই যথেষ্ট হবে। এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী দরকার অর্থের নয়, মুসলমানদের বিশেষ অভাবগুলির বিবেচনাই বেশী দরকার। সরকার উচিতভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত দুটো স্কুলকেই সাহায্যদান করা হবে না। কারণ, এরকম সাহায্যদানে দুটো স্কুলের মধ্যে সরকারী অর্থেরই নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হবে। সুচতুর হিন্দুরা অন্যান্য বিষয়ের মতো এখানেও আগে-ভাগে ক্ষেত্র দখল করে বসে আছে। তারা স্ব-সম্প্রদায়ের অভাব উপযুক্ত রূপে মোচনের উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্রই স্কুল খুলে দিয়েছে। কিন্তু সেগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে একেবারে অনুপযুক্ত। অতএব, পাঁচ মাইলের নিয়মটা এরকম ভাবে শিথিল করতে হবে, যাতে উক্ত ব্যবধানের মধ্যে হিন্দু স্কুল থাকলেও মুসলমানের স্কুলেও সরকারী সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। যেখানে পৃথক স্কুলের দরকার নেই,

সেখানে বর্তমান হিন্দুর স্কুলেই একজন মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারা যায়। এরকম মুসলমান শিক্ষক সপ্তাহে মাত্র পৌনে চার টাকা দিয়েই মিলতে পারে।

পূর্ববংগের ধর্মান্ধ জিলাগুলির জন্য আমার বিবেচনায় সরকারকে এক বিশেষ ব্যবস্থা করে মুসলমান কৃষক সমাজের অভাব মেটাতে হবে। হিন্দুদের জন্যও এক সময় এরকম বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ এককালে যে-সব জায়গায় স্বাবলম্বী স্কুলের দাবী দেখা যায়নি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করে সে-সব জিলায় শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে আমি যখন বাঙলা দেশের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলাম তখন এরকম আটত্রিশটি স্কুলের অস্তিত্ব ছিল। সেগুলির জন্য সরকারকে বাৎসরিক খরচ বহন করতে হতো সাড়ে ষোল হাযার টাকা, তাছাড়া ছাত্রদের বেতন বাবদ আরও প্রায় চার হাযার টাকা খরচ করতে হতো। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, সেগুলি কোনক্রমেই স্বাবলম্বী ছিল না। তবু স্কুলগুলি যে মঙ্গল করেছে, তার কিছুতেই পরিমাপ করা যায় না। যেখানেই কৃষকরা বেশী অশিক্ষিত, বেশী গরীব, কিংবা বেশী গোঁড়া হওয়ার দরুন সরকারী-সাহায্য-দানের নিয়মে স্কুল চালাতে অক্ষম দেখা যেতো, সেখানেই একটা হার্ডিঞ্জ স্কুল সাময়িক-ভাবে বসানো হতো। প্রথমে গ্রামবাসী প্রায় বিনা খরচে শিক্ষা লাভ করতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত শ্রেণীর উপস্থিতির দরুন আরও শিক্ষা-প্রসারের দাবী সৃষ্টি হলেই ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হতো। কয়েক বছরের মধ্যেই স্বাবলম্বী হওয়ার আগ্রহ জন্মাতো, আরও উন্নত ধরনের স্কুল গড়ে উঠতো, আর তখন সস্তা ধরনের হার্ডিঞ্জ স্কুলটি দেশের অন্য অনগ্রসর স্থানে সরিয়ে নেওয়া হতো। এভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে গভীর থেকে গভীরতর ভাবে শিক্ষার বিকীরণ হয়েছে।[৭১]

আমার মনে হয় পূর্ব বাঙলার ধর্মান্ধ জিলাগুলির জন্যও এখন অনুরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে জনগণ বংশানুক্রমে আমাদের সরকারের প্রতি ও আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট, তাদের জন্য সরকারী

---

৭১ ১৮৬৫-১৮৬৬ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে স্কুল ছিল ২৮৩টি এবং মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬,০৪৩ জন।

সাহায্য নীতির দ্বারা কোনো ফল হবে না ; কিন্তু পঞ্চাশটি সস্তা ধরনের স্কুল কম বেতনের মুসলমান শিক্ষক দিয়ে যদি মোটা সরকারী সাহায্যে চালানো যায়, তাহলে মাত্র এক পুরুষেই পূর্ববাঙলার সুর পালটে যেতে পারে। প্রথমে অবশ্য এ ধরনের স্কুল দ্বারা কম উপকারই পাওয়া যাবে ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেগুলিতে কেবল মুসলমান ছেলেরাই আকৃষ্ট হবে না[৭২], মুসলমান শিক্ষকরাও আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, কারণ তারা অতিকষ্টে নিজেদের উপায়ে জীবিকার্জন করে ; কাজেই সরকার থেকে সাপ্তাহিক পৌনে চার টাকার আয় অতিরিক্ত পাওয়া গেলে তাদের নিকট নিশ্চয়ই সেটা একটা পৃথক সৌভাগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এভাবেই আমাদের পক্ষে সেই শ্রেণীটিকে আমরা পেতে পারি, যারা এপর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রকমে বিরূপ।

মুসলমানদের জন্য নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার পক্ষে এই হবে যথেষ্ট ব্যবস্থা। তাদের জন্য মধ্য শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে আরও কম পরিবর্তনের দরকার হবে। ওহাবী মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অনেক আগেই সুপারিশ করেছেন যে, মওলবীদেরকে প্রত্যেক জিলা-স্কুলে নিয়োগ করা উচিত। আমার মতে এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট হবে। এ-সব মওলবী উর্দু ভাষার মাধ্যমে সবরকম সাধারণ শিক্ষা দেবেন, এবং এই ভাষাজ্ঞানে পুরো শিক্ষা দান করবেন, ফারসী ভাষার সংগে পরিচিত করাবেন, আর একটু-আধটু ইংরেজীও শেখাবেন। জিলা সরকারী স্কুলসমূহের চলতি সুর অবশ্য বজায় থাকবে এবং যে-সব মুসলমান ছেলে সেখানে পড়তে আসবে, তাদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ জন্মাবে।

এ-সব পরিবর্তন করতে হয়তো সামান্য কিছু খরচ হবে, কিন্তু মুসলমানদেরকে একটা পূর্ণাংগ ও কার্যকরী উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারকে একটি পয়সাও ব্যয় করতে হবে না। ওয়ারেন্ হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসার জন্য যে টাকা রেখে গেছেন এবং হুগলীর ওয়াক্‌ফের যে

---

৭২ দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের আটত্রিশটি 'হাডিঞ্জ ও মডেল স্কুল'-এর ছাত্র সংখ্যা ১৮৬১-১৮৬২ সালের ১৪০১ জন থেকে ১৮৬৫-১৮৬৬ সালে ২০৩৪ জনে বৃদ্ধি পায়। ঐ বছরেই আমার রিপোর্ট যায়। এই সময়ে ছাত্রপ্রতি খরচের হার নয় টাকা থেকে কম হয়ে প্রায় সাড়ে ছয় টাকা দাঁড়ায়।

বিরাট সম্পত্তি রয়েছে, সে-সব যদি উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলেই যথেষ্ট হবে। একটা ইংরেজী কলেজ চালাতে বর্তমানে আমরা যে তহবিল আত্মসাৎ করছি, সে অর্থ ওয়াকিফ্‌রা যে উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন অতঃপর সে উদ্দেশ্যেই তা ন্যায়সংগতভাবে খরচ করতে হবে। একটা কি দুটো সত্যিকার ভালো মাদ্রাসার দরকার আছে কিনা, মাদ্রাসাটি কলকাতায়, না সেখান থেকে রেলপথে কুড়ি মাইল দূরে হুগলীতেই থাকবে, এ-সব হলো খুঁটিনাটির কথা, আমি সে সম্বন্ধে বলতে চাইনে। বর্তমানে প্রকৃত শিক্ষাদানের কাজ মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারাই চলতে থাকবে, কিন্তু প্রত্যেক মাদ্রাসায় এমন একজন আবাসিক ইউরোপীয় অধ্যক্ষ থাকবেন, যাঁর আরবীতে দখল থাকবে এবং অধীন শিক্ষকদের খবরদারী ও তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবারও সামর্থ্য থাকবে। এরকম পদের জন্য বার্ষিক আঠারো থেকে সাড়ে বাইশ হাযার টাকা বেতনে নিশ্চয়ই বিলাতী কিংবা জার্মানীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব উচ্চমানের পণ্ডিত ব্যক্তিও মিলতে পারে।

এরকম উচ্চশ্রেণীর শিক্ষায় কলকাতা মাদ্রাসার মতো দু'টি পৃথক বিভাগ থাকবে না, কারণ উচ্চ বিভাগের ছাত্রেরা নিম্নবিভাগে যা কিছু শিখেছিল, সবই ভুলে যায়। তাতে সুপরিকল্পিত অবিচ্ছিন্ন কারিকুলাম থাকবে। বর্তমান উচ্চ বা আরবী বিভাগকে ইংরেজী-আরবী বিভাগে পরিণত করা হবে এবং তা হবে নিম্নবিভাগের অর্থাৎ ইংরেজী-ফারসী বিভাগের সুসম্মিলিত প্রসারণ। তাহলে এভাবে একটি মুসলমান ছেলে সহজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরকারী জিলা স্কুল থেকে কলেজের দু'টি বিভাগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সর্বোত্তম শাখায় উঠতে পারবে। মুসলমানী আইন সকলকেই নিয়মিত শিক্ষা হিসেবে পড়ানো অপরিহার্য কিনা, সন্দেহের বিষয়। তবে এটাকে নিশ্চয়ই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতে দেওয়া হবে না। কারণ, মুসলমানী আইন মানেই মুসলমান ধর্ম—আর সে ধর্মটা হলো সে আমলের, যখন তার অনুসারীরা সারা দুনিয়াটাকে তাদের ন্যায্য শিকার হিসেবে বিবেচনা করতো এবং যখন তারা একটা খ্রীস্টান সরকারের সংগে আধুনিক মিত্রতাবদ্ধ মুসলমান রাষ্ট্রের কার্য কী, কিংবা খ্রীস্টান সরকারের অধীন হিসেবে দায়িত্ব কী, তা শেখেনি। আবার আইন শেখানো একেবারে বন্ধ করে দেওয়াও সমীচীন হবে না,

কারণ একেবারে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলে সমকালীন মুসলমানদের মধ্যে মাদ্রাসাটির জনপ্রিয়তা বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠবে। তবুও, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানী আইন শেখানোর আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা অর্থাৎ একদল উপযুক্ত কাযী তৈরি করার প্রয়োজন আপাততঃ আর নেই। এটা শিখিয়ে সরকারের আর কোনো চাহিদা মেটে না এবং শিক্ষিতদের জীবনোপায় হিসেবেও এ আর কাজে লাগে না। পৃথকভাবে বক্তৃতা দিয়ে এবিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের হিন্দু আইন পড়ানো হয়। কেবল ইসলামী আইনেই দিন দিন কসরৎ না করিয়ে তার জায়গায় বর্তমানে আরবী ও ফারসী সাহিত্যের প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং তার সংগে উর্দুর মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও শেখানো যেতে পারে।

আমাদের উচিত, এভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটি নয়া সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যারা নিজেদের সংকীর্ণ শিক্ষার গণ্ডীতেই আর শিক্ষিত হবে না, বা শুধু তাদের মধ্য যুগের আইনের উৎকর্ষ বিধানের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হবে না বরং তারা পাশ্চাত্য সংযত ও স্বাস্থ্যকর জ্ঞানের দ্বারা অনুরঞ্জিত হবে। আবার সেই সংগে তাদের ধর্মীয় আইনেও যথেষ্ট দখল থাকবে, আর তার দরুন তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, অথচ ইংরেজীতে দখল থাকার দরুন তারা জীবনে অর্থকরী পেশায়ও ঢুকতে পারবে।

মুসলমানদের নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর শিক্ষার খবরদারির জন্য তাদেরই ধর্মে বিশ্বাসী একজন বিশেষ ডেপুটি ইন্স্পেক্টর-অব্-স্কুলস্ দরকার হবে। বাৎসরিক তিন হাযার টাকা বেতনে এরকম কর্মচারী পাওয়া যেতে পারে। তার একটা প্রথম কর্তব্য হবে, দেশীয় পরিচালনায় যতো মুসলমান স্কুল ও মাদ্রাসা আছে, সেগুলি খুঁজে বের করা এবং তাদের সম্বন্ধে সরকারে রিপোর্ট পেশ করা। এই ধরনের একটি চমৎকার বেসরকারী শিক্ষায়তন কলকাতায় অবস্থিত আছে, তার ছাত্র সংখ্যা ১১০ জন, কিন্তু কোনও সরকারী সাহায্যই সে পাচ্ছে না। আর একটি শিক্ষায়তন হাওড়ার পশ্চিমে অনতিদূরে একটা গ্রামে আজও টিকে আছে, কিন্তু কিছুই করে না। তৃতীয় একটা ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল-লাইনের উপর মেমারীতে বেঁচে আছে, আর চতুর্থটা আছে সাসারামে। এরকম আরও অনেক শিক্ষায়তন

অজ্ঞাত জায়গায় টিকে আছে, যাদের অস্তিত্ব আমাদের শিক্ষাবিষয়ক ইন্সপেক্টরদের গোচরে আসে না। আমার বিশ্বাস, তাদের কয়েকটির বেশ উপযুক্ত পরিমাণের দক্ষতা আছে এবং তাদের অনুসৃত নীতি থেকে শেখবার কিছু থাকলে তা খুঁজে বের করা মন্দ হবে না। আমার মনে হয় না ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়মিত পরিদর্শনে তারা রাযী হবে, কিন্তু নিজেদেরই ধর্মে বিশ্বাসী ডেপুটি ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরিদর্শনে তাদের অনেকেই রাযী হতে পারে, যদি তার ফলে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। [এভাবে আমরা বাঙলা দেশের সবচেয়ে ষড়যন্ত্র-প্রয়াসী শিক্ষায়তনগুলিকে রাজভক্তির দিকে না হলেও শান্তি ও শৃংখলার দিকে টেনে আনতে পারবো।] বর্তমানে যে-সব বালসুলভ মূর্খতা মুসলমানরা তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষা করে,, তার বদলে কয়েক দফায় উপযুক্তভাবে নির্বাচিত ও সুচারুরূপে সম্পাদিত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করতে হবে। মাদ্রাসাগুলিকে তাদের ইংরেজ অধ্যক্ষের হেফাযতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে; আর তাদের জন্য যে প্রচুর অর্থ আছে, সে-সব উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হলে সরকারকে এক সিকিও খরচ করতে হবে না।

এভাবেই আমরা শেষ পর্যন্ত মুসলমান তরুণদেরকে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হবো। (তাদের ধর্মে এতোটুকুও হস্তক্ষেপ না করে এবং তাদেরকে ধর্মীয় কর্তব্যগুলি শিক্ষা দেওয়ার অছিলায়, আমরা হয়তো তাদেরকে কম ধর্মনিষ্ঠ করতে এবং নিশ্চিতভাবে কম ধর্মান্ধ করে তুলতে পারবো।) নয়া পুরুষের মুসলমানরা তখন হিন্দুর মতো নতুন পথে চলতে শিখবে এবং তাদের মতো সহজে উদারনৈতিক হয়ে উঠবে; অথচ এই হিন্দুরাই মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গোঁড়া জাত। এই উদারনীতির ফলে তারা বাপ-দাদার চেয়ে ধর্মে কম আস্থাবান হচ্ছে; কিন্তু এর ফলে মিথ্যা ধর্মের নামে তারা যে-সব অত্যাচার সহ্য করতো, যে-সব অপরাধ করতো এবং যে-সব দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতো, সে-সব থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। ক্রমে মুসলমানরাও সে-সব থেকে মুক্তিলাভ করবে। আরও যে-সব উপায়ে মাত্র উদাসীনতার মাধ্যমে, হিন্দু ও মুসলমানরা, সমানভাবে আরও উচ্চ স্তরের ধর্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে, এখানে আমি সে সবের উল্লেখ

করতে ইচ্ছা করিনে; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন নিশ্চয়ই আসবে। আর আমাদের শিক্ষানীতি এপর্যন্ত নেতিবাচক ফল দেখালেও এটাই হচ্ছে তার প্রথম পদক্ষেপ। এখন পর্যন্ত ভারতে ইংরেজরা প্রতীক পূজার বিরুদ্ধে নগণ্য ভূমিকাই গ্রহণ করেছে।

এদিকে সরকারেরও কর্তব্য হবে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ যেমন কঠোরহস্তে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তেমনই তার পুঞ্জীভূত হওয়ার কোনও কারণও ঘটতে না দেওয়া। আমাদের বিজয়ের ফলে ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের দরুন মুসলমান সম্প্রদায় আজ অবনতির গহ্বরে পড়ে গেছে। শুধু তার জন্য নয়, আমাদের দরদের অভাবে তাদের এই সর্বনাশ আরও সম্পূর্ণ ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সে জন্যও সরকারকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মুসলমানদের রাজদ্রোহী দলের প্রতি এরকম ব্যবহার দেখাতে হবে, যার ফলে শুধু ন্যায়বিচারের জন্যই সরকার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হবে না, জনমতের প্রশংসা কুড়োতে সক্ষম হবে। একটা ন্যায়সংগত দণ্ডবিধান কেবল অকুশলী আচরণের দরুনই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোমের সবচেয়ে ধর্মনিষ্ঠ সম্রাটের স্মৃতিকে কালিমাচ্ছন্ন করে রেখেছে[৭৩]। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আমরা এখনও একবিন্দু রক্তপাত করিনি, আর তার ফলে এখন একদল ওহাবী শহীদের স্থলে একদল ওহাবী ধর্মত্যাগীরই সৃষ্টি হয়েছে। আমি যখন এসব লিখতে ব্যস্ত, তখন ওদিকে ব্রিটিশ বাহিনীর সেই পাপী মাংস বিক্রেতা[৭৪], যার ১৮৬৪ সালে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, সে পাটনায় তারই ধর্মভাইদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার পহেলা ফাঁসির হুকুম যদি তামিল হয়ে যেতো, তাহলে হাযার হাযার ভক্ত বছর বছর তার মাযারে যিয়ারত করতে ছুটতো। সবযুগেই ধর্মের নামে জীবন দান মৃত ব্যক্তির পাপ-সংকুল জীবনকেও মহিমান্বিত করেছে। আমাদের দিল্লীর কসাইয়ের চেয়েও জঘন্যতম মাংস সরবরাহকারীর ভাগ্য ইতিহাসে উজ্জ্বল আখরে লিখিত হয়ে আমাদের সরকারকে সাবধান

---

৭৩ জুলিয়ানের অধীন আফ্রিকার শাসক নোটারী গনডেনসাস্ ও মিসরের অত্যাচারী ডিউকের প্রতি দণ্ডবিধান।

৭৪ মুহম্মদ শফী।

করে দিচ্ছে, এসব ফাঁসির হুকুম তামিল না করতে। কারণ, তাহলে মুসলমান প্রজারা সেগুলিকে ধর্মের নামে শহীদ হওয়ারই সামিল ধরে নেবে। কীভাবে চুক্তিভংগকারী পরগাছার মতো নিন্দার্হ এবং রোমান বাহিনীর শূকর মাংস ঠিকাদার কাপাডোসিয়ার জর্জ লম্পট পুরোহিতের জীবনযাপন করেও শেষে অনিচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়ে দেবতার মর্যাদা লাভ করেছিল এবং মেরী ইংলণ্ডের সেন্ট্ জর্জ উপাধিলাভে ধন্য হয়েছিল, সে কথা ভুলে যাওয়া সরকারের উচিত হবে না।

প্রথম পরিশিষ্ট

মক্কাশরীফের মুফ্‌তীগণের ফতোয়া

(তিনটি মুসলমান মযহাবের প্রধানগণ)

সওয়াল ঃ

(আপনাদের মহিমা অনন্ত হোক) এই সওয়ালের আপনাদের জওয়াব কি ঃ হিন্দুস্তান দেশটার শাসকরা খ্রীস্টান, তারা ইসলামের সব বিধানের উপর, যেমন প্রাত্যহিক নিয়ম মুতাবেক নামায, দুই ঈদের নামায প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করে না ; আবার কোনো কোনো বিধান লঙ্ঘনের অনুমতিও দেয়, যেমন, কেউ পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগ করে খ্রীস্টান হলেও তার পূর্বপুরুষ মুসলমানের ওয়ারীশ হয় ; এরকম দেশ দারুল-ইসলাম কি না ? সওয়ালের জওয়াব দিন, আল্লাহ্ আপনাদের পুরস্কৃত করবেন।

এক নম্বর জওয়াব ঃ

সব প্রশংসাই সর্বশক্তিমানের, তিনি সকল সৃষ্টির প্রভু। হে সর্বশক্তিমান! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।

যতোদিন সেখানে ইসলামের কোনও বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালিত হবে, ততোদিন সেটা দারুল-ইসলাম।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাপবিত্র ও মহামহিমময়।

এই ফতোয়া দিচ্ছে একজন, যে আল্লার গুপ্ত অনুগ্রহের ভিখারী, আল্লার প্রশংসাবাদী এবং তাঁর রসূলের উপর অনন্ত শান্তি ও আশীষ প্রার্থনাকারী।

(স্বাক্ষর) জামাল ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ শেখ ওমারুল হানাফী ;
মক্কাশরীফের বর্তমান মুফ্‌তী।
আল্লাহ্ তাঁর উপর ও তাঁর পিতার উপর কৃপা করুন।

দুই নম্বর জওয়াব ঃ

সব প্রশংসাই আল্লার, তিনি অদ্বিতীয়। আল্লার আশীষরাজি আমাদের রাসূলের উপর, তাঁর বংশধরদের ও সাহাবাদের উপর এবং সব মুসলমানের উপর বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ্! সৎপথে তোমার দিশা প্রার্থনা করি!

হাঁ! যতোদিন সেখানে ইসলামের কোনও আচার-অনুষ্ঠান পালিত হবে, ততোদিন সেটা দারুল-ইসলাম।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাপবিত্র ও মহামহিমময়।

এর লেখক করুণাময় আল্লার নিকট মুক্তির ভিখারী। আল্লাহ্ তাঁকে, তাঁর পিতামাতাকে, শিক্ষকগণকে, ভাই-বেরাদরকে, বন্ধুবান্ধবকে ও সকল মুসলমানকে মাফ ক'রুন।

(স্বাক্ষর) আহমদ ইবনে যায়নী দহলান্;
মক্কাশরীফের শাফেয়ী মযহাবের মুফ্তী।

তিন নম্বর জওয়াব ঃ

সব প্রশংসাই আল্লার জন্য, তিনি অদ্বিতীয়! হে সর্বশক্তিমান। আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।

দাসোকীর তফসীরে লেখা আছে যে, দারুল-ইসলাম কাফিরের হাতে চলে যাওয়ার সংগে সংগেই দারুল-হরব হয়ে যায় না; তা হয় যখন সব কিংবা অধিকাংশ ইসলামের বিধিবিধান সেখানে রদ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। আল্লার আশীষরাশি আমাদের নায়ক হযরত মুহম্মদ, তাঁর বংশধরদের ও সাহাবাদের উপর বর্ষিত হোক।

(স্বাক্ষর) হোসাইন ইব্নে ইবরাহিম;
মক্কাশরীফের মালেকী মযহারের মুফ্তী লিখিত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

উত্তর ভারতের আলেম সমাজের ফতোয়া

সৈয়দ আমীর হোসেন, ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার সাহেবের খাস মুনশী কর্তৃক 'ইস্‌তিফ্‌তা' বা সওয়ালের তরজমা :

ওলামায়ে দ্বীন! ইসলামের আইনের ব্যাখ্যাকর্তাগণ! নীচের সওয়ালের আপনাদের কি ফতোয়া :

হিন্দুস্তানে জিহাদ কি আইনসংগত? এ দেশটা আগে মুসলমানদের শাসনে ছিল, কিন্তু এখন খ্রীস্টান সরকারের ক্ষমতাধীনে এসেছে। কিন্তু খ্রীস্টান শাসন মুসলমান প্রজাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না ; যেমন, নামায, রোযা, হজ, যাকাত, জুমার নামায ও জামাতে বাধা দেয় না ; বরং তাদেরকে এসব পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আশ্রয় দেয়, ঠিক যেমন একজন মুসলমান শাসকও দিয়ে থাকে ; সেখানে মুসলমানদের বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার কোনও শক্তি নেই ; অন্যপক্ষে যদিও তারা এরকম যুদ্ধ করে, তাহলে তাদেরই পরাজিত হওয়ার এবং তার ফলে ইসলামেরও অযথা অপমানিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনারা উপযুক্ত নযীর দিয়ে জওয়াব দান করে সরফরায করুন।

ফতোয়ার তারিখ : ১৭ই রবিউস-সানী, ১২৮৭ হিজরী, মুতাবেক ১৭ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ।

মুসলমানরা এখানে খ্রীস্টানদের নিকট আশ্রয় পেয়ে আসছে ; আর যে দেশে আমান থাকে, সে দেশে জিহাদ থাকে না ; কারণ জিহাদের সবচেয়ে দরকারী শর্ত হলো, মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে আমান অর্থাৎ আযাদী থাকবে না। এ শর্ত এখানে নেই। তাছাড়া আরও শর্ত এই যে, মুসলমানদের জয়ে ইসলামের মহিমা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকা উচিত। যদি সেরূপ কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে জিহাদ হয় বেআইনী।

অতঃপর মওলবী সাহেবান ফতোয়ার পোশকতায় মনহায্-উল-গাফ্‌ফার ও ফতোয়া-ই-আলমগীরী থেকে কয়েক বচন উদ্ধৃত করেছেন।

মোহর চিহ্নিত করা
- মওলবী আলী মোহাম্মদ লখনবী
- মওলবী আবদুল হাই লখনবী
- মওলবী ফয্লুল্লাহ্ লখনবী
- মওলবী মোহাম্মদ নয়ীম লখনবী
- মওলবী রাহ্মাতউল্লাহ্ লখনবী
- মওলবী কুতব-উদ্-দীন দেহলবী
- মওলবী লুতফুল্লাহ্ রামপুরী এবং আরও অনেকে।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

কলকাতা মোহামেডান সোসাইটির ফতোয়া

উত্তর-ভারতের আলেম-সমাজের ফতোয়ার বিরুদ্ধে মওলবী কেরামত আলী ঘোষণা করেন, ভারত দারুল-ইসলাম। অতঃপর তিনি বলেন:

'দ্বিতীয় সওয়াল হলো, এ দেশে জিহাদ করা জায়েয বা আইন-সংগত কিনা। এর জওয়াব প্রথম সওয়ালেই দেওয়া হয়ে গেছে। কারণ, দারুল ইসলামের জিহাদ করা কখনও আইনসংগত হতে পারে না। এই উক্তি এতোই পরিচ্ছন্ন যে, এর পোশকতায় কোনো যুক্তি বা নযীরের দরকার করে না। এখন যদিও কোনো বিপথগামী দুর্বৃত্ত ভাগ্যের ফেরে এদেশের শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সে যুদ্ধকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করা আইনসংগত হবে, আর বিদ্রোহ শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব এরকম যুদ্ধ হবে বে-আইনী। আর কেউ যদি এরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহলে মুসলমান প্রজাদের কর্তব্য হবে শাসকদেরকে সাহায্য করা এবং শাসকদের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। ফতোয়া-ই-আলমগীরীতে ঠিক এভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

